বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান

ডাঃ মরিস বুকাইলি

বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান
ডাঃ মরিস বুকাইলি

অনুবাদ
ওসমান গনি
প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
পরিচালক
আল কোরআন একাডেমী ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
রমযান ১৪১৪
ফাল্গুন ১৪০০
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪
প্রচ্ছদ
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
কম্পিউটার কম্পোজ
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

পরিবেশক
প্রীতি প্রকাশন
১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' পৃথিবী বিখ্যাত একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচনা করেছেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত সার্জন, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক ডাঃ মরিস বুকাইলি। ফরাসী ভাষায় রচিত তাঁর "লা বাইবেল, লা কুরআন এট লা সাইন্স" নামক বইখানি সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালের মে মাসে প্যারিসে প্রকাশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরাজী ও আরবী সহ পৃথিবীর বহু ভাষায় বইটি অনুদিত হয়।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানবজাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণের চাবিকাঠি এবং একমাত্র নির্ভুল আসমানী কিতাব। অথচ যুগে যুগে এ সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ চেষ্টা চলেছে প্রধানত ইহুদী ও খৃষ্টান পন্ডিতদের দ্বারা এবং বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক।

এই বইয়ে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে পাওয়া জ্ঞানের সঙ্গে বাইবেলের বর্ণনার অসঙ্গতি এবং কুরআনের বর্ণনার সঙ্গতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষতার যুগে প্রকৃত সত্যকে যারা আবিষ্কার করতে চান এ বইটি তাদের প্রভূত উপকারে আসছে বিধায় দুনিয়া জোড়া বইটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হচ্ছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব ওসমান গনি এ অসাধারণ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করলে প্রথমে তা কয়েক বৎসর ধরে ধারাবাহিকভাবে মাসিক পৃথিবী পত্রিকায় ছাপা হয়। সম্প্রতি মরহুম ওসমান গনির দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক দোয়ার মাহফিলে সুধীবৃন্দ বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, বইটি প্রকাশিত হলে এটি মরহুমের পরকালের নাজাতের উছিলা হতে পারে এবং এভাবেই মৃত্যুর পরও তিনি সদকায়ে জারিয়ার সওয়াবের হকদার হতে পারেন।

এ দিকটি বিবেচনায় এনে মরহুমের সুযোগ্য সন্তান এবং পরিবারবর্গ বইটি প্রকাশে সানন্দে সম্মত হলে আল কোরআন একাডেমী বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আল কোরআন একাডেমী কোরআনের শিক্ষা ও বাণীর প্রচার ও প্রসার এবং মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি মিশনারী সংস্থা। কোরআন কেন্দ্রীক গবেষণা এবং গবেষণার ফসল প্রকাশ ও প্রচার করাই এ সংস্থার প্রধান কাজ। ইতিমধ্যে আমাদের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়েছে আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের ডাইরেক্টর হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ রচিত 'DICTIONARY OF THE HOLY QURAN', 'কোরআনের অভিধান', আল কোরআন একাডেমী ঢাকার ডাইরেক্টর আসাদ বিন হাফিজ রচিত 'আল কোরআনের বিষয় অভিধান' এবং আতা সরকারের লেখা অসাধারণ কোরআন কাহিনী 'সুন্দর তুমি পবিত্রতম'।

আল কোরআন একাডেমী ঢাকা কোরআনের ওপর আরো ব্যাপক কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের সহযোগিতায় এবং আমাদের তত্বাবধানে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফি জিলালিল কোরআন' অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছে।

আল্লাহ যেন আমাদের সকল নেক মাকসুদ পূর্ণ করেন এবং এ গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশককে পরকালে নাজাতের হকদার করেন সকলের কাছে এ দোয়াই কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তার কালাম জানা, বুঝা ও সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন।

আমীন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ৯-৫৪

ভূমিকা ৯
ওল্ড টেস্টামেন্টঃ সাধারণ সীমানা ১৭
বাইবেলের উৎস ২০
ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন পুস্তক ২২
তৌরাত বা পেন্টাটিউক ২৫
ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ ৩১
নবীদের গ্রন্থ সমূহ ৩৩
কবিতা ও জ্ঞানের গ্রন্থ ৩৪
ওল্ড টেষ্টামেন্ট ও বিজ্ঞানঃ কতিপয় সাব্যস্ত সত্য ৩৬
দুনিয়া সৃষ্টি ৩৭
প্রথম বিবরণ ৩৭
দ্বিতীয় বিবরণ ৪২
পৃথিবীর সৃষ্টি এবং সেখানে মানুষের আবির্ভাবের তারিখ ৪৩
আদম থেকে ইব্রাহীম ৪৪
ইব্রাহীমের নসবনামা ৪৪
ইব্রাহীম থেকে ঈসা ৪৫
বন্যা ও প্লাবন ৪৬
বাইবেলের ভ্রান্তি সম্পর্কে খৃষ্টান ভাষ্যকারদের বক্তব্য ৪৮
উপসংহার ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৫-১১৪

গসপেলঃ উৎস ও ইতিহাস ৫৫
ইতিহাসের স্মারকঃ ইহুদী খৃষ্ট ধর্ম ও সাধুপল ৫৮
চার গসপেলঃ উৎস ও ইতিহাস ৬২
ম্যাথুর গসপেল (মথি লিখিত সুসমাচার) ৬৬
মার্কের গসপেল (মার্ক লিখিত সুসমাচার) ৭০
লুকের গসপেল (লুক লিখিত সুসমাচার) ৭৪
জনের গসপেল (জোহান লিখিত সুসমাচার) ৭৬
গসপেলের উৎস ৭৯

ফাদার এম ই বয়েসমার্ডের সিনপসিস অব দি ফোর গসপেলঃ সাধারণ ছক ৮৪
এবারতের ইতিহাস ৮৪
চার গসপেল ও আধুনিক বিজ্ঞান ৮৯
যিশুর নসবনামা ৯১
ইব্রাহীমের পুত্র দাউদ তৎপুত্র যিশু খৃষ্টের নসবনামা ৯১
পান্ডুলিপিতে ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্গে মিলের পার্থক্য ৯৬
ম্যাথুর গসপেল ৯৬
লুকের গসপেল ৯৬
দাউদ থেকে যিশু ৯৭
এবারতে সমালোচনা ৯৭
(১) আদম থেকে ইব্রাহীম ৯৭
(২) ইব্রাহীম থেকে দাউদ ৯৮
(৩) দাউদের পরের আমল ৯৮
আধুনিক বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য ও মন্তব্য ১০০
বিবরণের স্ববিরোধিতা ও অসম্ভাব্যতা ১০১
নির্যাতনের বিবরণ ১০২
জনের গ্রন্থে ইউকারিস্টের বিবরণ নেই ১০২
মৃত্যুর পর যিশুর হাজির হওয়া ১০৫
যিশুর স্বর্গারোহণ ১০৭
যিশুর শেষ কথোপকথন ও জনের গসপেলের প্যারাক্লিট ১০৯
উপসংহার ১১৩

তৃতীয় অধ্যায় ১১৫-২৩৯

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ১১৫
ভূমিকাঃ ১১৫
কুরআনের আসলত্ব, কিভাবে তা লেখা হয় ১৩০
আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিঃ বাইবেলের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ১৩৬
সৃষ্টির ছয় মেয়াদ ১৩৬
কুরআনে দুনিয়া ও আকাশমন্ডল সৃষ্টির কোন ক্রমিকতা দেয়া নেই ১৪০
জ্যোর্তিমন্ডল গঠনের মৌলিক প্রক্রিয়া এবং তার ফলে গ্রহ উপগ্রহের গঠন ১৪১
বিশ্বজগতের গঠন বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের কতিপয় তথ্যঃ ১৪১
সৌরমন্ডল ১৪৪
তারকারাজি ১৪৫
তারকা, তারকাপুঞ্জ ও গ্রহ ব্যবস্থার গঠন ও বিকাশ ১৪৫

বহু বিশ্বের ধারণা ১৪৭
আন্ততারকা পদার্থ ১৪৭
কুরআনের তথ্যের মুকাবিলায় ১৪৮
কতিপয় আপত্তির জবাব ১৪৯
কুরআনের জ্যোতির্বিদ্যা ১৫১
আকাশ সম্পর্কে চিন্তা ও ধারণার সাধারণ দিকনির্দেশ ১৫২
জ্যোতিষ্ক মন্ডলের প্রকৃতিঃ সূর্য ও চন্দ্র ১৫৪
নক্ষত্র মন্ডল ১৫৫
গ্রহমন্ডল ১৫৬
নিম্নতম আকাশ ১৫৭
জ্যোতির্মন্ডলের সংগঠন ১৫৮
চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ ১৫৮
মহাশূন্যে চন্দ্র ও সূর্যের নিজস্ব শক্তিতে চলার প্রসঙ্গ ১৬১
দিনরাত্রির ক্রমিকতা ১৬২
আকাশমন্ডলীর ক্রমবিকাশ ১৬৩
বিশ্বজগতের সম্প্রসারণ ১৬৫
মহাশূন্য বিজয় ১৬৬
পৃথিবী ১৬৮
সাধারণ বিবরণের আয়াত ১৬৮
পানির বিবর্তনচক্র ও সমুদ্র ১৭০
সাগর ১৭৫
পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ১৭৬
পৃথিবীর আবহাওয়া ১৭৮
উচ্চতা ১৭৯
আবহাওয়া মন্ডলে বিদ্যুৎ ১৭৯
ছায়া ১৮০
প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্য ১৮১
প্রাণের উৎপত্তি ১৮১
উদ্ভিদ রাজ্য ১৮২
উদ্ভিদ জগতে ভারসাম্য ১৮৩
বিভিন্ন খাদ্যের গুণবৈচিত্র ১৮৩
উদ্ভিদ জগতে বংশ বিস্তার ১৮৪
প্রাণীর রাজ্য ১৮৫

১। প্রাণীজগতে বংশবিস্তার ১৮৫
২। প্রাণীজগতে সমাজের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ ১৮৬
৩। মৌমাছি, মাকড়সা ও পাখি বিষয়ক বর্ণনা ১৮৭
৪। প্রাণীদুগ্ধের উপাদানের উৎস ১৯০
মানুষের বংশবিস্তার ১৯২
কতিপয় মৌলিক ধারণা ১৯২
কুরআনে মানুষের বংশ বিস্তার ১৯৩
(১) স্বল্পতম পরিমাণ শুক্রেই উর্বরতা সাধিত হতে পারে ১৯৪
(২) শুক্রের উপাদান ১৯৫
(৩) উর্বর ডিম্বের নারী যৌনাঙ্গে অবস্থান গ্রহণ ১৯৬
(৪) জরায়ুতে ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ১৯৬
কুরআন ও যৌনশিক্ষা ২০০
কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনাঃ সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২০২
সাধারণ বিষয়ঃ কুরআন, গসপেল ও আধুনিক জ্ঞান ২০৩
সাধারণ বিষয়ঃ কুরআন ওল্ড টেস্টামেন্ট ও আধুনিক জ্ঞান ২০৪
নূহের আমলের প্লাবনঃ ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা ২০৫
প্লাবন বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা ২০৬
মহাযাত্রা ২০৯
বাইবেল বর্ণিত মহাযাত্রা ২১০
কুরআনে বর্ণিত মহাযাত্রা ২১২
কিতাবের তথ্যের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের মুকাবিলা ২১৪
১। কিতাবে বর্ণিত কিছু তথ্যের বিবেচনা ২১৪
মিসরে বনি ইসরাইল ২১৪
মিসরে দুর্যোগ ২১৬
২। মহাযাত্রার পথ ২১৭
পানির অলৌকিক বিভক্তি ২১৭
ফেরাউনদের ইতিহাসে মহাযাত্রার স্থান ২১৭
৩। দুই ফেরাউনের পরিচয় ২২০
শিলালিপির সমস্যা ২২৪
৪। মহাযাত্রায় ফেরাউনের মৃত্যু বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের বিবরণ ২২৬
৫। ফেরাউন মারনেপতাহর মমি ২২৮
কুরআন হাদীস ও আধুনিক বিজ্ঞান ২৩১
সাধারণ উপসংহার ২৩৬

ভূমিকা

তৌহীদবাদী তিনটি ধর্মেরই নিজস্ব গ্রন্থ আছে। ইহুদী হোক, খৃষ্টান হোক, মুসলমান হোক, ঐ গ্রন্থই হচ্ছে তার ঈমানের বুনিয়াদ। তাদের সকলের কাছেই তাদের নিজ নিজ গ্রন্থ হচ্ছে আসমানী কালামের লিখিত রূপ। হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুসার কাছে ঐ কালাম সরাসরি আল্লার কাছ থেকে এসেছে। আর হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে এসেছে অপরের মারফত। হযরত ঈসা বলেছেন, তিনি তার পিতার নামে কথা বলছেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে কালাম প্রচার করেছেন, তা তনি পেয়েছেন আল্লার কাছ থেকে ফেরেশতা জিব্রাইলের মারফত।

ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, ওল্ড টেস্টামেন্ট, গসপেল, এবং কুরআন একই শ্রেণীভূক্ত। অর্থাৎ আসমানী কালামের লিখিত সংকলন। মুসলমানগণ এ মতবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রধানত ইহুদী-খৃষ্টান প্রভাবে প্রভাবান্বিত পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ কুরআনকে আসমানী কালামের মর্যাদা দিতে চায় না।

এক ধর্মের লোকেরা অপর দুই ধর্মের গ্রন্থ সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করে থাকে তা বিবেচনা করা হলে পাশ্চাত্যের ঐ মতবাদের একটি ব্যাখ্যা সম্ভবত পাওয়া যেতে পারে।

ইহুদীদের আসমানী গ্রন্থ হচ্ছে হিব্রু বাইবেল। খৃষ্টানদের ওল্ড টেষ্টামেন্টের সঙ্গে তার পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে, যা হিব্রু বাইবেলে ছিল না। এ পার্থক্য অবশ্য কার্যক্ষেত্রে তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কেননা ইহুদীগণ তাদের নিজেদের কিতাবের পর আর কোন গ্রন্থ নাযিল হয়েছে বলে স্বীকার করে না।

খৃষ্টানগণ হিব্রু বাইবেলকে নিজেদের গ্রন্থ বলে মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে নিয়েছে। তবে হযরত ঈসার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত ও প্রকাশিত সকল রচনাকে তারা গ্রহণ করেনি। খৃষ্টান পাদ্রীগণ হযরত ঈসার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে লিখিত অনেক গ্রন্থই বাতিল করে দিয়েছেন। নিউ টেস্টামেন্টে তাঁরা অতি অল্পসংখ্যক রচনাই বহাল রেখেছেন। তার মধ্যে চারটি ক্যানোনিক গসপেলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা এবং তাঁর সাহাবীদের পরবর্তীকালীন কোন আসমানী কালামই স্বীকার করে না। সুতরাং কুরআনকেও তারা আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না।

কুরআন হযরত ঈসার ছয়শত বছর পরে নাযিল হয়। এ কিতাবে হিব্রু বাইবেল

এবং গসপেলের অনেক তথ্যই পুনর্বর্ণিত হয়েছে। কারণ কুরআনে তাওরাত ও গসপেল থেকে বহু উধৃতি আছে। (তাওরাত বলতে বাইবেলের প্রথম পাঁচখানি গ্রন্থ, অর্থাৎ হযরত মুসার পঞ্চকিতাব-জেনেসিস, এক্সোডাস, লেভিটিকাস, নাম্বারস ও ডিউটারোনমি বুঝায়)। কুরআনের পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনার জন্য খোদ কুরআনেই মুসলমানদের উপর হুকুম আছে (সূরা-৪ আয়াত ১৩৬)। তাছাড়া আসমানী কালামে হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুসার ন্যায় পয়গম্বরদের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর হযরত ঈসাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কারণ কুরআনে এবং গসপেলে তাঁর জন্মকে একটি অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মাতা মরিয়মকেও বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কুরআনের ১১ নম্বর সুরার নামকরণ তাঁর নাম অনুসারে হওয়ায় এ বিশেষ মর্যাদার আভাস পাওয়া যায়।

ইসলামের এ সকল তথ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ সাধারণত অবহিত নয়। কয়েক পুরুষ যাবত তাদের যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের যেভাবে অজ্ঞ করে রাখা হয়েছে তা বিবেচনা করা হলে এ অবস্থা মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তাদের এ অজ্ঞানতার পিছনে- এমন কি বর্তমান কালেও- "মোহামেডান ধর্ম", "মোহামেডান জাতি" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ সকল শব্দ ও বাগধারা ব্যবহার করে তারা এমন একটি মিথ্যা ধারণা প্রচার করেছে যে, এ ধর্ম বিশ্বাস (মুহাম্মদ নামক) একজন মানুষের দ্বারা প্রচলিত হয়েছে এবং আল্লার (খৃষ্টান ধর্মীয় অর্থে) সেখানে কোন ভূমিকা নেই। পাশ্চাত্যের অনেক সুধী ও বিজ্ঞজন এখন ইসলামের দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, কিন্তু তাঁরা ইসলামের খোদ আসমানী কালাম সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর নেন না। অথচ ঐ কালাম সম্পর্কে তাদের প্রথমেই খোঁজ নেয়া উচিত।

কোনো কোনো খৃষ্টান মহলে মুসলমানদের যে কী ঘৃণার চোখে দেখা হয় অনেকে তা আন্দাজও করতে পারেন না। এ ব্যাপারে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। একবার আমি একই বিষয়ে বাইবেল ও কুরআনে বর্ণিত কাহিনীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার শ্রোতারা এমন কি সাময়িক আলোচনার জন্যও কুরআনের কোন বর্ণনাকে ভিত্তি হিসাবে মেনে নিতে চায়নি। তাদের ধারণা কুরআন থেকে কিছু উধৃত করার অর্থই হচ্ছে খোদ শয়তানের প্রসঙ্গের অবতারণা করা।

তবে খৃষ্টান জগতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বর্তমানে কিছু পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলে আলোচিত বিষয়ের ভিত্তিতে ভ্যাটিক্যানের অখৃষ্টীয় বিষয়ক দফতর থেকে ফরাসী ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নাম "ওরিয়েন্টেশন পোর আন ডায়ালগ এন্টার ক্রিশ্চিয়েনস এট মুসলমানস"-খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি। প্রকাশক এ্যাংকোরা, রোম, তৃতীয় সংস্করণ

১৯৭০। এ গ্রন্থে খৃষ্টানদের সরকারী মতবাদে সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের আভাস রয়েছে। মুসলমানদের সম্পর্কে খৃষ্টানদের মনে "প্রাচীনকাল থেকে মীরাসী সূত্রে পাওয়া অযথা বিদ্বেষ ও বিরূপতায় বিকৃত যে সেকেলে ধারণা রয়েছে", তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এ দলীলে "মুসলমানদের প্রতি অতীতের অবিচার স্বীকার" করে নেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এজন্য খৃষ্টীয় শিক্ষিত পাশ্চাত্য মনোবৃত্তিই দায়ী। মুসলমানদের অদৃষ্টবাদ, বৈধতাবোধ, গোঁড়ামি প্রভৃতি সম্পর্কে খৃষ্টানদের মনে এতদিন যে ভুল ধারণা ছিল, তার সমালোচনা করে গ্রন্থে আল্লার একত্ববাদে বিশ্বাসের উপর সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে এক সরকারী সম্মেলনে গিয়ে কার্ডিনাল কোরেনিগ কায়রোর আল আযহার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মসজিদে যখন ঐ একত্বের কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তখন শ্রোতাগণ কিভাবে বিস্মিত হয়েছিল। আরও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ১৯৬৭ সালে রমযান মাসের রোযার শেষে ভ্যাটিক্যান অফিস "আন্তরিক ধর্মীয় অনুভূতি সহকারে" মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জানানোর জন্য খৃষ্টানদের প্রতি আহবান জানিয়েছিল।

রোমান ক্যাথলিক কিউরিয়া ও ইসলামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য এ প্রাথমিক প্রচেষ্টার পর আরও কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং উভয়ের মধ্যে মত বিনিময়ে ও যোগাযোগের মারফত ঐ সম্পর্ক গভীর করে তোলা হয়। এ ঘটনাগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও তেমন কোন প্রচারণা লাভ করেনি। অথচ এ সকল ঘটনা পাশ্চাত্যেই ঘটেছে এবং সেখানে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের মত যোগাযোগের মাধ্যমের কোনই অভাব নেই।

১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল ভ্যাটিক্যানের অখৃষ্টীয় দফতরের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল পিগনেডোলি এক সরকারী সফরে সউদী আরব গিয়ে বাদশাহ ফয়সলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ খবরটি সংবাদপত্রের পাতায় কোনই গুরুত্ব লাভ করেনি। ফরাসী সংবাদপত্র লা মন্ডে ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল মাত্র কয়েক লাইনে অতিশয় সংক্ষেপে এ সংবাদটি পরিবেশন করে। অথচ ঐ সাক্ষাতকারে যা ঘটেছিল, তা খেয়াল করলে বুঝা যায় যে, সংবাদটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐ সাক্ষাতকারে কার্ডিনাল হিজ হোলিনেস পোপ ষষ্ঠ পলের একটি বাণী বাদশাহ ফয়সলের খেদমতে পেশ করেন। বাণীতে হিজ হোলিনেস "এক আল্লার উপাসনায় ইসলামী ও খৃষ্টান বিশ্বের ঐক্যে গভীর বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী দুনিয়ার প্রধান হিসাবে হিজ ম্যাজেস্টি বাদশাহ ফয়সলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।"

ছয় মাস পর ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে সউদী আরবের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একটি প্রতিনিধিদল সরকারী সফরে ভ্যাটিক্যান গিয়ে পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখন সেখানে "ইসলামে মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার" বিষয়ে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে একটি আলোচনা সভা হয়। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর ভ্যাটিক্যান সংবাদপত্র

"অবজারভেটোর রোমানো"-র প্রথম পৃষ্ঠায় এ সভার বিবরণ বিরাট আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ দিন ঐ একই পৃষ্ঠায় রোমে অনুষ্ঠিত বিশপদের সাইনডের সভার সমাপ্তি দিবসের বিবরণ অনেক ছোট আকারে প্রকাশিত হয়।

পরে জেনেভার গির্জাসমূহের একুমেনিক্যাল কাউন্সিল, এবং স্ট্রাসবর্গের লর্ড বিশপ হিজ গ্রেস এলচিঙ্গার সউদী আলেমগণকে অভ্যর্থনা জানান। লর্ড বিশপ তাঁর উপস্থিতিতে ক্যাথিড্রালের মধ্যেই যোহরের নামায আদায় করার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানান। এ সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তা সম্ভবত একটি অস্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে, ঘটনাটির গভীর ধর্মীয় তাৎপর্যের জন্য নয়। এ বিষয়ে যাঁদের প্রশ্ন করেছি, তাঁরা বলেছেন যে, ঘটনাটির ধর্মীয় তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না।

ইসলাম সম্পর্কে পোপ ষষ্ঠ পলের এ খোলা মন ও মানসিকতা দুই ধর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই একটি অধ্যায় হয়ে থাকবে। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি "এক আল্লার উপাসনায় ইসলামী ও খৃষ্টান বিশ্বের ঐক্যের প্রতি গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।" মুসলমানদের সম্পর্কে ক্যাথলিক চার্চ প্রধানের এ অনুভূতির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্রকাশ্য বিদ্বেষের আবহাওয়ায় লালিত হওয়ায় বহু খৃষ্টানই নীতিগত ভাবে ইসলাম সম্পর্কে যে কোন আলোচনার বিরোধী। ভ্যাটিক্যানের ঐ দলীলে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। এ কারণেই ইসলাম যে আসলে কি জিনিস সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়ে গেছে এবং ইসলামের আসমানী কালাম হওয়া সম্পর্কে তারা আগের মতই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছে।

তবুও একটি তৌহীদবাদী ধর্মের আসমানী কালামের কোন বৈশিষ্ট বিচার করার সময় অপর দুটি ধর্মের অনুরূপ বৈশিষ্টের সঙ্গে তার তুলনা করার প্রয়োজন আছে। কোন বিষয়ের সামগ্রিক বিবেচনা একদেশদর্শী বিবেচনার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল। তাই এ পুস্তকে তিনটি ধর্মের আসমানী কালামে বর্ণিত কতিপয় বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা হবে এবং তার মোকাবিলায় বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত তথ্য তুলে ধরা হবে। এ প্রসঙ্গে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তিনটি ধর্মের এখন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ তিনটি ধর্মই এখন সমানভাবে বস্তুবাদের হামলার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সদ্ভাব নেই, এ ধারণা ইহুদী-খৃষ্টান প্রভাবিত দেশের মত ইসলামী দেশেও বিশেষত বৈজ্ঞানিক মহলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। এ বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হলে সুদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। এ পুস্তকে আমি বিষয়টির একটিমাত্র দিক তুলে ধরতে চাই। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে তিন ধর্মের আসমানী কালাম পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

তবে এ কাজে হাত দেয়ার আগে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে, আসমানী কালামের বর্তমান রূপ কতখানি আসল ও খাঁটি? এ প্রশ্নের জবাব

পেতে হলে যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে ঐ কালাম লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং যে পন্থায় ও প্রচারে তা আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে, তা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যে আসমানী কালামের পরীক্ষা নিরীক্ষা মাত্র সাম্প্রতিক কালে শুরু হয়েছে। শত শত বছর যাবত মানুষ ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট বাইবেল যেভাবে পেয়েছে, সেইভাবে মেনে নিয়েছে। ঐ বাইবেল পড়ে তারা সমর্থন ছাড়া আর কিছু করেনি। কারণ সামান্যতম সমালোচনাকেও তারা পাপ বলে গণ্য করেছে। পাদ্রীদের একটি সুবিধে ছিল এই যে, তাঁরা সমগ্র বাইবেল পড়েছেন এবং অবহিত হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের অধিকাংশই গির্জায় গিয়ে অংশ বিশেষের পাঠ শুনেছে মাত্র।

বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পরীক্ষায় মূল পাঠের সমালোচনা থেকে গুরুতর সমস্যার আবিষ্কার ও প্রচার হয়েছে। ফলে কোন তথাকথিত সমালোচনা পড়তে গিয়ে প্রায়ই হতাশ হতে হয়। কারণ দেখা যায় যে, মূলের ব্যাখ্যায় কোন প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সমালোচক এমন কোন বাক্য বা অনুচ্ছেদ উধৃত করেছেন, যা দেখে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি আসল সমস্যা লুকাতে চেষ্টা করেছেন। এ অবস্থায় বস্তুনিষ্ঠ বিচার ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তা প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, অসম্ভাব্যতা এবং স্ববিরোধিতা আগের মতই বহাল রয়েছে। অথচ বাইবেলের এ ধরনের বাক্য বা অনুচ্ছেদকে সঠিক বলে দাবী করার জন্য প্রচেষ্টার অন্ত নেই। এ প্রচেষ্টা চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী মানুষের আল্লার ওপর বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। অভিজ্ঞতায় অবশ্য দেখা যায় যে, কিছু কিছু লোক এ অসম্ভাব্যতা ও স্ববিরোধিতা সনাক্ত করতে পারলেও অধিকাংশ খৃষ্টান ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের যুক্তি বা সঙ্গতিবোধ প্রয়োগ করে না।

ইসলাম ধর্মের কোন কোন হাদীসকে গসপেলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথা এবং তাঁর কাজের বিবরণের সংকলনকে হাদীস বলা হয়ে থাকে। গসপেল ঈসার হাদীস ছাড়া অন্য কিছু নয়। কোন কোন হাদীস হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইন্তেকালের বহু বছর পরে লেখা হয়েছে। একইভাবে গসপেলও লেখা হয়েছে ঈসার ইন্তেকালের বহু বছর পরে। উভয় ক্ষেত্রে অতীতের ঘটনাবলীর ব্যাপারে মানুষের সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। তবে গসপেলের ব্যাপারে একটি পার্থক্য আছে। আমরা দেখতে পাব যে, চারটি ক্যানোনিক গসপেল যারা লিখেছেন, তাঁরা তাঁদের বর্ণিত ঘটনাবলীর চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন না। এ বইয়ের শেষভাগে উল্লেখিত কিছু হাদীসের ক্ষেত্রেও এ কথা।

তবে ঐ সাদৃশ্যের সমাপ্তি কিন্তু এখানেই। কারণ কোন কোন হাদীসের সত্যতা নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ গসপেলের ক্ষেত্রে গির্জার ইতিহাসের সেই গোড়ার দিকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সে সিদ্ধান্তে কেবলমাত্র চারখানি গসপেলকেই ক্যানোনিক অর্থাৎ সরকারী বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও অনেক বিষয়েই ঐ চারখানির মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে তথাপি ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের

পথে তা কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ঐ সিদ্ধান্তের পর অবশিষ্ট সকল গসপেল গোপন করে ফেলার হুকুম জারি করা হয়। এ কারণে তাদের বলা হয় 'এপোক্রিফা' অর্থাৎ আসল নয়।

খৃষ্টান ও ইসলামী গ্রন্থের আর একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছেঃ **খৃষ্টান** ধর্মে কোন আসমানী এবং লিখিত গ্রন্থ নেই। ইসলামের কুরআন আসমানীও এবং লিখিতও।

জিব্রাইল ফেরেশতার মারফত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর **নিকট** নাযিল করা আসমানী কালামই হচ্ছে কুরআন। নাযিল হওয়ার পরপরই ঐ কালাম লিখে ফেলা হয়, মুসলমানগণ মুখস্থ করে ফেলে, এবং নামাযে, বিশেষত রমযান **মাসের** নামাযে তা তেলাওয়াত করে থাকেন। মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই ঐ কালাম বিভিন্ন **সূরায়** বিভক্ত ও বিন্যস্ত করেন, এবং তাঁর ইন্তেকালের পরই (১২ থেকে ২৪ বছর সময়ের মধ্যে) খলিফা উসমানের শাসনকালে তা একখানি কিতাবের আকারে সংকলিত হয়। বর্তমানে আমরা যে কুরআন দেখতে পাই, তা হচ্ছে ঐ সংকলিত গ্রন্থ।[১]

পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের গ্রন্থ হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের পরোক্ষ বর্ণনার সংকলন। ঈসার জীবনের ঘটনাবলী নিজ চোখে দেখেছেন এমন কোন মানুষের বর্ণনা ওতে নেই। অথচ অনেক খৃষ্টানই তাই ধারণা করে থাকেন। খৃষ্টান ও ইসলামী গ্রন্থের সত্যতার বিষয়টি এখন এভাবেই ফয়সালা হয়ে গেছে।

আসমানী গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যের মোকাবিলার বিষয়টি সর্বদাই মানুষকে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে।

এক সময় ধরে নেয়া হত যে, কোন আসমানী গ্রন্থকে সত্য বলে মেনে নিতে হলে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। সেন্ট অগাস্টিন তাঁর ৮২ নম্বর চিঠিতে এ নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে কায়েম করেন। পরে আমরা এ চিঠি থেকে উধৃতি দেব। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাইবেল ও বিজ্ঞানের মধ্যে গরমিল রয়েছে। তখন স্থির করা হয় যে, অমন তুলনা আর করা হবে না। ফলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে আমরা আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাইবেল ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। আমরা অবশ্য এমন কোন আসমানী কালাম মেনে নিতে পারি না, যার বিবরণ ভুল ও অসত্য। এ অসামঞ্জস্যের মীমাংসা করার একটি মাত্র উপায় আছে, আর তা হচ্ছেঃ বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধী বক্তব্য যে অনুচ্ছেদে আছে, তা সত্য বলে গ্রহণ না করা। কিন্তু এ সমাধান গ্রহণ করা হয়নি। তার

---

১. আসলে এখানে একটু তথ্যের হেরফের হয়েছে। ১২ হিঃ সনে (৬৩৩ খ্রী) ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর খলীফা আবু বকরের (রাঃ) নির্দেশে কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে সংকলন করা হয়। উসমান (রাঃ) তার শাসনকালে এই সংকলটিনরই অনেকগুলি কপি তৈরী করিয়ে তা বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান- অনুবাদক।

বদলে বাইবেলই সত্য বলে সজোরে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে পাদ্রী বিশেষজ্ঞগণ এমন একটি অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যা বৈজ্ঞানিকের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

সেন্ট অগাস্টিন বাইবেল সম্পর্কে যা বলেছেন, সেই নীতিতে অবিচল থেকে ইসলাম সর্বদাই ধরে নিয়েছে যে, কুরআনের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক কালে ইসলামের অহী পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু ঐ নীতির কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। পরে আমরা দেখতে পাব যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বহু বিষয়ের বিবরণ কুরআনে রয়েছে। বাইবেলেও আছে, তবে বিষয়ের সংখ্যা অত বেশী নয়। বাইবেলের ঐ অল্পসংখ্যক বিষয় বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধী। পক্ষান্তরে কুরআনের অধিক সংখ্যক বিষয় বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এদিক থেকে এ দুই কিতাবের মধ্যে কোন তুলনাই হতে পারে না। কুরআনের কোন তথ্যই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকার করা যায় না, আমাদের গবেষণা থেকে এ মৌলিক সত্যই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এ বইয়ের শেষভাগে আমরা দেখতে পাব যে হাদীসের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। আগেই বলা হয়েছে যে, হাদীস হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর কথা ও কাজের বিবরণের সংকলন এবং কুরআনের অহী থেকে সর্ম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কোন কোন হাদীসের বিবরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। সত্যতা নির্ণয়ের জন্য খোদ কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগের যে নীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, সে নীতির ভিত্তিতেই ঐ হাদীসগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

কোন কোন আসমানী গ্রন্থের বিবরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার এ ব্যাপারটি আর একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রথমেই খুব জোর দিয়ে বলা দরকার যে, বৈজ্ঞানিক তথ্য বলতে এখানে কেবলমাত্র সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথাই বলা হয়েছে, যা সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত ও গৃহীত হয়েছে। এ মূলনীতির কথা মনে রাখলে দেখা যাবে যে, যে সকল ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বকথা একদা কোন বিষয় বা বস্তুর ওপর আলোকপাতের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির ফলে এখন তার আর তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, আমাদের বর্তমান বিবেচনা থেকে তা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়েছে। এখানে আমি কেবলমাত্র সেই সকল তথ্যই ব্যবহার করব, যা সকল তর্ক ও বিরোধের উর্ধে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে যদিও কেবলমাত্র অসম্পূর্ণ তথ্যই পাওয়া সম্ভব, তবুও সেই অসম্পূর্ণ তথ্যও এমনভাবে প্রমাণিত সর্বজন গৃহীত হবে যে, ভুল করার আর কোন আশংকাই থাকবে না।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, মানুষের দুনিয়ায় আগমনের কোন আনুমানিক তারিখও বৈজ্ঞানিকরা দিতে পারেন না। তবে তাঁরা মানুষের কর্মের এমন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন, যা আমরা ঈসার জন্মের দশ হাজার বছর আগের বলে নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারি। সুতরাং এ বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনাকে আমরা বৈজ্ঞানিক তথ্যের

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মেনে নিতে পারি না। কারণ বাইবেলের জেনেসিস নামক অধ্যায়ে যে তারিখ ও বংশ-ইতিহাস দেয়া হয়েছে, তাতে মানুষের দুনিয়ায় আগমনের (অর্থাৎ আদমের সৃষ্টির) সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ঈসার জন্মের প্রায় সাঁইত্রিশ শত বছর আগে। আমাদের বর্তমান হিসাবের চেয়ে আরও নিখুঁত ও নির্ভুল তথ্য বিজ্ঞান হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের দিতে পারবে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, বিজ্ঞান আমাদের কখনই বলবে না যে, মানুষ সর্বপ্রথম ৪'৭৩৬ বছর আগে দুনিয়ায় এসেছিল। ১৯৭৫ সালের হিব্রু ক্যালেন্ডারে ঠিক ঐ কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের দুনিয়ায় আগমন সম্পর্কে বাইবেলের তথ্য সম্পূর্ণ ভুল।

বিজ্ঞানের সঙ্গে এ মোকাবিলা থেকে সকল প্রকার প্রকৃত ধর্মীয় ব্যাপার বাদ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আল্লাহ কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় মুসার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, বিজ্ঞানে তার কোন ব্যাখ্যা নেই। কোন জৈবিক পিতা ছাড়া ঈসার জন্ম হওয়ার রহস্য সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। কোন আসমানী গ্রন্থেও এ সকল বিষয়ের কোন বস্তুগত ব্যাখ্যা নেই। এ পুস্তকে কেবলমাত্র সে সকল বিচিত্র প্রাকৃতিক ঘটনা বিবেচনা করা হয়েছে, আসমানী গ্রন্থে যার বর্ণনা আছে এবং ছোট বড় ব্যাখ্যাও আছে। এ কথা মনে রাখলে যে বিষয়টি অতি সহজেই আমাদের নজরে পড়ে তা হচ্ছে এই যে, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কুরআনে প্রচুর তথ্য আছে এবং ঐ একই বিষয়ে অপর দুখানি গ্রন্থে খুব কম তথ্য আছে।

আমি প্রথমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে এবং কোনরকম পূর্ব ধারণা না নিয়েই কুরআনের অহী পরীক্ষা করি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে কুরআনের বর্ণনার সামঞ্জস্যের দিকে নজর রাখি। কুরআনের তরজমা পড়ে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, ঐ গ্রন্থে নানা প্রকার প্রাকৃতিক ঘটনা ও বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে তখন আমার কোন বিস্তারিত জ্ঞান ছিল না। তারপর আমি যখন মূল আরবী ভাষায় কুরআন পড়তে ও পরীক্ষা করতে শুরু করি, তখন ঐ সকল ঘটনা ও বিষয়বস্তুর একটি তালিকা প্রস্তুত করতে থাকি। এভাবে তালিকা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, কুরআনে এমন একটি বর্ণনাও নেই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার বিরোধিতা করা যেতে পারে।

একই নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রেখে আমি ওল্ড টেস্টামেন্ট ও গসপেলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরীক্ষা চালাই। ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম পুস্তক জেনেসিস শেষ করার আগেই আমি দেখতে পাই যে, সেখানে এমন সব বর্ণনা রয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

তারপর গসপেলে হাত দিয়েই আমি একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রথম পৃষ্ঠাতেই ঈসার বংশ তালিকা রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মথির (ম্যাথিউ) বর্ণনার সঙ্গে লুকের বর্ণনার সুস্পষ্ট গরমিল রয়েছে। আর একটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রথম

দুনিয়ায় আগমনের ব্যাপারে লুকের বর্ণনা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

তবে আমার মনে হয়, এ সকল গরমিল, অসম্ভাব্যতা এবং অসামঞ্জস্য থেকে আল্লার ওপর বিশ্বাসের কোন অভাবের আভাস পাওয়া যায় না। ঐ গরমিলের ব্যাপার থেকে মানুষের দায়িত্বহীনতারই আলামত পাওয়া যায় মাত্র। মূল পাঠে কি ছিল তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। একইভাবে কল্পনার ভিত্তিতে কিভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে অথবা কিভাবে অজ্ঞাতসারে অহী সংশোধন করা হয়েছে, তাও এখন আর কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে যে ব্যাপারটি এখন অতি সহজেই আমাদের নজরে পড়ে, তা হচ্ছে এই যে, আমরা যখন বাইবেলের এ গরমিল ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠি, তখন বিশেষজ্ঞগণ হয় ভান করেন যে ওসব তাঁদের নজরে পড়েনি, আর না হয় কথার মারপ্যাঁচে তাঁরা একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। জন ও মথি লিখিত গসপেলের আলোচনার সময় আমি বিশেষজ্ঞদের এ সুচতুর বাক্যজালের উদাহরণ পেশ করব। অসম্ভাব্যতা ও স্ববিরোধিতাকে তাঁরা "সমস্যা" শব্দের আড়ালে গোপন করে থাকেন। এ "সমস্যা" লুকিয়ে ফেলার প্রচেষ্টায় তাঁরা সাধারণত সফল হয়ে থাকেন। এ কারণে বহু খৃষ্টানই ওল্ড টেস্টামেন্ট ও গসপেলের এ সকল মারাত্মক ত্রুটি সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন। এ বইয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠক এ অবস্থার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দেখতে পাবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ওহীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত আছে। আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ জ্ঞান প্রয়োগ করে কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অর্থ আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এ আয়াতগুলির অর্থ এতদিন অবোধ্য না হলেও রহস্যময় ছিল। এতে অবশ্য বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইসলামের ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞান সর্বদাই সহোদর বলে গণ্য হয়েছে। সেই শুরুতেই ইসলাম বিজ্ঞান চর্চার নির্দেশ দিয়েছে এবং সে নির্দেশ পালন করার ফলেই ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, তা থেকে রেনেসাঁর আগে পাশ্চাত্য জগতও বিশেষভাবে লাভবান হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কুরআনের কোন কোন আয়াতের উপর যে আলোকপাত করেছে, তার ফলে অহী ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক মোকাবিলায় সমঝোতা ও উপলব্ধির একটি প্রসারিত দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে ঐ আয়াতগুলি ইতিপূর্বে অস্পষ্ট ও অবোধগম্য ছিল।

ওল্ড টেস্টামেন্টঃ সাধারণ সীমানা

ওল্ড টেস্টামেন্টের লেখক কে? এ প্রশ্নের জবাবে ওল্ড টেস্টামেন্টের অধিকাংশ পাঠকই সম্ভবত সেই কথা বলবেন, যা তাঁরা বাইবেলের ভূমিকায় পড়েছেন। তাঁরা হয়ত বলবেন যে, হোলি ঘোষ্টের (জিব্রাইল) প্রেরণায় মানুষে লিখে থাকলেও আসল লেখক

হচ্ছেন আল্লাহ।

বাইবেলের ভূমিকা লেখক কখনও এটুকু বলেই থেমে যান। ফলে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। কখনও তিনি আবার এ কথাও বলে থাকেন যে, মূল পাঠের সঙ্গে পরে হয়ত মানুষের রচনাও সংযোজিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে জন্য কোন বিতর্কমূলক অনুচ্ছেদের মূল "সত্য" পরিবর্তিত হয়নি। এবং এ "সত্য" শব্দটির ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। গির্জা কর্তৃপক্ষই এ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। কেননা একমাত্র তারাই হোলি ঘোষ্টের সহায়তায় বিশ্বাসী খৃষ্টানদের প্রকৃত পথ দেখাতে পারেন। চতুর্থ শতাব্দীতে খৃষ্টান পরিষদ সমূহের সম্মেলনের পর গির্জা কর্তৃপক্ষই পবিত্র গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করেন এবং ঐ তালিকা ফ্লোরেন্স কাউন্সিল (১৪৪১), ট্রেন্ট কাউন্সিল (১৫৪৬) ও প্রথম ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলে (১৮৭০) অনুমোদিত হয়। সে অনুমোদিত গ্রন্থগুলিই এখন সমবেতভাবে ক্যানন নামে পরিচিত। বহু গবেষণা ও পর্যালোচনার পর দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিল অতি সম্প্রতি অহী সম্পর্কে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছেন। এ কাজে তিন বছরের (১৯৬২-৬৫) একাগ্রতা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। অধিকাংশ পাঠক বাইবেলের আধুনিক সংস্করণের শুরুতে এ বিবরণ দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন। বাইবেলের সত্যতা সম্পর্কে বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত প্রদত্ত নিশ্চয়তার বর্ণনা পড়ে তারা নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হয়েছেন। এ সম্পর্কে যে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন কথা তাদের আদৌ মনে হয়নি।

পাদ্রীদের এমন অনেক রচনা আছে, যেগুলি সাধারণত সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয় না। এ রচনা পড়লে বুঝা যায়, বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের সত্যতা সম্পর্কিত বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে যত জটিল বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু তা তার চেয়ে অনেক বেশী জটিল। উদাহরণ হিসেবে বাইবেলের আধুনিক ফরাসী তরজমার কথা বলা যেতে পারে। জেরুসালেমের বাইব্লিক্যাল স্কুলের তত্বাবধানে এ তরজমা করা হয়েছে এবং কয়েকটি খন্ডে প্রকাশিত (প্রকাশক সার্ফ, প্যারিস) হয়েছে। এ তরজমা পরীক্ষা করলে প্রকাশভঙ্গিতে একটি সুস্পষ্ট ভিন্নতা ধরা পড়ে। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, নিউ টেস্টামেন্টের মত ওল্ড টেস্টামেন্টেও এমন কিছু বিতর্কমূলক প্রশ্ন আছে, ব্যাখ্যাতাগণ যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোপন করেননি।

প্রফেসর এডমন্ড জ্যাকোবের গ্রন্থে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের নাম দি ওল্ড টেস্টামেন্ট, (ফরাসী নাম লা এনাছিয়েন টেস্টামেন্ট, প্রকাশক প্রেসেস ইউনিভার্সিটেয়ার্স দ্য ফ্রান্স, প্যারিস)। সংক্ষিপ্ত অথচ খুবই নিরপেক্ষ প্রকৃতির এ গ্রন্থে একটি উত্তম বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

এডমন্ড জ্যাকোব বলেছেন, অনেকেই অবহিত নন যে, আদিতে একখানি মাত্র নয়, কয়েকখানি বাইবেল ছিল এবং তাদের পাঠও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় শতাব্দীতে হিব্রু ভাষায় কমপক্ষে তিনখানি পৃথক পৃথক পাঠের পুস্তক ছিল। প্রথমখানি

পরবর্তী কালে মাসোরোটিক নামে অভিহিত হয়, দ্বিতীয়খানি আংশিকভাবে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয় এবং তৃতীয়খানি সামারিটান গ্রন্থ নামে পরিচিত হয়। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে প্রথম শতাব্দীতে ঐ তিনখানির ভিত্তিতে ও বদলে একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রবর্তনের একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু সেই প্রবণতা বাস্তব রূপ লাভ করে খৃষ্টের জন্মের এক শতাব্দী পরে, তখনই বাইবেলের একটিমাত্র পাঠ সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়।

ঐ তিনটি পাঠই যদি আমরা পেতাম, তাহলে তুলনা করা সহজ হয়ে যেত এবং আদি পাঠ বা মূল পাঠ যে কি ছিল, সে সম্পর্কে আমরা একটি ধারণায় উপনীত হতে পারতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমন কোন সুযোগ আমাদের সামনে নেই। ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, কামরান গুহায় পাওয়া ঈসার আমলের নিকটবর্তী খৃষ্টান পূর্বকালীন সময়ের ডেড সি স্ক্রোল (বাহরে লুত-এ পাওয়া লিখন), মূল পাঠের একটি ভিন্নরূপ সম্বলিত ও গাছের পাতায় লিখিত খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দীর টেন কম্যান্ডমেন্টস (দশ ফরমান) এবং খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দীর কিছু বিচ্ছিন্ন রচনা (কায়রোর গেনিজা) ছাড়া বাইবেলের যে প্রাচীনতম হিব্রু পাঠ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী শতাব্দীর।

সেপচুয়াজিন্ট সম্ভবত গ্রীক ভাষায় প্রথম অনুবাদ। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে তৃতীয় শতাব্দীতে ইহুদীগণ আলেকজান্দ্রিয়ায় এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের ভিত্তিতেই নিউ টেষ্টামেন্ট প্রণীত হয়। খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থ সহী বলে গণ্য হয়। খৃষ্টান জগতে যে মূল গ্রীক পাঠ সাধারণভাবে প্রচলিত আছে, তা ভ্যাটিক্যান সিটিতে রক্ষিত কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস এবং লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত কোডেক্স সিনাইটিকাস নামক পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত। এ দুটি পাণ্ডুলিপি খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীর।

খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দীতে সেন্ট জেরোস হিব্রু দলিলাদির ভিত্তিতে ল্যাটিন ভাষায় একটি পাঠ প্রস্তুত করেন। সপ্তম শতাব্দীর পর সর্বত্র প্রচলিত হওয়ায় এ গ্রন্থ বালগেট নামে অভিহিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আরমাইক ও সিরিয়াক (পেশিত্তা) সংস্করণেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এগুলি অসম্পূর্ণ।

এ সকল বিভিন্ন সংস্করণ থেকে বিশেষজ্ঞগণ একখানি 'মধ্যপন্থী' গ্রন্থ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাকে বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে একটি আপোস অভিহিত করা যেতে পারে। এ ছাড়া দ্বিভাষিক ও ত্রিভাষিক বাইবেলও রয়েছে এবং তাতে গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, সিরিয়াক, আরমাইক এবং এমনকি আরবী ভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে। বিখ্যাত ওয়ালটন বাইবেল (লন্ডন, ১৬৫৭) এরূপ একখানি গ্রন্থ। সকল বিষয় বিবেচনার স্বার্থে আর একটি ব্যাপার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন মতের খৃষ্টান গির্জায় একই গ্রন্থ অনুসরণ করা হয় না অথবা একই ভাষায় তরজমার ব্যাপারে একই ভাবধারা গ্রহণ করা

হয় না। এর কারণ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করা হয়েছে এবং তা ভিন্ন ভিন্ন গির্জা গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিশেষজ্ঞগণ দি একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন অব দি ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে যে গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত আছেন তা একক ও সমন্বিত গ্রন্থ বলে পরিগণিত হতে পারে। (ইংরাজী অনুবাদকের মন্তব্য-১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এটা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- লে এডিশন্স ডু সার্ফ এবং লে বাজার্স এট লে মাজেস, প্যারিস)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে মানুষের হস্তক্ষেপ একটি বিরাট ভূমিকা পালন করছে। এক সংস্করণ থেকে অপর সংস্করণে এবং এক তরজমা থেকে অপর তরজমায় স্বাভাবিকভাবে যে সকল রদবদল ও সংশোধন হয়েছে, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, বিগত দুই হাজার বছরেরও বেশী সময়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের মূল একাধিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

বাইবেলের উৎস

বইয়ের আকারে সংকলিত হওয়ার আগে বাইবেল লোকপ্রবাদ হিসাবে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং সুর করে গানের মতও গাওয়া হত। অন্যান্য সকল প্রাচীন ধারণার মত এ লোক প্রবাদও সম্পূর্ণরূপে স্মৃতি-নির্ভর ছিল।

এডমন্ড জ্যাকোব লিখেছেন- "প্রথম পর্যায়ে সকল জাতিই গান গেয়েছে। অন্যান্য সকল জায়গার মত ইসরাইলেও গদ্যের আগে পদ্য এসেছে। সেখানে দীর্ঘ দিন গান গাওয়া হয়েছে এবং ভালই গাওয়া হয়েছে। ইসরাইল জাতি তাদের ইতিহাসের ঘটনাবলী নিয়ে গভীর অনুভূতির সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার গান গেয়েছে। তাদের চোখে প্রত্যেকটি ঘটনার একটি তাৎপর্য ছিল। তাই গানের মারফত তারা তা বিভিন্ন আকারেও প্রকাশ করেছে। তারা বিভিন্ন কারণে গান গাইত এবং এডমন্ড জ্যাকোব তার অনেকগুলি উল্লেখও করেছেন। বাইবেলেও অনেক গানের উল্লেখ আছে- খানার গান, ফসল কাটার গান, কাজের গান, কুপের গান (গণনা পুস্তক ২১ ও ১৭), বিয়ের গান ও শোকের গান। অনেক যুদ্ধের গানও আছে, তার মধ্যে ডেবোবার গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (বিচারকগণ ৫, ১-৩২)। কেননা এ গানে খোদ ইয়াহউয়ের নির্দেশিত ও পরিচালিত বিজয়ের জয়গান করা হয়েছে (গণনাপুস্তক ১০ ও ৩৫) - "মৈত্রীশক্তি অগ্রসর হলে মূসা বললেন, হে ইয়াহউয়ে! জাগ্রত হউন! আপনার শত্রুগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হউক, এবং আপনাকে যারা ঘৃণা করে তারা আপনাকে দেখামাত্র পলায়ন করুক।"

এছাড়া আরও আছে উপদেশক ও হিতোপদেশ (বুক অব প্রোভার্বস, ইতিহাস পুস্তকের প্রোভার্বস এন্ড ম্যাকসিমস), আশির্বাণী ও অভিশাপবাণী, এবং অহী পাওয়ার পর মানুষের প্রতি দেয়া পয়গম্বরদের বিধান।

জ্যাকোব বলেছেন, এ সকল কথা ও কাহিনী হয় পরিবার থেকে পরিবারে প্রবাহিত হয়েছে, আর না হয় ধর্মশালা মারফত আল্লার বাছাই করা জাতির ইতিহাসের বিবরণ হিসেবে প্রচারিত হয়েছে। তারপর ইতিহাস দ্রুত প্রবাদে পরিণত হয়েছে, যেমন হয়েছে জোথামের প্রবাদের ক্ষেত্রে (বিচারকগণ ৯, ৭-১২)। এ প্রবাদে "বৃক্ষগণ তাদের একজন রাজা বাছাই ও তাকে অভিষিক্ত করতে অগ্রসর হল, এবং পরপর জলপাই গাছ, ডুমুর গাছ, দ্রাক্ষালতা ও বেতসলতাকে অনুরোধ জানাল।" এ বর্ণনায় জ্যাকোব লক্ষ্য করলেন, "ভাল গল্প বলার উৎসাহে কথকগণ অপরিচিত বিষয় বা যুগের অসম্ভাব্যতা নিয়ে মাথা ঘামাননি।" এবং এ কারণে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন- "ওল্ড টেস্টামেন্টে মূসা ও প্রধানদের বিষয়ে যে বর্ণনা আছে, তা থেকে সম্ভবত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটি মোটামুটি ক্রমিকতা পাওয়া যেতে পারে। কথকগণ মৌলিক বর্ণনার সময় মাধুর্য ও কল্পনার সাহায্যে হয়ত এমন অনেক বিচিত্র কাহিনীর অবতারণা করেছেন, পরবর্তী কালে যেগুলি অনেক সচেতন চিন্তাবিদের কাছেও মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টির আদিকথা বলে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।"

একথা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে, খৃষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহুদীগণ যখন কেনানে বসতি স্থাপন করে, তখন প্রবাদ সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য লেখার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু যে বিষয়ে তখন সর্বাধিক স্থায়িত্ব আশা করা হত, সেই আইন লিখন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে পরিপূর্ণ নির্ভুলতা ছিল না। কারণ দেখা যাচ্ছে, যে আইন আল্লার নিজের হাতেই লেখা বলে ধরা হয়, সেই দশ ফরমানই ওল্ড টেস্টামেন্টের দুই জায়গায় দুই প্রকারে এসেছে- জোডাস (২০, ১-২১) এবং ডিউটারোনমি (৫, ১-৩০)। মূল বক্তব্য হয়ত ঠিকই আছে, কিন্তু শব্দ প্রয়োগ, প্রকাশভঙ্গি ও বাগধারার পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। তখন চিঠিপত্র, চুক্তি, বিশিষ্ট লোকদের (বিচারক, পদস্থ পৌর কর্মকর্তা) নামের তালিকা, নছবনামা এবং গনিমত ও নজরানার মালের তালিকা লিখিত আকারে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এ সকল দলিল সংরক্ষণ করার জন্য দফতরখানা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এ সকল দলিলের ভিত্তিতে বই রচিত হয়েছে এবং কিছু কিছু বই আমাদের পর্যন্তও এসে পৌঁছেছে। গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় প্রত্যেকটি বইতে একাধিক প্রকারের রচনা ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় একই বইতে বিভিন্ন লেখকের রচনা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ সম্ভবত এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রাথমিকভাবে মৌলিক প্রবাদ ভিত্তিক হলেও বর্ণনায় অসংলগ্নতা আছে। এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ গ্রন্থের গ্রন্থনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে অপর কোন সময় ও স্থানের প্রাচীন সাহিত্য সৃষ্টির আদি প্রক্রিয়ার তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ ফ্রাংক-রাজবংশের আমলে ফরাসী সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিবেচনা

করা যেতে পারে। যুদ্ধ, বিশেষত খৃষ্টান ধর্ম রক্ষার যুদ্ধ, বীরপুরুষদের বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং অন্যান্য চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ তখনও ঐ মৌখিক প্রবাদেই সংরক্ষিত হত। ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরেও এ সকল প্রবাদ কবি, লেখক ও ইতিহাসবিদদের অনুপ্রাণিত করেছে। এভাবে একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে এ সকল বাস্তব ও কল্পনা মিশ্রিত কাহিনীর ভিত্তিতে কাব্য ও মহাকাব্য রচনা শুরু হয়। তার মধ্যে "রোলাঁ সঙ্গীত"-ই সবচেয়ে বিখ্যাত। সম্রাট শার্লিমেন যখন স্পেন অভিযান থেকে ফিরে আসেন, তখন রোলাঁ (লা শানসন দ্য রোলাঁ) তাঁর পশ্চাদরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। এ কাব্যগাথায় তাঁর জীবন, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আত্মত্যাগের ঘটনাটি আদৌ কল্পনা নয়। ৭৭৮ সালের ১৫ আগস্ট পর্বতবাসী বাস্ক উপজাতির হামলার সময় ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল। সুতরাং কাব্যের বর্ণনাটি কাল্পনিক নয়। তার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কিন্তু তথাপি কোন ইতিহাসবিদ সম্ভবত কাব্যের ঐ বর্ণনাকে বিশুদ্ধ ইতিহাস বলে মেনে নিতে রাজি হবেন না।

বাইবেল গ্রন্থনার প্রক্রিয়াও ঠিক এভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। যাঁরা আল্লার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তাঁরা পুরো বাইবেলকেই কিংবদন্তি ও কাল্পনিক কাহিনীর সংকলন বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। সৃষ্টির বাস্তবতা, আল্লার কাছ থেকে মূসার ওপর দশ ফরমান নাযিল হওয়া এবং সোলাইমানের আমলের মত মানুষের ব্যাপারে গায়েবী হস্তক্ষেপের ঘটনায় বিশ্বাস করা খুবই সম্ভব। কিন্তু তাই বলে আমাদের বিশ্বাস সর্বাত্মক হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা অবশ্যই ধরে নিতে পারি যে, বাইবেল মারফত আমরা যা পাচ্ছি, তা মূল ঘটনার সারসংক্ষেপ মাত্র এবং যে সকল বিস্তারিত বিবরণ আছে তা কঠোর সমালোচনা ও পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। কারণ মূল মৌখিক প্রবাদ যখন লিখিত আকার লাভ করেছে, তখন মানুষের কল্পনা ও অলংকরণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন পুস্তক

ওল্ড টেস্টামেন্ট বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, আকার ও প্রকারের রচনার একটি সংকলন। মৌখিক প্রবাদের ভিত্তিতে এগুলি নয় শতাধিক বছর যাবত বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন সময়ে, বহুদিন পর পর, কোন ঘটনার ভিত্তিতে অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনবশত অনেক রচনাই সংশোধন ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

এ বিপুল রচনাবলী সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের পূর্বে একাদশ শতাব্দীতে ইসরাইলী রাজবংশের রাজত্বকালের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। ঐ সময় রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই লেখক ছিলেন। তাঁরা বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তাদের ভূমিকা কেবলমাত্র লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে অসম্পূর্ণ

রচনার উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথমটি সম্ভবত এ আমলেই রচিত হয়েছে। তখন এগুলির লিখিত আকার দেয়ার একটি বিশেষ কারণও ছিল। তৎকালে বহু সংগীত, কাব্যগাথা, ইয়াকুব ও মূসার নসিহত, দশ ফরমান, এবং ধর্মীয় রেওয়াজ সৃষ্টিকারী রাজকীয় হুকুমনামা সংরক্ষণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন পুস্তকে এখন এগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

আরও কিছুদিন পরে সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের পূর্বে দশম শতাব্দীতে পেনটাটিউকের 'ইয়াহভিষ্ট' গ্রন্থ রচিত হয়। এ গ্রন্থে আল্লাকে ইয়াহওয়ে নামে অভিহিত করা হয় বলে গ্রন্থের ঐ নাম রাখা হয়। মূসার নামে যে প্রথম পাঁচখানি গ্রন্থ চালু আছে, তার মূলসূত্র হচ্ছে এ গ্রন্থ। পরে তার সঙ্গে 'ইলোহিষ্ট' নামক রচনা, এবং তার 'স্যাকারডোটাল' সংস্করণও যোগ করা হয়। আল্লাহকে 'ইলোহিম' নামে অভিহিত করায় রচনাটিকে ইলোহিষ্ট বলা হয়। আর জেরুসালেম মন্দিরের স্যাকারডোট নামক প্রচারকদের নাম অনুসারে তাদের সংস্করণটি স্যাকারডোটাল নামে পরিচিত হয়। দক্ষিণের জুডাহ রাজ্য থেকে পাওয়া ঐ প্রাথমিক ইয়াহভিষ্ট রচনায় দুনিয়ার আদিকাল থেকে ইয়াকুব-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর শেষভাগে এবং অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পয়গম্বর হিসাবে ইলিয়াস ও ইলশার প্রভাব প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। তাঁদের গ্রন্থ এখনও রয়েছে। এ সময়টি ইলোহিষ্ট গ্রন্থের সময়কাল, তবে এ গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর মেয়াদ ইয়াহভিষ্ট গ্রন্থের মেয়াদের চেয়ে অনেক কম; কারণ এ কিতাবে কেবলমাত্র ইব্রাহীম, ইয়াকুব ও ইউসুফ সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। জোশুয়া ও বিচারকগণের গ্রন্থও এ আমলের।

খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতেই লেখক পয়গম্বরদের আবির্ভাব হয়। ইসরাইলে আমোস ও হোসিয়া নামক দুজন এবং জুডায় মিকাহ নামক একজন লেখক-পয়গম্বরের খবর পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব ৭২১ সালে সামারিয়ার পতনের ফলে ইসরাইল রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য জুডাহ রাজ্যের হাতে চলে যায়। ধর্মীয় কিংবদন্তি সংগ্রহের কাজ এ সময় থেকে শুরু হয়। এ সময়ই ইয়াহভিষ্ট ও ইলোহিষ্টের রচনাবলী একত্রিত করে তৌরাত নামে একখানি মাত্র গ্রন্থে রূপান্তরিত করা হয়। এ সময় ডিউটারোনামিও লেখা হয়।

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জোশিয়ার রাজত্বকালে পয়গম্বর জেরোনিয়ার আবির্ভাব হয়, কিন্তু তাঁর বাণী ও কর্মের বিবরণ লিখিত আকার লাভ করে আরও এক শতাব্দী পরে।

খৃষ্টপূর্ব ৫৯৮ সালে ব্যাবিলনে প্রথম দেশান্তরিত হওয়ার পূর্বে জেকানিয়া, নাহুম ও হাবাক্কুকের গ্রন্থ লিখিত হয়। এ সময়ের পরে এজেকিয়েল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করতে থাকেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে দ্বিতীয়বার দেশান্তরিত হওয়ার কাজ শুরু হয়

জেরুসালেমের পতনের সময় এবং তা খৃষ্টপূর্ব ৫৩৮ সাল পর্যন্ত চলে।

এজেকিয়েল একজন বিখ্যাত পয়গম্বর ছিলেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থ বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায় তাঁর জীবদ্দশায় সে আকারে সাজানো ছিল না। তাঁর ইন্তেকালের পর যে কাতিবগণ ঐ ভাবে সাজান, তাঁরাই তাঁর আধ্যাত্মিক খলিফা বলে গণ্য হন। এ কাতিবগণ স্যাকারজোলটাল সংস্করণ নামে পরিচিত জেনেসিসের তৃতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করেন। এ সংস্করণে জেনেসিসের একটি অধ্যায়ের অর্থাৎ পৃথিবীর আদিকাল থেকে ইয়াকুবের ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়ের বিবরণ আছে। এভাবে তৌরাতের ইয়াহভিষ্ট ও ইলোহিষ্ট রচনার মূল পাঠের মধ্যে একটি তৃতীয় রচনা শামিল হয়ে যায়। পরে আমরা দুই থেকে চার শতাব্দী আগে লেখা কয়েকখানি গ্রন্থে এ তৃতীয় রচনার একটি কৌশলগত বৈশিষ্ট দেখতে পাব। এ একই সময় ল্যামেনটেশনসও (বিলাপ) প্রকাশিত হয়।

খৃষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে সাইরাসের হুকুমে দেশান্তরিত হওয়ার অবসান ঘটে। ইহুদীরা ফিলিস্তিনে ফিরে আসে এবং জেরুসালেমের মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হয়। ফলে পয়গম্বর ও প্রচারকদের কাজ পুনরায় শুরু হয়। এ সময় হাজ্জাই, জাকারিয়া, মালাচি ও ডানিয়েলের গ্রন্থ এবং ইসাইয়ার তৃতীয় গ্রন্থ ও বারুচের গ্রীক ভাষার গ্রন্থ প্রণীত হয়।

আসলে দেশান্তরের ঘটনার পরবর্তী আমলে প্রধান প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থগুলি রচিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৪৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে প্রোভার্বস, পঞ্চম শতাব্দীতে জব এবং তৃতীয় শতাব্দীতে একলেজিয়াস্ট বা কোহেলেথ, সঙ অব সঙস, ক্রনিকেলস প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড এবং এজরা ও নেমোলিয়া রচিত হয়। একইভাবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে একলোজিয়াসটিকাস বা সিরাহ্ এবং প্রথম শতাব্দীতে বুক অব উইজডম ও বুক অব মাকাবিজ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড লিখিত হয়। কিন্তু রুথ, ইসথার ও জোনার গ্রন্থ যে কখন লেখা হয় তা সহজে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তৌরাত ও জুডিথের গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলতে হয়। যেহেতু খৃষ্টের জন্মের মাত্র এক শতাব্দী আগে ওল্ড টেস্টামেন্টের রচনাবলী গ্রন্থের আকারে সাজানো হয়েছে, সেহেতু এখানে যে সকল তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরেও সংশ্লিষ্ট রচনাগুলির পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে থাকতে পারে বলে ধরে নিতে হবে। কারণ খৃষ্টের জন্মের এক শতাব্দীর পূর্বকালে এ রচনাগুলির অধিকাংশই কোন সঠিক বা সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করেনি।

এভাবে আদিকাল থেকে খৃষ্টান ধর্মের আবির্ভাব পর্যন্ত ইহুদীগণ ওল্ড টেস্টামেন্টকে তাদের ধর্মীয় ও সাহিত্যিক মিনার বলে গণ্য করেছে। এ গ্রন্থের বিভিন্ন খন্ড, অধ্যায় ও বিভাগ খৃষ্টপূর্ব দশম ও প্রথম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত, সমাপ্ত ও সংশোধিত হয়েছে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত নয়। এ তথ্য এবং ঐতিহাসিক জরিপের বিবরণ আমি একখানি সর্বজন স্বীকৃত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি। গ্রন্থখানি হচ্ছে সলকয়ের ডোমিকান ফ্যাকালটির প্রফেসর জে পি স্যানড্রোল রচিত

এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সালিস (প্যারিস ১৯৭৪, তৃতীয় খন্ড, ২৪৬-২৫৩ পৃষ্ঠা), 'দি বাইবেল' নামক নিবন্ধ। এ সকল তথ্য উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ সত্য ও সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং ওল্ড টেস্টামেন্টের বিষয়বস্তু অনুধাবন ও উপলব্ধি করার জন্য এ তথ্যগুলি মনে রাখা দরকার।

ওল্ড টেস্টামেন্টের রচনাবলীর মধ্যে অহী মিশ্রিত ছিল বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। কিন্তু এখন গ্রন্থখানি আমরা যে অবস্থায় পেয়েছি, তাতে সেই অহী আর অবশিষ্ট আছে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ আমরা আগেই দেখেছি মূল বর্ণনা অনেকবার রদবদল হয়েছে এবং অনেক লেখকই হস্তক্ষেপ করেছেন। সুতরাং সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পছন্দ অনুসারে যা ভাল মনে করেছেন, শুধু সেইটুকুই অবশিষ্ট রেখেছেন এবং এখন আমাদের পর্যন্ত শুধু সেইটুকুই এসেছে।

এ সকল বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের সংগে বর্তমানে প্রচারিত বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণের ভূমিকায় প্রদত্ত বিবরণের তুলনা করা হলে দেখা যাবে যে, আসল তথ্য ও সত্য সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থের রচনার ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। দ্ব্যর্থবোধক হওয়ায় যে সকল বিষয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলি ঠিক সেভাবেই রেখে দেয়া হয়েছে। অসত্যকে সত্য বলে একটি ভুল ধারণা সৃষ্টির জন্য তথ্যের ব্যাপারটি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছে। এভাবে বাইবেলের অধিকাংশ ভূমিকাতেই সত্য ও বাস্তবতা গোপন করে একটি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যে সকল গ্রন্থ কয়েকবার রদবদল করা হয়েছে (যেমন পেন্টাটিউক) সে সকল ক্ষেত্রে সরাসরি সে কথা না বলে শুধু বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু খুটিনাটি বিষয় পরে যোগ করা হয়ে থাকতে পারে। কোন কোন গ্রন্থে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন বিষয়ে দীর্ঘ ব্যাখা দেয়া হয়েছে, কিন্তু আসলেই যেখানে দীর্ঘ ব্যাখার প্রয়োজন সেখানে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। জনসাধারণের জন্য বিপুল সংখ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত বাইবেলে এ ধরনের ভুল ও অশুদ্ধ তথ্য থাকা সত্যিই দুঃখজনক।

তৌরাত বা পেন্টাটিউক

তৌরাত অর্থাৎ তোরাহ নামটি সেমিটিক। গ্রীক ভাষায় বলা হয় পেন্টাটিউক। অর্থাৎ পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ। পাঁচটি খন্ড হচ্ছে জেনোসিস, এক্সোডাস, লোভিটিকাস, নাম্বারস এবং ডিউটারোনমি। ওল্ড টেস্টামেন্টে যে উনত্রিশটি খন্ডের সংগ্রহ আছে, তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এ পাঁচটি।

এ গ্রন্থে দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে ইহুদীদের কিনানে প্রবেশ করা পর্যন্ত সময়ের বিবরণ আছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইহুদীদের মিসরে নির্বাসিত হওয়ার পর এবং

আরও সঠিকভাবে মূসার ইন্তেকালের পর তাদের ঐ দেশ দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের জন্য বিবিধ বিধানও দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ গ্রন্থ ল (আইন) বা তোরাহ (তৌরাত) নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে মুসাকেই বহু শতাব্দী যাবত তৌরাতের লেখক বলে মান্য করা হয়েছে। এ ধারনার ভিত্তি সম্ভবত এই যে, আল্লাহ মূসাকে বললেন- "এ ঘটনা (আমালেকের পরাজয়) স্মারক হিসাবে গ্রন্থে লিখে রাখ।" (এক্সোডাস ১৭, ১৪)। অথবা মিসর থেকে ইহুদীদের বেরিয়ে যাওয়ার সময়ের ঘটনার বর্ণনায় যেমন আছে "মূসা তাদের রওয়ানা হওয়ার স্থান সমূহের নাম লিখে রাখলেন।" -(নাম্বারস ৩৩, ২) এবং "মূসা এ আইন লিখলেন।" (ডিউটারোনমি ৩১, ৯১)। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই মূসা তৌরাতের লেখক হিসেবে গণ্য হয়ে আসছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ফ্লাবিয়াস জোসেফাস এবং ফিলো ঐ একই ধারণা পোষণ করেছেন।

বর্তমানে অবশ্য এ ধারণা সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে এবং সকলেই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। তবুও নিউ টেস্টামেন্টে আবার মূসাকেই লেখক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রোমানদের কাছে লেখা চিঠিতে (১০, ৫) লেভিটিকাস থেকে উধৃতি দিয়ে পল বলেছেন, "মূসা লিখেছেন, যে ব্যক্তি আইনে বর্ণিত মতে সদাচরণ করে" ইত্যাদি। জন তাঁর গসপেলে (৫, ৪৬-৪৭) ঈসার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন- "তোমরা যদি মূসাকে বিশ্বাস করে থাক, তাহলে আমাকেও বিশ্বাস করবে; কারণ তিনি আমার সম্পর্কে লিখে গেছেন। কিন্তু তোমরা যদি তাঁর লেখাই বিশ্বাস না কর, তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করবে কেমন করে?" এখানে তরজমা এবং ভাব প্রকাশে সম্পাদনা, অর্থাৎ রদবদলের আলামত পাওয়া যায়। কারণ গ্রীক ভাষায় মূল বর্ণনায় 'এপিসটেউয়েট' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ কথাটি ঈসার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে। অথচ এখানে দেখানো হয়েছে যে, তিনি নিজেই বলেছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কিভাবে আমি তা ব্যাখ্যা করছি।

এ ব্যাখ্যার কাঠামো ও নজির আমি জেরুসালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান ফাদার দ্য ভক্স-এর কাছ থেকে নিয়েছি। তিনি ১৯৬২ সালে জেনেসিসের যে ফরাসী তরজমা করেন, তার ভূমিকায় পেন্টাটিউকের একটি মূল্যবান যুক্তিপূর্ণ পরিচিতি দেন। ইভানজেলিস্টগণ মূসাকে তৌরাতের লেখক বলে যে পরিচয় দিয়ে থাকেন, তিনি তা স্বীকার করেননি বরং বিপরীত কথাই বলেছেন। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "ঈসা ও তার সাহাবাগণ যে ইহুদী রেওয়াজ অনুসরণ করতেন," তা মধ্যযুগের শেষভাগ পর্যন্ত মেনে নেয়া হত। একমাত্র যিনি এ মতবাদের ঘোর বিরোধিতা করেছেন, তিনি হচ্ছেন দ্বাদশ শতাব্দীর আবেনেজরা। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে কালস্টাড উল্লেখ করেন যে, মূসার পক্ষে বোধ হয় ডিউটারোনমিতে (৩৪, ১৫-১২) তাঁর নিজের ইন্তেকালের বিবরণ লিখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি এমন কয়েকজন সমালোচকের

লেখা থেকেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাঁরা সম্পূর্ণ না হলেও তৌরাতের অংশ বিশেষ মূসার রচনা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তবে এ ব্যাপারে অরেটরির ফাদার রিচার্ড সাইমনের ভূমিকাই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর "ক্রিটিকাল হিষ্ট্রি অব দি ওল্ড টেস্টামেন্ট" (হিস্টোয়ার ক্রিটিক দু ভাইয়াক্স টেস্টামেন্ট-১৬৭৮) নামক পুস্তকে তৌরাতের ঘটনাক্রমের অসঙ্গতি, একই বিষয়ের বহু পুনরাবৃত্তি, কাহিনীর সামঞ্জস্যহীনতা এবং রচনাশৈলীর বিভিন্নতা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন। এ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বত্র একটি লজ্জাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে ইতিহাসের কোন পুস্তকেই রিচার্ড সাইমনের যুক্তিধারা আর তেমন অনুসরণ করা হয়নি। তখন প্রাচীন ঘটনার প্রসঙ্গে "মূসা লিখেছেন," এ কথাই বলা হয়েছে। একটু আগে আমরা দেখেছি ঈসা নিজে নিউ টেস্টামেন্টে মূসার তৌরাত লেখার কথা সমর্থন করেছেন। ফলে একটি প্রাচীন কিংবদন্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে। এ অবস্থায় তার বিরোধিতা করা যে কত কঠিন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তবে পঞ্চদশ লুইয়ের চিকিৎসক জাঁ আসটুকই সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে গেছেন।

১৭৫৩ সালে তাঁর "কনজেকচার্স অন দি অরিজিনাল রাইটিংস হুইচ টু এপিয়ার্স্ই মোজেজ ইউজড টু কম্পোজ দি বুক অব জেনেসিস (কনজেকচার্স সুলে মেমোয়ার্স অরিজিনক্স ডন্টহল পরাইট ক্যু মোইজে সিয়েস্ট সারভি পোর কম্পোজার লে লিভরা দ্য লা জেনেসি) নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বিশদভাবে দেখান যে, পেন্টাটিউক বা তৌরাত বহু উৎস থেকে সংগৃহীত রচনাবলীর সমষ্টি। তাঁর আগে অনেকেই হয়ত এ বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন কিন্তু তিনিই প্রথম সাহস করে কথাটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। তিনি উধৃতি দিয়ে দেখান যে, এমন দুটি রচনা জেনেসিসে পাশাপাশি রয়েছে, যার একটিতে আল্লাকে ইয়াহওয়ে এবং অপরটিতে ইলোহিম নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং এ দুটি রচনা কখনই এক উৎসের হতে পারে না। আইকরন (১৭৮০-৮৩) অপর চারখানি গ্রন্থের ক্ষেত্রেও একই ধরনের তথ্য আবিস্কার করেন। তারপর ইলগেন (১৭৯৮) লক্ষ্য করেন যে, আসটুক বর্ণিত যে রচনায় আল্লাহকে ইলোহিম নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা আসলে দু'ভাগে বিভক্ত। ফলে পেন্টাটিউকের বুনিয়াদ আক্ষরিক অর্থেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীতে উৎসগুলি সম্পর্কে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। ১৮৫৪ সালে মোট চারটি উৎস স্বীকার করে নেয়া হয়। এগুলি হচ্ছে- ইয়াহভিস্ট সংস্করণ, ইলোহিস্ট সংস্করণ, ডিউটারোনমি এবং স্যাকারডোটাল সংস্করণ। এমনকি তাদের সময়কাল নির্ণয় করাও সম্ভব হয়ঃ

(১) ইয়াহভিস্ট সংস্করণ খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর বলে ধরা হয় (জুডায় লিখিত)।

(২) ইলোহিস্ট সংস্করণ সম্ভবত তার কিছু পরবর্তী কালের (ইসরাইলে লিখিত)।

(৩) ডিউটারোনমি সম্পর্কে কেউ মনে করেন খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর (ই জ্যাকব) এবং কেউ মনে করেন জোশিয়ার আমলের (ফাদার দ্য ভক্স)।

(৪) স্যাকারডোটাল সংস্করণ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর নির্বাসনের আমলের অথবা তার পরের আমলের।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পেন্টাটিউকের রচনাবলীর মেয়াদ কমপক্ষে তিন শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিন্তু সমস্যাটি আসলে আরও জটিল। ১৯৪১ সালে এ লডস নামক একজন গবেষক আরও নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখতে পান যে ইয়াহভিস্ট সংস্করণে তিনটি উৎস আছে। এভাবে ইলোহিস্ট সংস্করণে চারটি, ডিউটারোনমিতে ছয়টি, এবং স্যাকারডোটাল সংস্করণে নয়টি উৎস আছে। এবং ফাদার দ্য ভক্স "যে আটজন ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা সংযোজিত হয়েছে" বলে উল্লেখ করেছেন, তা বাদ দিয়েই। আরও সাম্প্রতিক কালে মনে করা হচ্ছে যে, "পেন্টাটিউকে যে সকল আইন বা বিধান আছে, তার অধিকাংশের সন্ধানই বাইবেলের বাইরে অন্যত্র পাওয়া যায়, এবং সেগুলি আরও আগের আমলের।" তাছাড়া "পেন্টাটিউকের দলিল অর্থাৎ রচনাবলী যে সময় ও পটভূমি থেকে এসেছে বলে ধরে নেয়া হয়ে থাকে, রচনাবলীতে বর্ণিত কাহিনীগুলি আসলে তারও অনেক আগের আমলের এবং ভিন্ন পটভূমির। ফলে, কিংবদন্তি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিয়েছে।" অর্থাৎ সমস্যাটি এমন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তার আগামাথা খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

অনেকগুলি উৎস থাকার কারণে পার্থক্য যেমন এসেছে, তেমনি পুনরাবৃত্তিও এসেছে। ফাদার দ্য ভক্স উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বন্যা, ইউসুফের অপহরণ ও মিসরে তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য রয়েছে। তাছাড়া একই ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর পরস্পর বিরোধী বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এভাবে পেন্টাটিউক বিভিন্ন উৎস ও কিংবদন্তির সংগ্রহ হলেও লেখকগণ মোটামুটিভাবে দক্ষতার সঙ্গে তা একত্রিত ও গ্রন্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা কখনও দুটি বিবরণ পাশাপাশিই বসিয়ে দিয়েছেন, আবার কখনও দুটি বিবরণ মিশিয়ে একটিমাত্র বিবরণ হিসাবে পেশ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অসম্ভাব্যতা এবং পরস্পর বিরোধিতার ব্যাপারগুলি রয়েই গেছে। ফলে আধুনিক যুগের মূল উৎসগুলিই গভীর ও বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে।

পেন্টাটিউক বা তৌরাতের মূল রচনা পরীক্ষা করে দেখলে অতি সহজেই মানুষের হাতের কাজ বলে ধরা যায়। ইহুদী জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন আমলের মৌখিক কাহিনী, কিংবদন্তি, এবং পুরুষানুক্রমে রক্ষিত রচনার ভিত্তিতে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিবরণ শুরু হয়েছে খৃষ্টপূর্ব দশম বা নবম শতাব্দীর গোড়া থেকে একটি ইয়াহভিস্ট

প্রবাদ দিয়ে, যাতে ইসরাইলের নিজস্ব তকদির বর্ণনা করা হয়েছে। এ তকদির হচ্ছে ফাদার দ্য ভক্সের ভাষায় "মানব জাতির জন্য আল্লার মহাপরিকল্পনার যথাযথ স্থানে ফিরে যাওয়া।" আর শেষ হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি স্যাকারডোটাল প্রবাদ দিয়ে, যাতে তারিখ এবং নসবনামা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে, স্যাকারডোটাল সংস্করণে দুনিয়ায় মানুষের আগমন, সময়ের বিবর্তনে তার অবস্থান এবং সৃষ্টিপ্রবাহ সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা আছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের মুকাবিলায় তা সম্পূর্ণ ভুল। স্পষ্টতই মূলের ওপর কলম চালাতে গিয়েই এ দশা হয়েছে।

ফাদার দ্য ভক্স লিখেছেন- "এ প্রবাদের কাহিনীগুলিতে আইনগত বৈধতার প্রশ্নই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন সৃষ্টি সমাপ্ত করার পর রবিবারে বিশ্রাম গ্রহণ, নূহের সঙ্গে মৈত্রী, ইব্রাহিমের সঙ্গে মৈত্রী ও হাজামত, মাকপেলার গুহা খরিদ যার ফলে যাজকগণ কেনানে জমি লাভ করেন।" আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ প্রবাদটির মেয়াদ ব্যাবিলনে নির্বাসন থেকে খৃষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। সুতরাং ধর্মীয় সমস্যার সঙ্গে এখানে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যাও মিশে গেছে।

জেনেসিসের ক্ষেত্রে গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু যে তিনটি উৎস থেকে সংগ্রহীত হয়েছে, তা এখন সাব্যস্ত ও স্বীকৃত হয়েছে। ফাদার দ্য ভক্স তার তরজমার বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় জেনেসিসের কোন অনুচ্ছেদ কোন উৎসের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এ প্রমাণের ভিত্তিতে কোন অধ্যায়ে কোন উৎসের বিষয়বস্তু কতখানি আছে, তা প্রায় সঠিকভাবেই নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জেনেসিসের প্রথম এগারটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব, বন্যা এবং বন্যা থেকে ইব্রাহীমের আমল পর্যন্ত সময়ের যে বিবরণ আছে, তাতে দেখা যায় যে, একটি অংশ ইয়াহভিষ্ট সংস্করণ থেকে এবং তার পরের অংশ স্যাকারডোটাল সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে। এবং সমগ্র বিবরণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রথম এগারটি অধ্যায়ে ইলোহিস্ট সংস্করণের কোন বিষয়বস্তু নেই। তবে ইয়াহভিস্ট ও স্যাকারডোটাল ভাষ্য যে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছে, তা বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং নূহের আমল পর্যন্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ইয়াহভিস্ট অনুচ্ছেদের পর একটি স্যাকারডোটাল অনুচ্ছেদ দিয়ে পর পর সাজানো হয়েছে। বন্যার বিবরণে, বিশেষত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এ বন্দোবস্ত আরও ঘন ঘন করা হয়েছে; অর্থাৎ এক ভাষ্যের একটি ছোট অনুচ্ছেদের পর অপর ভাষ্যের একটি ছোট অনুচ্ছেদ বসানো হয়েছে এবং এমনকি বাক্যের ক্ষেত্রেও এ সাজানো বন্দোবস্ত নজরে পড়ে। একটি জায়গায় দেখা যায় যে, মোট একশো লাইনের মধ্যে এভাবে সতেরবার ভাষ্য বদল করা হয়েছে। এ কারণেই আমরা যখন জেনেসিস পড়তে যাই, তখন অসম্ভাব্যতা ও অন্তর্বিরোধিতা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে

নীচের ছকটি লক্ষণীয়।

জেনেসিসের ১ থেকে ১১ অধ্যায়ে ইয়াহভিস্ট ও স্যাকারডোটাল ভাষ্যের অবসান।

* প্রথম সংখ্যাটি অধ্যায়ের নম্বর।

* ব্রাকেটের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি কালামের নম্বর। কালাম কখনও দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ক ও খ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

* ই-দ্বারা ইয়াহভিস্ট এবং স-দ্বারা স্যাকারডোটাল ভাষ্য বুঝানো হয়েছে।

* উদাহরণ- ছকের প্রথম লাইনে বুঝানো হয়েছে যে, বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের ১নং অধ্যায়ের ১নং কালাম থেকে ২নং অধ্যায়ের ৪-ক কালাম পর্যন্ত বিষয়বস্তু স্যাকারডোটাল ভাষ্য থেকে নেয়া হয়েছে।

অধ্যায়	কালাম থেকে	অধ্যায়	কালাম	উৎস
১	(১)	২	(৪-ক)	স
২	(৪-খ)	৪	(২৬)	ই
৫	(১)	৫	(৩২)	স
৬	(১)	৬	(৮)	ই
৬	(৯)	৬	(২২)	স
৭	(১)	৭	(৫)	ই
৭	(৬)	-	-	স
৭	(৭)	৭	(১০)	ই
৭	(১১)	-	-	স
৭	(১২)	-	-	ই
৭	(১৩)	৭	(১৬-ক)	স
৭	(১৬-খ)	৭	(১৭)	ই
৭	(১৮)	৭	(২১)	স
৭	(২২)	৭	(২৩)	ই
৭	(২৪)	৮	(২-ক)	স
৮	(২-খ)	-	-	ই
৮	(৩)	৮	(৪)	স
৮	(৬)	৮	(১২)	ই
৮	(১৩-ক)	-	-	স
৮	(১৩-খ)	-	-	ই
৮	(১৪)	৮	(১৯)	স
৮	(২০)	৮	(২২)	ই

৯	(১)	৯	(১৭)	স
৯	(১৮)	৯	(২৭)	ই
৯	(২৮)	১০	(৭)	স
১০	(৮)	১০	(১৯)	ই
১০	(২০)	১০	(২৩)	শ
১০	(২৪)	১০	(৩০)	ই
১০	(৩১)	১০	(৩২)	স
১১	(১)	১১	(৯)	ই
১১	(১০)	১১	(৩২)	স

মানুষ নিজের হাতেই যে কিভাবে বাইবেল সাজিয়েছে, ছক থেকে তা অতি সহজেই বুঝা যায়।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ

এ গ্রন্থসমূহে আমরা ইহুদী জাতির ইতিহাস পাই। এ ইতিহাস তাদের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের সময় থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত হওয়ার সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করে এবং খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়।

এখানে 'জাতীয় ঘটনা' বলে কথিত ব্যাপারটির ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং ঘটনাটিকে আল্লার ওয়াদা পূরণ বলে পেশ করা হয়েছে। বর্ণনায় অবশ্য ঐতিহাসিক সত্যতা ও নির্ভুলতা উপেক্ষা করা হয়েছে। এ কথা মনে রেখেই ই জ্যাকোব বলেছেন যে, আই ও জেরিকোর কথিত ধ্বংসের ব্যাপারে গ্রন্থের বিচার পুস্তকের (বুক অব জাজেস) মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের বিরুদ্ধে মনোনীত জাতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং তাদের জন্য আল্লার সমর্থন। ফাদার এবং এ লিফাবার ক্রামপন বাইবেলের ভূমিকায় অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবেই বলেছেন যে, এ গ্রন্থখানি বেশ কয়েকবার রদবদল করা হয়েছে। মূল গ্রন্থের অনেকগুলি মুখবন্ধ এবং বিভিন্ন পরিশিষ্টের সংযোজন থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল বিবরণে রুথের কাহিনীও যোগ করা হয়েছে।

স্যামুয়েলের গ্রন্থ বুক অব স্যামুয়েল এবং দুখানি রাজাবলি গ্রন্থ (বুকস অব কিংস) মূলত স্যামুয়েল, সল, দাউদ ও সোলাইমানের জীবনীমূলক গ্রন্থ। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিক বিচারেই জ্যাকোব এসব গ্রন্থে অসংখ্য ভুল পেয়েছেন। কারণ একই ঘটনা সম্পর্কে একাধিক পরস্পর বিরোধী বর্ণনা

আছে। ইলিয়াস, এলিশা ও ইসাইয়া নবীর কথাও এ সকল গ্রন্থে আছে। অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তি মিশে গিয়েছে। ফাদার লিফাবারের মত অন্যান্য সমালোচকগণ অবশ্য মনে করেন যে, এ গ্রন্থগুলির "ঐতিহাসিক মূল্যের মৌলিকত্ব আছে।"

ঘটনাপঞ্জী এক ও দুই (ক্রনিকেলস ওয়ান এন্ড টু) উজাইরের গ্রন্থ (বুক অব নেহেমিয়া) খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ওয়াকেয়া নবিশ (ক্রনিকেলার) নামধারী একই লেখকের রচিত। তিনি ঐ সময় পর্যন্ত সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যদিও তাঁর দেয়া নসবনামায় কেবলমাত্র দাউদ পর্যন্ত হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি স্যামুয়েলের গ্রন্থ ও রাজাবলি গ্রন্থ থেকেই তথ্য নিয়েছেন। ই জ্যাকোব বলেছেন, "অসঙ্গতির দিকে খেয়াল না করেই তিনি হুবহু নকল করেছেন।" তবে তিনি এমন কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন যা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে সঠিক বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এ গ্রন্থগুলিতে ধর্মীয় প্রয়োজনে ঐতিহাসিক তথ্যের রদবদল করা হয়েছে। ই জ্যাকোব বলেছেন, "লেখক কখনও কখনও ধর্মের প্রয়োজন মোতাবেক ইতিহাস লিখেছেন। রাজা মানাসেহ বিধর্মী ও অত্যাচারী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে রাজত্ব করেছেন। এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, কিছুদিন আসিরিয়ায় থাকার সময় রাজা ধর্মান্তরিত হন (ক্রনিকেলস দুই ৩৩ ১১)। কিন্তু বাইবেল অথবা বাইবেল বহির্ভূত কোন গ্রন্থে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। উজাইরের গ্রন্থ এবং নেহেমিয়ার গ্রন্থও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বলা হয়েছে যে গ্রন্থ দুখানি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয়ে পূর্ণ। যে আমলের ঘটনা (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) তাতে বর্ণিত হয়েছে সে আমলটিই ভালভাবে পরিজ্ঞাত নয় এবং ঐ আমলের বাইবেল বহির্ভূত তেমন কোন দলিলও নেই।

তোবিতের গ্রন্থ (বুক অব টোবিট), জুডিথের গ্রন্থ (বুক অব জুডিথ) এবং ইসথারের গ্রন্থও (বুক অব ইসথার) ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে ধরা হয়। অথচ এ গ্রন্থগুলিতে ইতিহাসের চরম বেইজ্জত করা হয়েছে। ধর্মের প্রয়োজনে মানুষ ও জায়গার নাম বদল করা হয়েছে এবং চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলে এগুলি হচ্ছে ঐতিহাসিক অসত্য ও অসম্ভাব্যতার মিশাল দেয়া (নীতিকথামূলক) কাল্পনিক কাহিনী।

মাকাবিজের গ্রন্থ (বুক অব মাকাবিজ) আবার একটু পৃথক ধরনের। এ সকল গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলী খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। এ আমলের ঘটনাবলীর এটাই সবচেয়ে নির্ভুল বিবরণ। এ কারণে এ গ্রন্থগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঐতিহাসিক নামে যে গ্রন্থগুলি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে তার একখানির সঙ্গে অপর খানির কোনই মিল নেই। কোন কোন গ্রন্থে ইতিহাস সঠিকভাবেই বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে আবার বর্ণিত হয়েছে খেয়ালখুশী মত।

নবীদের গ্রন্থ সমূহ

এ শিরোনামে আমরা সেই সকল নবীর শিক্ষার বিবরণ দেখতে পাই, ওল্ড টেস্টামেন্টে যাঁদের মূসা, স্যামুয়েল, ইলিয়াস ও এলিশার ন্যায় বড় নবীদের থেকে আলাদা করে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ঐ বড় নবীদের শিক্ষার বিবরণ অন্যান্য গ্রন্থে আছে।

নবীদের গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ আছে।

খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে আমোস, হোসিয়া, ইসাইয়া ও মিশাহ নবীর গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। আমোস নবীর গ্রন্থ সামাজিক অবিচারের নিন্দাবাদের জন্য বিখ্যাত। হোসিয়া তাঁর ধর্মীয় বিকৃতির জন্য পরিচিত। প্রকৃতি পূজারী সম্প্রদায়ের একজন সেবাদাসী অর্থাৎ পবিত্র বারবনিতাকে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়ায় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেন। এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, জনগণ পাপাচারী হলে আল্লাহ যেমন কষ্ট পান, কিন্তু তবু তাদের ভালবাসেন, এ ব্যাপারটিও ঠিক সেই রকম। ইসাইয়া একজন রাজনৈতিক ইতিহাসের ব্যক্তিত্ব। রাজা-বাদশাগণ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেইমত কাজ করেন। তিনি অতিশয় জাঁকজমকের সঙ্গে জীবন যাপন করেন। তাঁর নিজস্ব প্রচার কার্য ছাড়াও বিভিন্ন প্রশ্নের তিনি যে জবাব দিয়েছেন, তাঁর মুরীদগণ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিক্ষায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আল্লার বিচারকে ভয় করার কথা আছে। তিনি ইহুদীদের মিসর ত্যাগের পর মুক্তি লাভ এবং তাদের ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইসাইয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের নবুওয়াতির কার্য যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল, তা প্রায় দিবালোকের মতই স্পষ্ট। ইসাইয়ার সমসাময়িক মিশাহর শিক্ষাও মোটামুটি ঐ একই ধরনের ছিল।

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে জেফানিয়াহ, জেরেমিয়াহ, নাহুম, ও হাবাক্কুক তাঁদের ধর্মীয় প্রচার কার্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। জেরেমিয়াহ শহীদ হন এবং বারুচ তাঁর শিক্ষা ও বাণী সংগ্রহ করে একত্রিত করেন। বারুচ সম্ভবত বিলাপ (ল্যামেন্টেশন) এরও লেখক।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইহুদীদের ব্যাবিলনে নির্বাসিত থাকার সময় নবীদের তৎপরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তাঁদের মধ্যে ইজেকিয়েলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি তাঁর স্বধর্মীদের সান্ত্বনা দিতেন এবং আশার বাণী শুনাতেন। ওবাদিয়াহর গ্রন্থে বিজিত জেরুসালেমের দৈন্য দুর্দশা বর্ণনা করা হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ৫৩৮ সালে নির্বাসন শেষ হওয়ার পর হাজ্জাই ও জাকারিয়া নবীর তৎপরতা শুরু হয়। তাঁরা মন্দির পুনর্নির্মাণের আবেদন জানান। এ পুনর্নির্মাণ শেষ হওয়ার পর মালাচির নামে কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। এ রচনাগুলি ছিল মূলত আধ্যাত্মিক বিষয়ের

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখযোগ্য কোন পাঠ না থাকা সত্ত্বেও **ইউনুসের গ্রন্থকে** যে কিভাবে নবীদের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইউনুসের গ্রন্থে যে প্রধান শিক্ষা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে আল্লার ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পন করার প্রয়োজনীয়তা।

দানিয়েলের গ্রন্থ তিনটি ভাষায় লিখিত হয়। হিব্রু, গ্রীক, ও আর্মায়িক। খৃষ্টান সমালোচকগণ মনে করেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এ গ্রন্থে সুসমাচার আছে বটে, কিন্তু তা বিশৃংখল ও স্ববিরোধী। এ গ্রন্থ সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ম্যাকাবাইয়ান আমলের। ই জ্যাকোব মনে করেন যে, নাজাতের দিন অতি নিকটে, এ কথা বলে লেখক সম্ভবত তাঁর স্বদেশবাসীর ঈমান রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

কবিতা ও জ্ঞানের গ্রন্থ

এ শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ গ্রন্থগুলিতে প্রশ্নাতীত সাহিত্যিক সামঞ্জস্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সামস (প্রার্থনা সঙ্গীত), এবং তা হিব্রু কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনও। অধিকাংশ প্রার্থনা সংগীতের রচয়িতা হচ্ছেন দাউদ। অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন পুরোহিতের রচনা। প্রার্থনা ও উপাসনায় ব্যবহৃত এ সংগীতের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রশংসা, ধ্যান, আরাধনা এবং আবেদন নিবেদন।

খৃষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ৫০০ সালের মধ্যে রচিত জবের (হযরত আইউব) গ্রন্থ, জ্ঞান ও ধার্মিকতা বিষয়ের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেরুসালেমের পতনের পর বিলাপ (ল্যামেন্টেশনস) নামে যে গ্রন্থ রচিত হয়, তার লেখক সম্ভবত জেরেমিয়াহই হবেন।

এছাড়া কয়েকখানি গ্রন্থের নাম পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সং অব সংস হচ্ছে ঐশীপ্রেমের রূপক সংগীতের সংকলন, বুক অব প্রোভার্বস হচ্ছে সলোমন-এর দরবারের অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাণী সংগ্রহ এবং একলেজিয়াষ্টস বা কোহেলেথ হচ্ছে পার্থিব সুখ ও জ্ঞানের সারবত্ত সম্পর্কে গ্রন্থের সংকলন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ে কমপক্ষে সাত শতাব্দী যাবত যা রচনা করেছেন, তা একত্রিত করে মিলিয়ে মিশিয়ে একখানিমাত্র গ্রন্থ বানানো হয়েছে। এ অবস্থায় এ গ্রন্থের একটি অংশ অপর অংশের পরিপূরকই বা হয় কেমন করে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত এ গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই বা গণ্য করা হল কেমন করে? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, 'এ

গ্রন্থখানিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অহির গ্রন্থ' বলে গণ্য করা হয় কোন যুক্তিতে? কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য আছে কিন্তু মূল বিষয়ে বিরোধ তেমন প্রকট নয়। অদৃশ্য বিষয়ের ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে বলে গ্রীক ভাষায় এ গ্রন্থকে 'ক্যানন' নামে অভিহিত করা হত।

এ রচনা-সংগ্রহের সময় কিন্তু খৃষ্টান আমলে শুরু হয়নি, হয়েছে ইহুদী আমলে। এবং প্রাথমিক কাজ সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতেই শুরু হয়েছিল। এ সংকলনের জন্য প্রথম পর্যায়ে কিছু গ্রন্থ বাছাই করা হয়েছিল। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি পরে যোগ করা হয়। তবে লক্ষণীয়, তৌরাত বা পেন্টাটিউকের অন্তর্ভুক্ত পাঁচখানি গ্রন্থকে সর্বদাই শীর্ষে স্থান দেয়া হয়েছে। নবীদের ঘোষণা (অসদাচরণের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী) সত্যে পরিণত হওয়ার পর তাঁদের শিক্ষার বিবরণ মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথে আর কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। তাঁদের আশার বাণীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে নবীদের 'ক্যানন' সুস্পষ্ট আকার লাভ করে।

উপাসনায় ব্যবহার করা হয় বলে সাম্‌স (প্রার্থনা সঙ্গীত)-এর মত অন্যান্য গ্রন্থ ল্যামেন্টেশনস, বুক অব উইজডম ও বুক অব জবের মত গ্রন্থের সংগে একীভূত করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে খৃষ্টধর্ম ইহুদী ধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রিত ছিল। পরে আমরা দেখতে পাব যে, কার্ডিনাল ডানিলোর মত আধুনিক সুপন্ডিত লেখকগণ এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা করেছেন। সাধু পলের প্রভাবে নতুন রূপ গ্রহণের আগে খৃষ্টধর্ম ওল্ড টেস্টামেন্টের উত্তরাধিকার বিনা দ্বিধায় মেনে নিত। গসপেলের লেখকগণ ওল্ড টেস্টামেন্টের ধারা কঠোরভাবে মেনে চলতেন। কিন্তু পরে এপোক্রিফা (ধর্মীয় উপকথা) বর্জন করে গসপেল সংশোধন করা হলেও ওল্ড টেস্টামেন্টে তেমন কোন সংশোধন করা হয়নি। সেখানে প্রায় সবকিছুই বহাল রাখা হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষ ভাগের আগে এ বিচিত্র রচনা সংকলনের বিরুদ্ধে আপত্তি করার মত সাহস অন্ততপক্ষে পাশ্চাত্য দেশে কারও ছিল না। একজনেরও না। মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে বর্তমান যুগের শুরু পর্যন্ত সময়ে দু'একজন সমালোচককে সোচ্চার হতে দেখা যায়, কিন্তু গির্জা কর্তৃপক্ষ সর্বদাই তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন। বর্তমানে অবশ্য সমালোচনামূলক রচনার কোন অভাব নেই, কিন্তু ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ বহু বিষয়ে সুগভীর গবেষণা করলেও তাঁদের ভাষায় 'অসুবিধাজনক' বিষয়গুলির গভীরে যাওয়া থেকে তাঁরা বিরত থেকেছেন। এমনকি তাঁরা আধুনিক জ্ঞানের আলোকে ঐগুলি পরীক্ষা করে দেখতেও আগ্রহান্বিত হননি। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে যেখানে বাইবেলের বিবরণের সাদৃশ্য আছে, সেখানে তাঁরা সেই সাদৃশ্য প্রমাণ ও সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট মেহনত করেছেন, কিন্তু বাইবেলের বিবরণের সংগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের তুলনা থেকে তাঁরা সযত্নে দূরে থেকেছেন। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, এরূপ তুলনা করা হলে

সাধারণ মানুষ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করবে এবং প্রশ্ন উত্থাপন করবে। অথচ এ ধর্মগ্রন্থগুলি এতদিন যাবত সকল সন্দেহ ও সকল প্রশ্নের উর্ধে রয়েছে।

ওল্ড টেষ্টামেন্ট ও বিজ্ঞানঃ কতিপয় সাব্যস্ত সত্য

ওল্ড টেস্টামেন্ট ও গসপেলে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা আধুনিক জ্ঞানলব্ধ তথ্যের বিরোধী। এ বিরোধিতা যখন বিজ্ঞানের সংগে ঘটে, তখন দেখা যায় বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আগেই দেখেছি যে, বাইবেলে অনেক ইতিহাসগত ভুল তথ্য রয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টান বিশেষজ্ঞদের উল্লেখিত এরূপ কয়েকটি ভুল আমরা উধৃতও করেছি। তাঁরা অতিশয় স্বাভাবিক কারণেই ভুলগুলিকে ছোট করে দেখিয়েছেন। কারণ তাঁদের কাছে এটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে যে, ধর্মীয় লেখকগণ ধর্ম অনুসারেই ঐতিহাসিক তথ্য **পেশ করে**ছেন এবং ধর্মের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই তাঁরা ইতিহাস লিখেছেন। পরে আমরা দেখতে পাব যে, মথি (ম্যাথু) লিখিত সুসমাচারেও (গসপেল) একইভাবে সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে এবং সেই বিকৃতিকে সত্য বলে গ্রহণযোগ্য করার জন্য একই ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন পক্ষেই এ প্রক্রিয়া মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

যুক্তির ভিত্তিতে বিবেচনা করা হলে বহু স্ববিরোধিতা ও অসম্ভাব্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে। একটি ঘটনার বিবরণ লিখতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক যদি বিভিন্ন উৎসের ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয় এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েও দিয়েছেন যে, একই ঘটনার একাধিক রূপান্তর করা হয়েছে, মূল বর্ণনায় পরে সংযোজন করা হয়েছে এবং প্রথমে ব্যাখ্যা লিখে পরে তার জন্য মূল বর্ণনা প্রস্তুত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তৌরাতের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ফাদার দ্য ভক্স তাঁর জেনেসিসের তরজমার ভূমিকায় (১৩-১৪ পৃষ্ঠা) এরূপ বহু অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতার উল্লেখ করেছেন। পরে আমরা কয়েকটি নমুনা পেশ করব। তবে মূল বর্ণনা পড়ার পর পাঠক যদি মনে করেন যে, পঠিত বিষয় আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহলে তাকে বোধহয় খুব দোষ দেয়া যাবে না। আপাতত আমরা একটি নমুনা পেশ করছিঃ

জেনেসিসে (৬.৩) বলা হয়েছে, বন্যার ঠিক আগে আল্লাহ স্থির করলেন যে, মানুষের জীবনকাল অতঃপর একশত বিশ বছরে সীমাবদ্ধ হবে- "তাহার হায়াত একশত বিশ বৎসর হইবেক।" কিন্তু পরে আবার ঐ জেনেসিসেই (১১.১১, ১০.৩২) দেখা যাচ্ছে যে, নূহের দশ জন আওলাদের হায়াত ১৪৮ থেকে ৬০০ বছর পর্যন্ত হয়েছে

(পরে সংযোজিত তালিকায় ইব্রাহীম পর্যন্ত নূহের দশজন আওলাদের হায়াতে দেখুন)। এ দুটি বর্ণনার অসঙ্গতি খুবই স্পষ্ট। কিন্তু তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথম বর্ণনাটি (জেনেসিস ৬, ৩) খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর ইয়াহভিস্টগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বর্ণনাটি (জেনেসিস ১১, ১০-৩২) নেয়া হয়েছে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর স্যাকারডোটাল সংস্করণ থেকে। এ সংস্করণটিই হচ্ছে নসবনামার মূল উৎস। প্রত্যেক পয়গম্বরের হায়াত এ নসবনামায় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে বটে কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে ব্যাপারটি অসম্ভব বলে মনে হবে।

এ জেনেসিসেই আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন দেখতে পাই। নিম্নলিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ অসঙ্গতি রয়েছেঃ

(১) দুনিয়া সৃষ্টি এবং তার বিভিন্ন পর্যায়।

(২) দুনিয়া সৃষ্টির তারিখ এবং মানুষের দুনিয়ায় আসার তারিখ।

(৩) বন্যার বিবরণ।

এখন আমরা পর পর এ তিনটি বিষয় আলোচনা করব।

দুনিয়া সৃষ্টি

ফাদার দ্য ভক্স উল্লেখ করেছেন যে, জেনেসিসের "শুরুতেই দুনিয়া সৃষ্টি সম্পর্কে পাশাপাশি দুটি বিবরণ রয়েছে।" এখন এ বিবরণ দুটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, তা আমরা পর পর পরীক্ষা করে দেখব।

প্রথম বিবরণ

জেনেসিসের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই এ প্রথম বিবরণ রয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভুল ও অসত্যের এমন সমাবেশ আর কোথাও নেই। সুতরাং প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এখানে যে উধৃতি দিয়েছি, তা বাইবেলের সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে (রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনঃ প্রকাশক-বৃটিশ এন্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটির পক্ষে ডব্লু এম কলিনস এন্ড সন্স, ১৯৫২)।

প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১-২ঃ

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।"

বর্তমানে আমরা যাকে জ্যোতির্মন্ডল বলি, দুনিয়া সৃষ্টির আগে তা অন্ধকারে

নিমজ্জিত ছিল বলে স্বীকার করে নেয়া সম্ভব। কিন্তু তখন পানির অস্তিত্ব ছিল বলে উল্লেখ করা নিছক কল্পনা মাত্র। পরে আমরা দেখতে পাব যে, জ্যোতির্মন্ডল গঠিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে গ্যাস বা ধোঁয়ার অস্তিত্ব ছিল বলে যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সেখানে পানি থাকার কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল।

শ্লোক ৩-৫ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে এক (প্রথম) দিবস হইল।"

জ্যোতির্মন্ডলে যে আলোক প্রবাহিত হয়, তা তারকারাজির জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। পরে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বাইবেলের মতেই সৃষ্টির এ পর্যায়ে তারকারাজি তখনও গঠিত হয়নি। আসলে ১৪ নং শ্লোকের আগে "দীপ্তিসমূহ" উল্লেখই করা হয়নি। ঐ শ্লোকে চতুর্থ দিনে আলোক সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে- "রাত্রি হইতে দিবসকে পৃথক করিবার জন্য", এবং "পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য।" এ বর্ণনা সঠিক। কিন্তু আলোকের কারণ যখন তিনদিন পরে সৃষ্টি হয়েছিল, তখন প্রথম দিনে আলোকের উল্লেখ করা অযৌক্তিক। তাছাড়া সৃষ্টির প্রথম দিনেই সন্ধ্যা ও সকালের উল্লেখ করাও কল্পনা প্রসূত; কেননা, একমাত্র পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর এবং তার নিজস্ব জ্যোতিষ্ক সূর্যের আলোকে পৃথিবী নিজের চারিদিকে একবার পরিক্রম করার পরই সন্ধ্যা ও সকাল হওয়ার ধারণা করা সম্ভব হতে পারে।

শ্লোক-৬-৮ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশ মন্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।"

এখানেও পানির সে কাহিনী আছে এবং আকাশ পানিকে দুভাগে বিভক্ত করেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিভক্তির ফলেই বন্যার বর্ণনা দেয়ার সময় বলা সম্ভব হয়েছে যে, উপরের পানি আকাশ অতিক্রম করে দুনিয়ায় এসে পড়েছে। কিন্তু পানির এভাবে দুভাগে বিভক্ত হওয়ার ধারণাটি বৈজ্ঞানিক কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্লোক ৯-১৩ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমন্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল একস্থানে সংগৃহীত হউক

ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, তাহা উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি ও সজীব স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বিজোৎপাদক ওষধি, ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।"

পৃথিবী পানিতে নিমজ্জিত থাকার সময় ক্রমে ক্রমে জমি ভেসে উঠেছিল, এ ধারণাটি বৈজ্ঞানিকভাবেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সূর্য সৃষ্টি হওয়ার আগে একটি সুশৃংখল লতা-গুল্ম বৃক্ষ ব্যবস্থা এবং বীজের মারফত তার উৎপাদন প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ার ধারণা আদৌ যুক্তিসংগত হতে পারে না এবং একই কারণে দিন রাত্রির বিবর্তন ব্যবস্থাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উল্লেখযোগ্য যে, জেনেসিসের মতেই সূর্য চতুর্থ দিনের আগে সৃষ্টি হয়নি।

শ্লোক ১৪-১৯ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে পৃথক করণার্থে আকাশমন্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক, সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমন্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি, এ দুই বৃহৎ জ্যোতি এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন। আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার পৃথক করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিসমূহকে আকাশমন্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।"

এ বিবরণ মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও একটি বড় অসঙ্গতি আছে। আমরা জানি যে, পৃথিবী ও চাঁদ তাদের মূল জ্যোতিষ্ক সূর্যের খন্ডিত অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পরে সূর্য ও চাঁদের সৃষ্টি হওয়ার ধারণাটি সৌরজগত সৃষ্টির সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বত্র গৃহীত অভিমতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

শ্লোক ২০-২৩

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণীময় হউক এবং ভূমির উর্ধে আকাশমন্ডলের বিতানে পক্ষীগণ উড়ুক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে, সে সকলের এবং নানাজাতীয় পক্ষীর

সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশির্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে পক্ষীগণের বাহুল্য হউক। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।"

এ অনুচ্ছেদে এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। বলা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জীব ও ডানা বিশিষ্ট পাখির আগমনে প্রাণীজগতের শুরু হয়েছে। এবং এটা ঘটেছে পঞ্চম দিবসে। কিন্তু পরের শ্লোকেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে প্রাণী জগতের শুরু হয়েছে পরের দিন, অর্থাৎ ষষ্ঠ দিবসে। একটু পরেই আমরা ঐ ষষ্ঠ দিবসের শ্লোক উধৃত করব। সমুদ্রেই প্রাণের শুরু হয়েছে এবং সেখান থেকেই যে পৃথিবীতে প্রাণীর আবাদ হয়েছে তা ঠিক, তবে এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আপাতত আমরা শ্লোকের বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। জমির উপরে বসবাসকারী প্রাণী, বিশেষত দ্বিতীয় যুগের এক প্রজাতির সরীসৃপ থেকে পাখির জন্ম হয়েছে বলে ধরা হয়ে থাকে। উভয় প্রজাতির একই ধরনের কতিপয় দৈহিক বৈশিষ্টের কারণে এ অনুমান সম্ভব বলে মনে করা হয়ে থাকে। বাইবেলে কিন্তু ভূমিতে জীবের আবির্ভাবের উল্লেখ করা হয়েছে ষষ্ঠ দিবসে পাখির পরে। সুতরাং পাখির পরে ভূমিতে অন্য জীবের আবির্ভাবের এ ক্রমিকতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শ্লোক ২৪-৩১ঃ

"এবং ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গৃহী পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গৃহী পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশির্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর। ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবজী ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এ সকল

প্রাণীর আহারার্থে হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।"

সৃষ্টির বর্ণনা এখানেই শেষ হয়েছে। আগে যে সকল প্রাণীর কথা বলা হয়নি, লেখক এখানে তার ফিরিস্তি দিয়েছেন এবং মানুষ ও পশুর খাদ্যেরও বিবরণ দিয়েছেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, পাখির আগে অন্যান্য প্রাণীর আবির্ভাবের কথা বলা ভুল হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য প্রাণীর আবির্ভাবের পরে মানুষের আবির্ভাবের কথা বলা সঠিক হয়েছে। বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ের পর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে সৃষ্টির বর্ণনা শেষ হয়েছে এভাবেঃ

অধ্যায় ২ঃ শ্লোক-১৩

"এরূপে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশির্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"

এ বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

হিব্রু শব্দ "শাব্বাথ" তরজমার একটি রেওয়াজ মোতাবেক "তিনি বিশ্রাম করিলেন" হয়ে থাকে। এখানেও তাই হয়েছে। কিন্তু আসলে ঈশ্বরের বিশ্রাম গ্রহণের ব্যাপারটি একটি কিংবদন্তি মাত্র।

এখানে উধৃত বিবরণটি বাইবেলের স্যাকারডোটাল সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে। এ সংস্করণটি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত হয়। কিন্তু তার কয়েক শতাব্দী আগে লেখা ইয়াহভিস্ট সংস্করণে ঈশ্বরের বিশ্রাম গ্রহণের কোন উল্লেখ নেই। যাঁরা বিশ্রাম দিবসের কথা লিখেছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস ও সম্ভ্রম সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বলেছেন যে, খোদ ঈশ্বরই ঐ দিবস প্রথমে পালন করেছেন। তাছাড়া তাঁরা অপর ছয়টি দিনের সৃষ্টিকার্যও ক্রমিকতা সহকারে বেশ বিস্তারিতভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানে সৃষ্টি সম্পর্কে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের ঐ ক্রমিকতা আদৌ সঠিক নয় বরং খেয়ালিপনা মাত্র।

সৃষ্টির ক্রমিক পর্যায়গুলি যে মাত্র এক সপ্তাহ সময়ের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে, এ ধারণাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বর্তমানে আমরা সঠিকভাবেই জানতে পেরেছি যে, জ্যোতির্মন্ডল এবং পৃথিবীর গঠন পর্যায়ক্রমে বহুদিনে অর্থাৎ অনেক সময়ের মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছে। (এই বিষয়ে কুরআনের বিবরণ আমরা পরে পরীক্ষা করব)। যদিও বিশ্রাম দিনের কথা উল্লেখ না করেই সৃষ্টির বিবরণ

ষষ্ঠ দিনের বিবরণেই সমাপ্ত করা হয়েছে এবং দিন গুলিকে আসল বা প্রকৃত দিন মনে না করে কুরআনের বিবরণের মত সুদীর্ঘ সময় বলে ধরে নেয়ার মত সুযোগ রয়েছে তবুও বাইবেলের বিবরণ ঘটনার ক্রমিকতার অসম্ভাব্যতার কারণেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঐ বিবরণ কল্পিত ও বানোয়াট। সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যেই এ বিবরণ রচিত ও প্রচারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণ

প্রথম বিবরণ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরই কোন মন্তব্য বা অন্তবর্তী বক্তব্য ছাড়াই জেনেসিস্ অর্থাৎ আদিপুস্তকে সৃষ্টির দ্বিতীয় বিবরণ শুরু হয়েছে। এখানে অবশ্য একই ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ নেই। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ বিবরণটি আরও তিন শতাব্দীর পুরানো এবং খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে পৃথিবী ও আকাশ মন্ডল সৃষ্টির তুলনায় মানুষ ও তার বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বেশী সময় দেয়া হয়েছে।

অধ্যায় ২ঃ শ্লোক ৪-৭

"যেদিন ইয়াউয়েহ ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমন্ডল নির্মাণ করিলেন, সেই সময় পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিজ্জ হইত না, আর ক্ষেত্রের কোন ওষধি উৎপন্ন হইত না। কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষাণ নাই, আর ভূমিতে কৃষিকর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। তবে ভূমি হইতে বন্যা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল। আর ইয়াউয়েহ ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে মনুষ্য নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফু দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।"

বর্তমান কালের বাইবেলে এ ইয়াহভিস্ট বিবরণ পাওয়া যায়। পরে স্যাকারডোটাল বিবরণও যোগ করা হয়েছে। তবে বিবরণটি মূলত এমন সংক্ষিপ্ত ছিল কিনা, সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সময়ের বিববর্তনে বিবরণটি কেটেছেটে ছোট করা হয়েছে কিনা তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। অথবা এখন যা পাওয়া যাচ্ছে, তাই মূল বিবরণ কিনা, তাও সঠিক ভাবে জানা যায় না।

এই বিবরণে পৃথিবী ও আকাশমন্ডল নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা নেই। শুধু বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জ ছিল না (তখনও বৃষ্টি হয়নি), যদিও মাটি থেকে পানি উঠে সমগ্র ভূতল সিক্ত করেছিল। তারপরই বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির একই সময়ে "ঈশ্বর এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন"। সুতরাং মানুষ ও বৃক্ষলতা একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য মোতাবেক এ বিবরণ সঠিক নয়। কারণ গাছপালা সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এ দুই সৃষ্টির মাঝখানে কত কোটি বছর অতিবাহিত হয়েছে, তা অবশ্য আমরা জানি না।

যাহোক, এ বিবরণের বিরুদ্ধে কেবল ঐ আপত্তিই উত্থাপন করা যায়। স্যাকারডোটাল বিবরণে মানুষ ও পৃথিবীর সৃষ্টি একই সপ্তাহে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইয়াহভিষ্ট বিবরণে তেমন কিছু বলা হয়নি। ফলে এ বিবরণের বিরুদ্ধে তেমন কোন মারাত্মক আপত্তির অবকাশ নেই।

পৃথিবীর সৃষ্টি এবং সেখানে মানুষের আবির্ভাবের তারিখ

ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত ইহুদী পঞ্জিকায় এ দুটি তারিখই সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে হিসাব অনুসারে খৃষ্টীয় ১৯৭৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীর ৫,৭৩৬ তম বছর শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে পৃথিবীর বয়স ৫,৭৩৬ বছরে পড়েছে। মানুষ সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির কয়েক দিন পরে। সুতরাং মানুষের বয়সও ঐ একই দাঁড়ায়।

এ প্রসঙ্গে সামান্য একটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। প্রাচীন কালে চান্দ্রবর্ষের ভিত্তিতে সময় গণনা করা হত, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতে সময় গণনা করা হয় সৌরবর্ষের ভিত্তিতে। হিসাব নির্ভুল করার জন্য এ সংশোধন করা প্রয়োজন, কিন্তু সংশোধন যদি না করা হয়, তাহলে হেরফের হয় শতকরা মাত্র তিন ভাগ। সুতরাং হিসাব সহজ করার জন্য এ হেরফের আমরা উপেক্ষা করছি। এক হাজার বছরের হিসাবে যদি তিরিশ বছর এদিক সেদিক হয়, তাহলে আমাদের মূল বক্তব্য বোধহয় খুব একটা ভুল হবে না। সুতরাং হিব্রু হিসাবের ভিত্তিতে আমরা প্রায় সঠিকভাবেই বলতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় সাইত্রিশ শতাব্দী আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়ে কি বলে? এ প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব দেয়া কঠিন। তবে সৌরমন্ডল গঠিত হওয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত হিসাবেও উপনীত হওয়া যেতে পারে। সৌরমন্ডল গঠিত হওয়ার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাড়ে চারশো কোটি বছর অতিবাহিত হয়েছে বলে ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং এ সর্বজন স্বীকৃত হিসাব এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রদত্ত হিসাবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা সহজেই বের করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা একটু পরে করব। তার আগে আমরা বাইবেল থেকে হিসাব পাওয়ার পদ্ধতির উপর কিছুটা আলোকপাত করব।

বাইবেলের বর্ণনা গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করলে এ হিসাব পাওয়া যায়। জেনেসিস অর্থাৎ আদিপুস্তকে আদম থেকে ইব্রাহীম পর্যন্ত কত সময় অতিবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তার পরের পর্যায়ে, অর্থাৎ ইবরাহীম থেকে খৃষ্টধর্ম শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত কাল সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা অপর্যাপ্ত। সুতরাং তার পোষকতায় অন্যান্য তথ্যের প্রয়োজন।

আদম থেকে ইবরাহীম

জেনেসিস বা আদি পুস্তকের ৪, ৫, ১১, ২১ ও ২৫ অধ্যায়ে আদম পর্যন্ত ইবরাহীমের সকল পূবপুরুষের সুনির্দিষ্ট নসবনামা দেয়া আছে। প্রত্যেকের জীবনকাল এবং পুত্রের জন্মের সময় পিতার বয়সও দেয়া আছে। সুতরাং আদম সৃষ্টির কত বছর পর কার জন্ম বা মৃত্যু হয়েছিল তা সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে। নীচের তালিকায় যে সকল তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা জেনেসিসের স্যাকারডোটাল সংস্করণ থেকে নেয়া হয়েছে এবং একমাত্র এ বাইবেলেই এ তথ্য আছে। এ হিসাব থেকে দেখা যায় যে, আদমের ১,৯৪৮ বছর পর ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্রাহীমের নসবনামা

		আদম সৃষ্টির পর জন্মের তারিখ	হায়াত	আদম সৃষ্টির পর মৃত্যুর তারিখ
১।	আদম	-	৯৩০	৯৩০
	সেথ	১৩০	৯১২	১০৪২
	ইনোশ	২৩৫	৯০৫	১১৪০
	কেনান	৩২৫	৯১০	১২৩৫
	মাহালালিল	৩৯৫	৮৯৫	১২৯০
	জারেদ	৪৬০	৯৬২	১৪২২
	ইনোক	৬২২	৩৬৫	৯৮৭
	মেথুছেলা	৬৮৭	৯৬৯	১৬৫৬
	লামেক	৮৭৪	৭৭৭	১৬৫১
১০।	নূহ	১০৫৬	৯৫০	২০০৬
	শেম	১৫৫৬	৬০০	২১৫৬
	আরফাখশাদ	১৬৫৮	৪৩৮	২০৯৬
	শেলাহ	১৬৯৩	৪৩৩	২১২২
	ইবার	১৭২৩	৪৬৪	২১৮৭
	পেলেগ	১৭৫৭	২৩৯	১৯৯৬
	রিউ	১৭৮৭	২৩৯	২০২৬
	সেরুগ	১৮১৯	২৩০	২০৪৯
	নাহোর	১৮৪৯	১৪৮	১৯৯৭
	তেরাহ	১৮৭৮	২০৫	২৯৮৩
২০।	ইবরাহীম	১৯৪৮	১৭৫	২১২৩

ইবরাহীম থেকে ঈসা

এ আমলের জন্য বাইবেলে কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য দেয়া হয়নি। সুতরাং ইব্রাহীম থেকে ঈসা পর্যন্ত সময় নির্ণয় করার জন্য আমাদের অন্য উৎসের সন্ধান করতে হবে। বর্তমানে ইবরাহীমের আমল মোটামুটি ভাবে ঈসার আঠার শতাব্দী আগে বলে ধরা হয়ে থাকে। জেনেসিসে ইবরাহীম ও আদমের মধ্যবর্তী সময়ের যে হিসাব পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যায় যে, আদম হচ্ছেন মোটামুটি ভাবে ঈসার আটত্রিশ শতাব্দীর আগের মানুষ। এ হিসাব স্পষ্টতই ভুল এবং এ ভুল আসছে বাইবেলের আদম-ইবরাহীম আমলের হিসাব থেকে। অথচ ইহুদী পঞ্জিকা এখনও এ হিসাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ইহুদী পুরোহিতদের আনুমানিক হিসাব এবং আধুনিক তথ্যের মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে, তার ভিত্তিতে আমরা অতি সহজেই বাইবেলের সত্যের ঐতিহ্যবাহী রক্ষকদের মুকাবিলা করতে পারি। অথচ বহু শতাব্দী যাবত তাদের এ হিসাবের ভিত্তিতেই ঈসার জীবনের প্রাচীন ঘটনাবলীর সময় নির্ণয় করা হয়েছে।

আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার আগে বাইবেলের প্রত্যেক সংস্করণে একটি ভূমিকা জুড়ে দেয়া হত। সেখানে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ঐ সংস্করণের সম্পাদনার সময় ঘটনাবলীর ক্রমিকতা ব্যাখ্যা করা হত। বিভিন্ন সংস্করণে সময়ের বেশ হেরফেরও হত। উদাহরণ স্বরূপ ১৬২১ সালের ক্লিমেনটাইন ভালগেট সংস্করণে ইবরাহীমের যামানা আরও আগে বলে ধরা হয়েছে এবং পৃথিবীর সৃষ্টি মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব চল্লিশতম শতাব্দীতে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকটি ভাষায় লিখিত ওয়ালটনের বাইবেলে ইব্রাহীমের পূর্বপুরুষদের যমানার বিবরণ এখানে বর্ণিত নসবনামার অনুরূপ আকারে দেয়া হয়েছে। প্রায় সকল হিসাবই এ নসবনামার সঙ্গে মিলে যায়। আধুনিক যুগের বাইবেল সম্পাদকগণ অবশ্য এ হিসাব ও ভূমিকা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পৃথিবীর সৃষ্টি আরও আগে হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং ঐ পুরানো হিসাব এখন আর কারও কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ সংগে পাঠকদের পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া তাঁদের উচিত ছিল যে, বাইবেলের বর্ণনা অচল হয়ে গেছে এবং তাতে আসলে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু এ কথাটি তাঁরা বলেননি। পক্ষান্তরে কথার মারপ্যাঁচে তাঁরা এমন একটি রহস্যময় আবরণ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে কোনরকম রদবদল ছাড়া বাইবেলের বিবরণ যেমন আছে, ঠিক সে ভাবেই যেন সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

এ কারণে স্যাকারডোটাল সংস্করণে বর্ণিত নসবনামা এখনও মেনে নেয়া হয়, যদিও এ বিংশ শতাব্দীতে ঐ গালগল্প ভিত্তিক হিসাব আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে দুনিয়ায়

মানুষের আবির্ভাবের কোন সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিছুটা ইশারা ইংগিত পাওয়া যেতে পারে মাত্র। তবে আমরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নিতে পারি যে, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানুষের মত একই অবয়ব বিশিষ্ট আরও প্রাণী আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষকে তাদের থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত করে থাকে। এ মানুষের যে প্রাচীনতম অস্থি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, মানুষের আবির্ভাব লক্ষ লক্ষ বছর আগে হয়েছে।

এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের অস্থির সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এ মানুষ ক্রো-ম্যাগনন মানুষ নামে অভিহিত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষের মত একই অবয়বের প্রাণীর বহু প্রাচীন অস্থিও আবিষ্কৃত হয়েছে বটে এবং সেগুলো স্পষ্টতই আরও আগের আমলের। কিন্তু সেগুলি আসলে মানুষেরই অস্থি কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

তবে জেনেসিসে মানুষের আবির্ভাবের যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য যে তার অনেক আগের সময় নির্দেশ করে থাকে, সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাইবেল ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ও বিরোধ রয়েছে।

বন্যা ও প্লাবন

জেনেসিসের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বন্যার বর্ণনা আছে। বর্ণনা আসলে দুটি, কিন্তু তা পাশাপাশি পেশ না করে একত্রে মিশিয়ে একটি বর্ণনার আকারে পেশ করা হয়েছে এবং মিশিয়ে ফেলার কাজটি এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে ক্রমিকতা ও সংঘবদ্ধতার দিক থেকে বাহ্যত একটি বর্ণনা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ঐ তিনটি অধ্যায়ে স্পষ্ট পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। কারণ সেই একই, অর্থাৎ বিষয়বস্তু দুটি উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। একটি ইয়াহভিস্ট সংস্করণ, এবং অপরটি স্যাকারডোটাল সংস্করণ।

এ দুটি সংস্করণের বিবরণ থেকে অনুচ্ছেদ বা বাক্য নিয়ে একটির পর অপরটি এমনভাবে বসানো হয়েছে যে, ইংরাজী অনুবাদের প্রায় একশো লাইনের মধ্যে কমপক্ষে সতর বার উৎস বদলের সন্ধান পাওয়া যায়।

যাহোক বিবরণটি মোটামুটি এরূপ- মানুষের পাপাচার সীমাহীন হওয়ায় আল্লাহ অন্যান্য প্রাণীসহ তাকে ধ্বংস করতে স্থির করেন। তিনি নূহকে সতর্ক করে দেন এবং নৌকা বানাতে বলেন। ঐ নৌকায় তিনি অন্যান্য প্রাণীসহ নূহকে তাঁর স্ত্রী, তাঁর তিন ছেলে ও তাদের স্ত্রীদের তুলে নিতে বলেন। এ জায়গা থেকে দুই বর্ণনার পার্থক্য দেখা যায়। এক বর্ণনায় (স্যাকারডোটাল) বলা হয়েছে যে, নূহকে প্রত্যেক প্রজাতির এক

জোড়া প্রাণী নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই (ইয়াহভিষ্ট) বলা হয়েছে যে, নূহকে তথাকথিত 'পবিত্র' প্রাণীর প্রত্যেক প্রজাতির সাতটি পুরুষ ও সাতটি নারী এবং 'অপবিত্র' প্রাণীর প্রত্যেক প্রজাতির একটি পুরুষ ও একটি নারী নিতে বলা হয়েছিল। পরে অবশ্য বলা হয়েছে যে, নূহ আসলে প্রত্যেক প্রজাতির এক জোড়া প্রাণী সঙ্গে নিয়েছিলেন। ফাদার দ্য ভক্সের মত বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, এ অনুচ্ছেদটি ইয়াহভিস্ট বর্ণনার একটি বিকৃত রূপ।

ইয়াহভিস্ট অনুচ্ছেদে বৃষ্টির ফলে বন্যা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে স্যাকারডোটাল অনুচ্ছেদে বৃষ্টি এবং মাটি থেকে উঠে আসা পানির কথা বলা হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবী, এমনকি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত পানিতে ডুবে গিয়েছিল। সমস্ত প্রাণী মারা গিয়েছিল। এক বছর পর পানি সরে গেলে নৌকা আরলত পাহাড়ে ভেড়ে এবং নূহ অবতরণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বন্যার মেয়াদের হিসাবেও গরমিল রয়েছে। ইয়াহভিস্ট বর্ণনায় বলা হয়েছে চল্লিশ দিন, আর স্যাকারডোটাল বর্ণনায় আছে একশো পঞ্চাশ দিন।

নূহের জীবনের কোন পর্যায়ে বন্যা হয়েছিল, সে সম্পর্কে ইয়াহভিস্ট বর্ণনায় কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু স্যাকারডোটাল বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, নূহের বয়স তখন ছয়শো বছর ছিল। এ বর্ণনায় আদম ও ইবরাহীমের সঙ্গে সম্পর্ক দেখিয়ে নূহের নসবনামাও দেয়া হয়েছে। জেনেসিসে দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যায় যে, নূহ আদমের ১,০৫৬ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (নসবনামা দেখুন)। সুতরাং বন্যা হয়েছিল আদম সৃষ্টি হওয়ার ১,৬৫৬ বছর পরে। ইবরাহীমের সম্পর্কের প্রসঙ্গে জেনেসিসে বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্মের ২৯২ বছর আগে বন্যা হয়েছিল।

জেনেসিসের মতে বন্যার ফলে সমগ্র মানবজাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পরে নূহের তিন ছেলে ও তাদের স্ত্রীগণ দুনিয়ায় মানুষের আবাদ করেন। অর্থাৎ মানব জাতি পুনর্গঠিত হয়। সুতরাং প্রায় তিন শতাব্দী পরে যখন ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন, তখন মানবজাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পুনর্গঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে এ পুনর্গঠন কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? এ একটি মাত্র প্রশ্নেই এ বর্ণনার সত্যতার সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায়।

তাছাড়া ইতিহাসের আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গেও ঐ বর্ণনার কোন সঙ্গতি নেই। ইবরাহীমের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে বলে ধরা হয়েছে। অথচ বন্যা যদি তার তিনশো বছর আগেই হয়ে থাকে, তাহলে তো তাঁর জন্ম খৃষ্টপূর্ব একবিংশ থেকে দ্বাবিংশ শতাব্দীর মধ্যে হওয়ার কথা।

ইতিহাসের আধুনিক জ্ঞান থেকে জানা যাচ্ছে যে, দুনিয়ার কয়েকটি এলাকায় ঐ সময় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, এবং তার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

মিসরের ক্ষেত্রে ঐ প্রাচীন সভ্যতা মধ্য রাজবংশের (খৃষ্টপূর্ব ২,১০০ সাল) আগের আমলের। ঐ আমল মোটামুটিভাবে একাদশ রাজবংশের পূর্ববর্তী প্রথম মধ্যম আমলের সমসাময়িক। ব্যবিলনে তখন উরে তৃতীয় রাজবংশের আমল। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, এ সভ্যতা প্রবাহে কোন ছেদ পড়েনি, এবং সমগ্র মানব জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়নি। অথচ বাইবেলে সেই কথাই বলা হয়েছে।

সুতরাং বাইবেলের এ তিনটি বর্ণনায় সত্য আছে বলে আমরা মেনে নিতে পারি না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে আমাদের স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না যে, বাইবেলের যে পাঠ এখন আমাদের সামনে আছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। এ অবস্থায় আমাদের নিজের কাছেই প্রশ্ন করতে হয় যে, আল্লার পক্ষে সত্য ছাড়া আর কিছু নাযিল করা কি আদৌ সম্ভব? এমন কিছু ধারণা করাও অসম্ভব যে, আল্লাহ মানুষকে যা জানিয়ে দিয়েছেন, তা কেবল অবাস্তবই নয়, পরস্পর বিরোধীও বটে। সুতরাং আমরা স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বাইবেলের মূল পাঠে বিকৃতি ঘটেছে এবং বিকৃতি মানুষের দ্বারাই ঘটেছে। মুখে মুখে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে আসার সময়, অথবা লিখিত হয়ে যাওয়ার পর তা নকল বা সম্পাদনা করার সময় এ বিকৃতি ঘটেছে। প্রায় তিনশো বছরের মধ্যে জেনেসিসের মত গ্রন্থ যখন কমপক্ষে দুইবার সম্পাদিত ও পরিমার্জিত হয়েছে বলে জানা যায়, তখন সেই কিতাবে অবাস্তবতা ও অসম্ভাব্যতা থাকা বোধ হয় তেমন বিচিত্র কিছু নয়। অবশ্য এ অবাস্তবতা ও অসম্ভাব্যতা এখন আমাদের কাছে এ কারণে ধরা পড়েছে যে, আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে পুরোপুরি না হলেও সত্যের কিয়দংশ অন্তত আমরা জানতে পারছি এবং প্রাচীন বিবরণের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। বাইবেলের ভুল ভ্রান্তির জন্য মানুষকে দায়ী করা ছাড়া আর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই এবং সম্ভবত থাকতেও পারে না। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টান এ উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভাষ্যকারই এ যুক্তি মেনে নিতে চান না। এ ব্যাপারে তাঁদের নিজস্ব কোন যুক্তি ও বক্তব্য আছে। সেগুলি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

বাইবেলের ভ্রান্তি সম্পর্কে খৃষ্টান ভাষ্যকারদের বক্তব্য

বৈজ্ঞানিক তথ্য বিচার বিবেচনায় বাইবেলে যে সকল ভ্রান্তি, অসম্ভাব্যতা, ও স্ববিরোধিতার সন্ধান পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে খৃষ্টান ভাষ্যকারদের নানাবিধ বক্তব্য ও ব্যাখ্যা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কোন কোন ভাষ্যকার কিছু কিছু ভুল স্বীকার করেন এবং কিছু কিছু জটিল সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন ভাষ্যকার আবার ভুল এড়িয়ে গিয়ে মূল পাঠের বক্তব্য সমর্থন করে থাকেন। তারা অযৌক্তিক যুক্তির ধুম্রজাল বিস্তার করে সম্ভবত আশা করেন যে, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে

গ্রহণযোগ্য নয়, তা মানুষ সহজেই ভুলে যাবে।

ফাদার দ্য ভক্স তাঁর জেনেসিসের তরজমার ভূমিকায় এরূপ বিতর্কিত বক্তব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু অবৈধতার বদলে তিনি তার বৈধতাই ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তিনি অবশ্য প্রাচীন ঘটনাবলী যুক্তিসঙ্গত আকারে পুনর্গঠন করার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাননি। তাঁর মতে "তাইগ্রিস ও ইইফ্রেতিস উপত্যকার যে একটি বা দুটি ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি কালক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে বিশ্বব্যাপী বন্যার আকার ধারণ করেছে এবং সেইভাবে বাইবেলে লিখিত হয়েছে" তার কোন নিজস্ব গুরুত্ব নেই। এ ঘটনার "আসল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের বিদ্বেষের প্রতি আল্লার ইনসাফ এবং সৎ মানুষের প্রতি তার রহমত। বাইবেলের এ ঘটনার লেখক এ তাৎপর্যটিই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।"

এভাবে জনপ্রিয় কিংবদন্তিকে আসমানী পবিত্রতায় অভিসিক্ত করার যৌক্তিকতা সাব্যস্ত করা হয়েছে। লেখক তার ধর্মীয় শিক্ষা উদাহরণ সহকারে বুঝাতে গিয়ে কিংবদন্তি ব্যবহার করেছেন, এ যুক্তিতে ঐ কিংবদন্তিকেও মানুষের বিশ্বাসের অংশ বলে পেশ করা হয়েছে। এ ধরনের যুক্তিকে সঙ্গত বলে মেনে নেয়া হলে পবিত্র ও আল্লার কালাম সম্বলিত বলে অভিহিত রচনায় অবশ্য যে কোন ধরনের অসম্ভবকে অতি সহজেই সম্ভব বলে চালিয়ে দেয়া যায়। আর আল্লার কালামে এভাবে মানুষের হস্তক্ষেপ হয়েছে বলে যদি স্বীকার করেই নেয়া হয়, তাহলে অবশ্য বাইবেলের পাঠে সকল প্রকার মানবীয় হস্তক্ষেপ ও রদবদলের একটি সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকলেই যদি মূল পাঠেও রদবদল করা জায়েজ হয়ে যায়, তাহলে তো আর বলার কিছুই থাকে না। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর স্যাকারডোটাল লেখকগণ কিভাবে তাদের খেয়ালখুশী মাফিক মূল পাঠে রদবদল করেছেন। তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও উচ্চবাচ্য করার আর কোন উপায় থাকে না।

বহু খৃষ্টান ভাষ্যকার বাইবেলের বর্ণনার ভুল, অসম্ভাব্যতা ও স্ববিরোধিতার এ কথা বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন যে, বাইবেলের লেখকগণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা মানসিকতার সামাজিক পটভূমিতে তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন; ফলে গরমিল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাখ্যা থেকেই বিভিন্ন ধরনের "সাহিত্যিক স্টাইল" এর কথা চালু হয়েছে। অর্থাৎ সকল সমস্যার একটি সর্বরোগহর বটিকা খুঁজে পাওয়া গেছে। দুটি পাঠের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যহীনতা পাওয়া গেলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পটভূমি এবং ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের কথা বলেই তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ যুক্তি অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন না। কিন্তু তবুও তার ব্যবহার ও প্রয়োগ এখনও বন্ধ হয়নি। পরে নিউ টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব যে, সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা ব্যাখ্যা করার জন্যও ঠিক এ যুক্তিই প্রয়োগ করা হয়েছে।

যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন কোন বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করার জন্য আর একটি কৌশল

প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মূল বিষয়ের চারপাশে কৈফিয়ত বা ব্যাখ্যামূলক অন্যান্য নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হয়ে থাকে। ফলে পাঠকের দৃষ্টি মূল বিষয় থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়া হয়।

কার্ডিনাল দানিয়েলো বন্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঠিক এ পন্থাই অবলম্বন করেছেন। "লিভিং গড" নামক পত্রিকার ফরাসী নাম "ডিউ ডিভান্ট" (নম্বর ৩৮, ১৯৭৪, পৃঃ ৯৫-১১২) প্রকাশিত "ফ্লাড ব্যাপটিজম জাজমেন্ট" নামক নিবন্ধে তিনি বলেন, "চার্চের প্রাচীনতম কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে যে, বন্যার ধর্মীয় তাৎপর্যে যীশু এবং চার্চের প্রতিচ্ছবি রয়েছে। এটা সবিশেষ তাৎপর্যময় ঘটনা। সমগ্র মানবজাতির উপর একটি রায় স্বরূপ।" তারপর "অরিজেন" থেকে উধৃত করে তিনি তাঁর "হোমিলিজ অন ইজেকিয়েল" নামক রচনায় বলেছেন- "সমগ্র বিশ্বের জাহাজডুবি চূড়ায় রক্ষা পায়।" তারপর তিনি আট সংখ্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন- "পাহাড়ের চূড়ায় আটজন মানুষ রক্ষা পায়। নূহ, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর তিন পুত্র ও তাদের স্ত্রীগণ। এ কারণে আট সংখ্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" জাস্টিন তাঁর "ডায়ালগ" নামক রচনায় যে যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেই যুক্তিকে নিজের পক্ষে প্রয়োগ করে তিনি বলেছেন- "পাহাড়ের চূড়ায় আটজন মানুষ রক্ষা পায়। যীশু যে অষ্টম দিনে মৃত অবস্থা থেকে পুনর্জীবিত হয়ে ওঠেন, ঐ আটজন আসলে তারই প্রতীক মাত্র। নূহ হচ্ছেন যীশুর প্রতিচ্ছবি। বন্যার পর তিনি প্রথম জাতকও বটে। যীশু বাস্তবে যা করেছেন, নূহ পূর্বে তার আভাস দিয়েছেন মাত্র।" এ ভাবে তুলনা দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন যে, নূহের নৌকা ছিল কাঠের এবং যীশুর ক্রসও ছিল কাঠের। এ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের সমধিক তাৎপর্যের কারণেই নাকি বন্যার ধর্মীয় মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে! অর্থাৎ কার্ডিনাল সাহেব বলতে চেয়েছেন যে, যীশুর সঙ্গে যার সম্পর্ক বা সাদৃশ্য নেই, তার আদৌ কোন গুরুত্ব নেই।

এ ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক তুলনা সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ তুলনা একটি ভাষ্য মাত্র এবং তাও এমন একটি ঘটনা সম্পর্কে যে ঘটনা বাইবেলের ভিত্তিতে একটি বিশ্বজনীন ঘটনা বলেও প্রমাণিত হয় না এবং সময়ের দিক থেকেও সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। কার্ডিনাল দানিয়েলের বিবরণও যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা বড়জোর মধ্যযুগে উপনীত হতে পারি এবং মধ্যযুগ হচ্ছে এমন একটি যুগ, যখন বাইবেল সম্পর্কে একমাত্র সমর্থনমূলক আলোচনা ছাড়া আর কোন প্রকারের আলোচনাই সম্ভবপর ছিল না।

তবে সুখের বিষয় এই যে, ঐ নিষিদ্ধ যুগের আগেই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তা প্রকাশও করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সেন্ট অগাস্টিনের নাম করা যেতে পারে। তাঁর চিন্তাধারা তাঁর যুগের তুলনায় স্পষ্টতই যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল। সে যুগে সেই ফাদার্স অবদি চার্চের আমলে বাইবেলের মূল পাঠ সম্পর্কিত আলোচনায়

নিশ্চয়ই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কারণ সেন্ট অগাস্টিন তাঁর ৮২ নম্বর চিঠিতে এ ধরনের সমস্যার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- "ক্যানোনিক গ্রন্থগুলি সম্পর্কে আমার গভীরতম শ্রদ্ধাবোধ আছে এবং আমার মনে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, লেখার সময় লেখকগণ সঠিকভাবেই লিখেছেন এবং কোন ভুল করেননি। কিন্তু এ সকল গ্রন্থে আমি যখন এমন কোন বিবরণ দেখতে পাই যা বাস্তবতার বিরোধী, তখন আমার মনে আর সন্দেহ থাকে না যে, হয় আমার কপিটিতেই ভুল আছে না হয় অনুবাদক মূলের সঠিক অনুবাদ করতে পারেনি, আর না হয় আমি নিজেই হয়ত ব্যাপারটি ঠিকমত বুঝতে পারিনি।"

ধর্মগ্রন্থে যে ভুল থাকতে পারে সেন্ট অগাস্টিন তা কল্পনাও করতে পারেননি। ধর্মগ্রন্থ নির্ভুল এ কথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু সত্য ও বাস্তবতার বিরোধী কোন বিবরণের মুখোমুখী তিনি ভুলের যে সকল সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে মূল লেখকের ভুলের কোন উল্লেখ নেই। একজন কৌতূহলী বিশ্বাসীর মনোভাবই এ রকম। তাঁর আমলে বাইবেল ও বিজ্ঞানের মধ্যে মোকাবিলার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এ মোকাবিলায় বর্তমানে যে সকল সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাঁর মত অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিচার করলে তার অধিকাংশ সমস্যাই অতি সহজে সমাধান হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের বিশেষজ্ঞগণ বাইবেলে কোন ভুল আছে বলে স্বীকারই করতে চান না। এ অভিযোগকে তারা আদৌ কোন আমল দেন না এবং বাইবেলে যা আছে, তাকেই সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করে থাকেন। বাইবেলের বিবরণ স্পষ্টতই ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যে তা সমর্থন করা প্রয়োজন, জেনেসিসের ভূমিকায় ফাদার দ্য ভক্স তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। "বর্তমানে ইতিহাস পাঠের জন্য যে বিধান অনুসরণ করা হয়", সেই বিধান মোতাবেক বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাস পাঠ না করার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে ইতিহাস যেন ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় লেখা সম্ভব। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইতিহাসে যখন ভুল বর্ণনা করা হয়, তখন তা ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে সত্য বা তথ্য কখনও মূল বিচার্য বিষয় হয় না। অথচ ভাষ্যকারগণ তবুও বাইবেলের বিবরণের সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক, জীবাশ্মতাত্ত্বিক, অথবা প্রাগৈতিহাসিক কোন তথ্য মিলিয়ে দেখতে রাজি হন না। তাঁরা বলেন- "এই সকল কোন বিদ্যার তথ্য বা বিধানের সঙ্গে বাইবেলের মিল থাকার প্রয়োজন নেই। কেউ মিল খুঁজতে গেলে তা হবে অবাস্তব মুকাবিলা এবং কৃত্রিম তুলনা" (জেনেসিসের ভূমিকা, ৩৫ পৃষ্ঠা)। স্পষ্টতই জেনেসিসের যে সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী, বিশেষত প্রথম এগারটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর কথা মনে রেখেই এ মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু ঐ বাইবেলেরই কিছু কিছু বিবরণ যখন আধুনিক অনুসন্ধানে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখন ফাদার দ্য ভক্স আনন্দ প্রকাশ করতে বিলম্ব করেননি। "এই সকল বিবরণের সত্যতায় যারা সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, তারা এখন দেখতে

পারেন যে ইতিহাস এবং প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের তথ্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া গেছে।" (জেনেসিসের ভূমিকা ৩৪ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ বিজ্ঞানে যদি বাইবেলের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে তা বৈধ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে; কিন্তু সমর্থন **যদি না** পাওয়া যায়, তাহলে আদৌ কোন তুলনাই করা যাবে না। এ হচ্ছে ভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞদের যুক্তির ধারা!

আধুনিক ধর্মবিদগণ অবশ্য এ মীমাংসার অযোগ্য সমস্যার মীমাংসা করার জন্য একটি উপায় আবিষ্কার করেছেন। তারা সত্যের চিরন্তন ধারণাকেই বদলে দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্যারিস থেকে লা সেঞ্চুরিয়ান কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ধর্মবিদ ও লোরেজ লিখিত "বাইবেলের সত্য কি?" (কোয়েলে এস্ট লা ভেরিটে দ্য লা বাইবেল) নামক পুস্তকে এ নতুন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনার স্বল্প পরিসরে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্পর্কে ঐ নতুন তত্ত্বে যে রায় দেয়া হয়েছে, এখানে সেইটুকু তুলে দিলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে- "দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিল বাইবেলের বিবরণের সত্যতা ও অসত্যতা নির্ণয়ের বিধান দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে এরূপ বিধান প্রণয়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ বাইবেলের বর্ণনার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে, চার্চ নীতিগত বা সাধারণভাবে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈধতা বা অবৈধতা নির্ণয় করতে পারে না।

স্পষ্টই সত্যে উপনীত হওয়ার উপায় হিসাবে "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির" বৈধতা সম্পর্কে রায় দিতে চার্চ সক্ষম নয়। কিন্তু প্রশ্ন তো এখানে তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে প্রমাণিত তথ্য সম্পর্কে, কোন তত্ত্ব বা পদ্ধতি সম্পর্কে নয়। বাইবেলের মতে সাইত্রিশ বা আটত্রিশ শতাব্দী আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা যে আদৌ সত্য নয় এটা জানার জন্য এ যুগে খুব বেশী বিদ্বান হওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমরা জানি যে, ঐ সময় মানুষের আবির্ভাব হয়নি এবং বাইবেলের যে নসবনামার ভিত্তিতে ঐ হিসাব বের করা হয়েছে, তা সন্দেহের অতীত রূপেই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। লেখক লোরেজ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অবহিত আছেন। মূল সমস্যার মুখোমুখী যাতে না হতে হয়, সেই জন্যই তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে ঐ এড়িয়ে যাওয়া মন্তব্য করেছেন।

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বাইবেলের ভুল তথ্যের মোকাবিলায় খৃষ্টান বিশেষজ্ঞগণ যে এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য করে থাকেন, এ ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ব্যাপারটি তাদের জন্য সত্যই অস্বস্তিকর এবং এ সঙ্গে আর একটি কথাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে বাইবেলের এ তথ্যগুলি মানুষের রচিত; কোন অহী নয়।

খৃষ্টান জগতের এ অস্বস্তি দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলেই (১৯৬২-১৯৬৫) সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সুদীর্ঘ তিন বছর আলোচনার পর এবং পাঁচ বার মুসাবিদা করার পর অহী সম্পর্কে একটি ঘোষণার ব্যাপারে তারা একমত হতে সক্ষম হন।

প্যারিসে লা সেঞ্চুরিয়ান কর্তৃক ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত অহী সম্পর্কিত ৪ নম্বর কনসিলিয়ার ডকুমেন্টের ভূমিকায় হিজ গ্রেস ওয়েবার বলেছেন- "যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতি কাউন্সিলকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল, অবশেষে এ ভাবে তার অবসান ঘটে।"

ঐ দলীলে ওল্ড টেস্টামেন্টের অসম্পূর্ণতা (অধ্যায়-৪, পৃষ্ঠা-৫৩) ও অসঙ্গতি অকপটে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে- "যীশু খৃষ্টের নাজাত কায়েম করার আগের মানবিক পরিস্থিতিতে ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রন্থগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। কে আল্লাহ আর কে মানুষ এবং আল্লাহ তাঁর ইনসাফ ও করুণায় মানুষের সঙ্গে কি আচরণ করে থাকেন, ঐ গ্রন্থগুলি থেকেই তা সকলে জানতে পেরেছিল। গ্রন্থগুলিতে যদিও এমন কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে যা অসম্পূর্ণ ও অপ্রচলিত তবুও ঐ গ্রন্থগুলিই প্রকৃত আসমানী শিক্ষার বাহন ও প্রমাণ।"

যে সকল বিষয়বস্তু সম্পর্কে "অসম্পূর্ণ" ও "অপ্রচলিত" বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলি স্পষ্টতই সমালোচনাযোগ্য এবং একদিন ঐ অনুচ্ছেদগুলি হয়ত বর্জনও করা হতে পারে। তবে ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, মূলনীতিটি এখন বেশ পরিষ্কারভাবেই স্বীকার এবং ঘোষণা করা হয়েছে।

উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যটি ভ্যাটিকান কাউন্সিলে অনুমোদিত সাধারণ ঘোষণার একটি অংশ। ঘোষণাটি ২,৩৪৪ ভোটে গৃহীত হয়। মাত্র ৬টি ভোট বিপক্ষে পড়ে। তবুও ঘোষণাটি পুরোপুরি সর্বসম্মত হয়েছে, এমন কথা বোধহয় বলা যায় না। আসলে ঐ অনুমোদিত ঘোষণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে খোদ হিজ গ্রেস ওয়েবার এমন একটি মন্তব্য করেছেন, যাতে মূল ঘোষণাটিই সংশোধন করে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "ইহুদী বাইবেলের কোন কোন গ্রন্থ সাময়িকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে মাত্র, এবং ঐ গ্রন্থগুলিতে এমন কিছু বিষয়বস্তু আছে, যা অসম্পূর্ণ।"

মূল দলীলে যেখানে "অপ্রচলিত" বলা হয়েছে, ব্যাখ্যায় সেখানে বলা হয়েছে "সাময়িকভাবে গ্রহণযোগ্য", কিন্তু এ দুটি কথায় কি একই অর্থ বুঝা যায়? তদুপরি ওয়েবার "ইহুদী" শব্দটি ব্যবহার করে এরূপ একটি ধারণা দিতে চেয়েছেন যে, মূল দলীলে হিব্রু বাইবেলেরই সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মূল দলীলে তো 'ইহুদী' শব্দটি আদৌ ব্যবহারই করা হয়নি। আসলে অংশত অসম্পূর্ণ ও অপ্রচলিত বলে কাউন্সিলে যে গ্রন্থের সমালোচনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে খৃষ্টানদেরই ওল্ড টেস্টামেন্ট।

উপসংহার

বাইবেল যেমন আছে ঠিক সেই আকারেই তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কেউ এ ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকলে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে যে, ওল্ড

টেস্টামেন্টে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ থাকতে পারে এবং স্ববিরোধিতা, ঐতিহাসিক ভ্রান্তি, অসম্ভাব্যতা ও প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিও থাকতে পারে। মানুষের রচিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ ভুলভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। একই সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে লেখা অন্য যে কোন গ্রন্থেও ঐ ভুলভ্রান্তি পাওয়া যাবে।

যখন বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করাই সম্ভব ছিল না এবং অসম্ভাব্যতা ও স্ববিরোধিতা নির্ণয়ের একমাত্র উপায় ছিল ব্যক্তিগত সঙ্গত চিন্তা, তখনই সেন্ট অগাস্টিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিতে পারেন না, যা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং তিনি এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, যা সত্যের বিরোধী তা আল্লার কাছ থেকে এসেছে বলে দাবী করা যেতে পারে না। এবং এ নীতির ভিত্তিতে যা বাদ দেয়ার উপযুক্ত তার সবকিছুই তিনি বাইবেল থেকে বাদ দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

পরবর্তীকালে বাইবেলের কোন কোন অনুচ্ছেদ যখন আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন কিন্তু সেই মনোভাব আর অনুসরণ করা হয়নি। সত্যকে সহজভাবে মেনে নিতে রাজি না হওয়ার এ মনোভাব ক্রমে এতই জোরদার হয়েছে যে, সত্য ও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন ঐ অনুচ্ছেদগুলি বাইবেলে বহাল রাখার যৌক্তিকতা বর্ণনা করে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল অবশ্য এ আপোসহীন মনোভাবের জোর অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। কারণ ওল্ড টেস্টামেন্টের কোন কোন গ্রন্থ সম্পর্কে তারা এ কথা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ঐ গ্রন্থে এমন কিছু কিছু কিছু বিষয়বস্তু আছে যা "অসম্পূর্ণ ও অপ্রচলিত।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ অভিমত কি শুধু অভিমতই থেকে যাবে, না বাইবেল থেকে ঐ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেয়ার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে? আসলে কিন্তু অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যতদিন বাদ না দেয়া হচ্ছে ততদিন যাবত কিন্তু ঐ অনুচ্ছেদগুলিই "আল্লার কাছ থেকে আসা শিক্ষার বাহন ও প্রমাণ" হিসেবে বহাল থেকে যাচ্ছে।

গসপেলঃ উৎস ও ইতিহাস

গসপেল পড়ার সময় অনেক পাঠকই কোন কোন বর্ণনার অর্থ উপলব্ধি করে বিব্রত এবং এমন কি লজ্জিতও হয়ে থাকেন। বিভিন্ন গসপেলে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পড়েও তারা একই অবস্থায় পড়ে থাকেন। মন্তব্য করেছেন ফাদার রোজেট তাঁর ইনিশিয়েশন টু দি গসপেলস (ইনিশিয়েশন আলা ইভানজাইলঃ প্রকাশক-এডিশনস দ্যু সিউইল, প্যারিস, ১৯৭৩) নামক গ্রন্থে। সাধারণ খৃষ্টানগণ এ ব্যাপারে কতখানি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন, তা তিনি উপলব্ধি করেন একটি ক্যাথিলিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত থেকে পাঠকদের চিঠির জবাব দিতে গিয়ে। এ পাঠকগণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা ও বিত্তের মানুষ এবং তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, তারা যে সকল অনুচ্ছেদ বা বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছেন, তা "স্ববিরোধী, হাস্যকর বা কলংকজনক না হলেও অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা এবং অবোধ্য।" কোন খৃষ্টান যদি মনোযোগ সহকারে পুরো গসপেল পাঠ করেন, তাহলে গভীরভাবে পীড়িত ও উদ্বিগ্ন হওয়া ছাড়া তার সত্যিই কোন উপায় থাকে না।

ফাদার রোজেটের বই ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর এ মন্তব্য খুবই সাম্প্রতিক। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্তও চার্চের উপাসনায় অথবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাদ্রিগণ গসপেলের যে অংশটুকু পড়তেন বা ব্যাখ্যা করতেন অধিকাংশ খৃষ্টান কেবল সেটুকুই জানতেন। প্রোটেস্টান্টদের কথা বাদ দিলে অন্যান্য খৃষ্টানগণ সাধারণত পুরো গসপেল কখনোই পড়তেন না। ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকে কেবলমাত্র উধৃতি থাকত। মূল পাঠের পুরো উধৃতি কখনই দেয়া হত না। একটি রোমান ক্যাথলিক স্কুলে আমি ভার্জিল ও প্লেটোর বই দেখেছি, কিন্তু নিউ টেস্টামেন্ট দেখতে পাইনি। নিউ টেস্টামেন্টের গ্রীক সংস্করণও খুবই উপযোগী হতে পারতো। কিন্তু ঐ গ্রন্থ কিম্বা খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কিত অন্য কোন রচনা যে কেন রাখা হয়নি তা আমি অনেক পরে বুঝতে পেরেছি। ঐ সকল গ্রন্থ থাকলে আমরা ছাত্ররা হয়ত এমন সব প্রশ্ন করতাম, যার জবাব দিতে শিক্ষকগণ সত্যিই বেকায়দায় পড়ে যেতেন।

এ ধরনের উপলব্ধি থেকেই চার্চ কর্তৃপক্ষ খৃষ্টান বাইবেল পাঠকদের আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন। ফাদার রোজেটের ভাষায়- "গসপেল কিভাবে পড়তে হবে, সে সম্পর্কে অধিকাংশ খৃষ্টানেরই প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।" তাঁর ব্যাখ্যার সাথে একমত হোক বা না হোক, কিন্তু একটি কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তিনি এ নাজুক পরিস্থিতির মুকাবিলা অন্তত করেছেন। তবে এভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা কিন্তু খুব বেশী সংখ্যক অহির ব্যাপারে করা হয়নি।

ব্যাপকভাবে বিলি-বন্টনের জন্য ছাপানো বাইবেলে যে ভূমিকা লেখা হয়ে থাকে, তাতে কখনই এমন কোন আভাস দেওয়া হয় না যে, বর্ণনার মূল পাঠ, তার সত্যতা,

অথবা তার লেখকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যে সকল মূল লেখকের পরিচয় সম্পর্কে আদৌ কিছু জানা যায় না, অথবা জানার উপায় নেই, এ ভূমিকায় তাদের সম্পর্কে অনেক 'সঠিক ও বিস্তারিত' তথ্য দেয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় নিছক অনুমানকে প্রমাণিত সত্য হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে। অথবা বলা হয়ে থাকে যে অমুক পাদ্রি অমুক ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন, অথচ বিশেষজ্ঞগণ তার ঠিক বিপরীত কথাই বলেছেন। যীশুর ধর্ম প্রচার সমাপ্ত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট আবির্ভাব হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে তারা খুবই কম বলে দেখিয়ে থাকেন। তারা এমন একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন যে, বাইবেলের সমুদয় বিবরণই যীশু খৃষ্টের সমসাময়িক কোন প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষ শ্রোতার মুখ থেকে শুনে একজন মাত্র লেখকই লিখে নিয়েছেন। অথচ বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, মূল পাঠ যে বহুবারই রদবদল করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। অবশ্য কোন কোন ভূমিকায় দু'একটি অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দেয়ার সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু যে তাচ্ছিল্য সহকারে ঐ সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তাতে সচেতন পাঠকের মনে সন্দেহ বরং জোরদারই হয়ে থাকে। এ ধরনের ভূমিকার সঙ্গে যোগ করা হয়ে থাকে পরিশিষ্ট, বিশেষত টিকা। এ টিকায় সকল প্রকার অসম্ভাব্যতা, স্ববিরোধিতা ও সুস্পষ্ট ভ্রান্তির সুচতুর ব্যাখ্যা দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং যারা সত্য উৎঘাটন করতে চায়, তাদের কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না।

এবার আমি এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করছি, যা পাঠককে আরও বেশী বিস্মিত করবে। বিশেষত যারা এ ধরনের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত নন, তারা তো রীতিমত হতবাক হয়ে যাবেন।

ম্যাথু বা জন যিশুর স্বর্গারোহন সম্পর্কে কোন কথাই বলেন নি। পক্ষান্তরে লুক তাঁর গসপেলে বলেছেন যে, স্বর্গারোহনের ঘটনা পুনরুত্থানের দিনই ঘটেছিল। আবার "এক্টস অব এপোসলস" নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চল্লিশ দিন পরে ঘটেছিল। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, লুকই এ গ্রন্থের লেখক হিসাবে পরিচিত। মার্ক স্বর্গারোহনের কথা উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু কোন দিনক্ষণ উল্লেখ করেননি। ফলে তাঁর বর্ণনা এখন সঠিক বলে গণ্য করা হয় না। এ অবস্থায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোন ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতেই যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনাটিকে সঠিক বলে ধরে নেয়ার কোন উপায় নেই। অথচ ধর্মীয় ভাষ্যকারগণ এ ভিত্তিহীন হওয়ার ব্যাপারটিকে আদৌ কোন গুরুত্ব দিতে চান না।

এট্রাইকট তাঁর "লিটল ডিকশনারি অব দি নিউ টেস্টামেন্ট" (পেটিট ডিকশনেয়ার দ্য নোভিও টেস্টামেন্ট, প্রকাশক-ডেসক্লি এন্ড কোম্পানী, প্যারিস, ১৯৬০) নামক গ্রন্থে স্বর্গারোহন সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেন নি। অথচ ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্যই এ বইখানি লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে জেরুসালেমের বাইবেল স্কুলের শিক্ষক

ফাদার বেনয় ও ফাদার বোইসমার্ড তাঁদের "দি সিনপসিস অফ দি ফোর গসপেলস" (সিনপসে দ্যে কোয়াত্রে ইভানজাইলস, প্রকাশক-এডিশানস দুসার্ফ, প্যারিস, ১৯৭২) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ৪৫১-৪৫২ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে লুকের গসপেল ও এক্টস অব এপোসলস গ্রন্থের বর্ণনায় যে পার্থক্য আছে, "সাহিত্যিক কৌশল" প্রয়োগ করে তা অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তা হয়ত যায়, কিন্তু "সাহিত্যিক কৌশল" বলতে যে আসলে কি বুঝায়, তা বুঝতে পারা বোধ হয় তেমন সহজ কাজ নয়।

অন্তত ফাদার রেজেট যে বুঝতে পারেননি এবং ঐ যুক্তি মেনেও নেন নি, তাতে বোধ হয় আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নিজেই যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাও ঠিক ঐ একই ধরনের। তিনি তাঁর "ইনিশিয়েশন টু দি গসপেল (১৯৭৩-১৮৭ পৃষ্ঠা) নামক গ্রন্থে বলেছেন- "অন্যান্য বহু ঘটনার মত এ ঘটনার ক্ষেত্রেও ধর্মীয় তাৎপর্য অনুধাবন না করে বাইবেলের বর্ণনা যদি কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে আদৌ কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। আসলে এটা কোন বাস্তব ঘটনাকে কোন সামঞ্জস্যহীন প্রতীকে প্রকাশ করার ব্যাপার নয়। যারা এ রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। দেহধারী মানুষ হিসাবে আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে আমাদের পক্ষে যা কিছু গ্রহণ সম্ভব, ঠিক সেই আকারেই তারা ঐ রহস্যময় ঘটনাগুলি আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন।"

কিন্তু এ ব্যাখ্যা কিভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে? তবে হ্যাঁ, সবকিছু বিনা শর্তে বিনা প্রশ্নে মেনে নেব, এ মনোভাব যদি গ্রহণ করা যায়, তাহলে বোধ হয় আর কোন সমস্যাই থাকে না।

ফাদার রোজেটের ভাষ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এ ধরনের "অন্যান্য বহু ঘটনা" যে রয়েছে, তা তিনি স্বীকার করেছেন। সুতরাং বিষয়টি গভীরভাবে, বস্তুনিষ্ঠভাবে, এবং সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। গসপেল রচনার সময় যে পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল এবং বিশেষত তখন যে ধর্মীয় পরিবেশ ছিল তা বিচার বিবেচনা করে দেখে তার মধ্য থেকেই ব্যাখ্যা ও মীমাংসা অনুসন্ধান করে বের করাই সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। মূল মৌখিক কিংবদন্তি এক সময় লিখিত আকার লাভ করে, তারপর যুগে যুগে তা পরিবর্তিত হয় এবং আমাদের যুগ পর্যন্ত আসতে আসতে তা অনেকবার পরিবর্তিত হয়। এ কথা মনে রাখলে অবোধ্য, দুর্বোধ্য, স্ববিরোধী বা হাস্যকর বিবরণ দেখে বিস্মিত হওয়ার বোধ হয় আর তেমন সুযোগ থাকে না। বর্তমান যুগের প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে যে সকল বিবরণ সামঞ্জস্যহীন বলে দেখা যাচ্ছে, সেগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। মূল রচনা বা তার রদবদল যে মানুষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে, এ যুক্তি প্রবাহ থেকে সে কথাই প্রমাণিত হয়।

বিগত কয়েক দশকে ধর্মীয় রচনা সম্পর্কিত গবেষণা এবং বিশেষত বস্তুনিষ্ঠ

গবেষণা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং এ গবেষণার ফলে ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় যে পরিবর্তন এসেছে তাও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্যারিসের ক্যাথলিক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ফাদার কানেনগিসার তাঁর "ফেথ ইন দি রেজারেকশন, রেজরেকশন অভ ফেথ" (ফই এন লা রেজারেকশন, রেজারেকশন দ্য লা ফই, প্রকাশক বিউশেন কলেজ, প্যারিস, ১৯৭৪) নামক গ্রন্থে বলেছেন- "পোপ দ্বাদশ পায়াসের আমলের পর বাইবেলের ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ায় যে বিপ্লব এসেছে বিশ্বাসীগণ সে সম্পর্কে তেমন অবহিত নয়।" দ্বাদশ পারাস ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত পোপ ছিলেন। সুতরাং লেখক যে "বিপ্লবের" কথা বলেছেন তা অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা এবং এ বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন কোন বিশেষজ্ঞ সাধারণ খৃষ্টানদের সেভাবে শিক্ষা দিতেও শুরু করেছেন। ফাদার কানেনগিসার বলেছেন- "ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ায় এ বিপ্লব আসার সংগে সংগে সুনিশ্চিত প্রাচীন ধারা রহিত হতে শুরু করেছে।"

তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন- "গসপেলে যিশু সম্পর্কে যে সকল খবর দেয়া হয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থে মেনে নেয়া উচিত নয়। কারণ এগুলি আসলে কোন ঘটনা উপলক্ষে তার সমর্থনে অথবা বিরোধিতায় রচনা করা, এবং রচনাকারীগণ যিশু সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ সমাজের কিংবদন্তিগুলিই লিখে দিয়েছেন।" যিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন যে, গসপেলের লেখকদের মধ্যে একজনও দাবী করে বলেননি যে, "তিনি ঐ ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে যিশুর অবশিষ্ট প্রকাশ্য জীবন সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে। কারণ গসপেলের বিবরণ থেকেই দেখা যায় যে একমাত্র জুডাস ইসকরিয়ট ছাড়া কোন কোন হাওয়ারিই যিশুর ধর্ম প্রচার করার সময় থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি।

মাত্র দশ বছর আগে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলে যে প্রাচীন মতবাদ সমর্থিত ও অনুমোদিত হয়েছিল আমরা এখন তা থেকে অনেক পথ এগিয়ে এসেছি। অবশ্য অনেক আধুনিক রচনায় সেই প্রাচীন মতবাদই এখনও প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও সত্য ধীরে ধীরে পথ করে নিচ্ছে।

তবে ঐ সত্যকে তুলে ধরা খুব সহজ কাজ নয়। কারণ প্রাচীন কাল থেকে যে মতবাদ জোরেশোরে রক্ষা ও সমর্থন করে রাখা হচ্ছে, তার বাধা খুব দুর্বল নয়। এ বাধা অতিক্রম করতে হলে একেবারে শিকড়ই কেটে দিতে হবে। অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম আবির্ভাবের আলামতগুলিই সকলের আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ইতিহাসের স্মারকঃ ইহুদী খৃষ্ট ধর্ম ও সাধুপল

অধিকাংশ খৃষ্টান বিশ্বাস করেন যে, যিশুর জীবনের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত ছিলেন, গসপেলগুলি তারাই লিখেছেন। সুতরাং এ রচনাগুলি হচ্ছে তাঁর জীবন ও

শিক্ষার প্রশ্নাতীত প্রমাণ। সন্দেহের কোন কারণই এতে নেই। সুতরাং **এ অবস্থায়**, অর্থাৎ আদি ও আসল হওয়ার এ নিশ্চয়তা পাওয়ার পর **যিশুর** শিক্ষা সম্পর্কে **আলো**চনার আর কোন সুযোগ থাকে না। তাছাড়া চার্চ যখন খোদ **যিশু**র দেয়া হুকুম-আহকাম জারি ও প্রয়োগ করার কাজে নিযুক্ত আছে, তখন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার বৈধতা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে না। ইদানীং গসপেলের যে সকল জনপ্রিয় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে, তাতে ভূমিকা বা ভাষ্যের নামে এ জাতীয় ধারণাই প্রচার করা হচ্ছে।

গসপেল লেখকগণ যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, এ কথাটি সর্বদা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্য দিয়ে ঐ দাবী সত্য বলে সাব্যস্ত করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কেউ মনে করেন না। তদুপরি দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগে সাধু জাসটিন গসপেলকে "হাওয়ারিদের স্মৃতিকথা" বলে অভিহিত করেন। ঐ হাওয়ারি লেখকদের সম্পর্কে এত বিস্তারিত তথ্য জোরেশারে প্রচার করা হয়ে থাকে যে, সে সম্পর্কে আদৌ কোন সন্দেহ প্রকাশ করাই মুস্কিল হয়ে পড়ে। মথি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, কাফারনাউমের কাস্টম অফিসার ছিলেন এবং আরমাইক ও গ্রীক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মার্ককে অতি সহজেই পিটারের সহকর্মী হিসেবে সনাক্ত করা যায় এবং স্পষ্টতই তিনিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। লুক হচ্ছেন একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক এবং পল তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত খবরই পাওয়া যায়। তারপর জন। তিনি গ্যালিলি সাগরের জেলে জেবেদির পুত্র এবং যিশুর সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে যে সকল গবেষণা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, এভাবে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তথ্য পেশ করা তখন আদৌ সম্ভব ছিল না। গসপেলের লেখকগণ যে আসলে কারা এবং কি ধরনের লোক ছিলেন, তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব। তবে একটি কথা প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, যিশুর ধর্মপ্রচার শুরু হওয়ার পরবর্তীকালের ঘটনাবলী যেভাবে ঘটেছে বলে বলা হয়েছে, আসলে তা সেভাবে ঘটেনি, পিটারের রোমে যাওয়ার ফলেই চার্চের ভিত্তিভূমিও রচিত হয়নি। পক্ষান্তরে যিশুর ইহলোক ত্যাগ করার পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত দুই উপদলের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল। একটি উপদল ছিল পলের খৃষ্টধর্মের পক্ষে এবং অপর উপদলটি ছিল ইহুদী-খৃষ্টধর্মের পক্ষে। কালক্রমে পলের খৃষ্টধর্মই জয়লাভ করে এবং ইহুদী খৃষ্টধর্ম বিলীন হয়ে যায়।

খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে কার্ডিনাল ডানিয়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে "এটুডস" (স্টাডিস) নামক একখানি ফরাসী পত্রিকায় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের নাম- "এ নিউ রিপ্রেজেন্টেশন অব দি অরিজিনস অব ক্রিশ্চিয়ানিটিঃ জুডিও ক্রিশ্চিয়ানিটি।" এ প্রবন্ধে তিনি ইতিহাস

পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, জনপ্রিয় পুস্তক পুস্তিকায় গসপেলের যে পটভূমি দেয়া হয়ে থাকে, প্রকৃত অবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ প্রসঙ্গে আমরা তার প্রবন্ধের প্রধান প্রধান কথাগুলি তুলে ধরছি।

যিশুর ইহলোক ত্যাগের পর হাওয়ারীদের ক্ষুদ্র দলটি একটি ইহুদী মযহাব গঠন করে এবং "মন্দিরে প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।" পরে প্রকৃতি পুজারীগণ ধর্মান্তরিত হলে তাদের প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতির কিছু অংশ যোগ করে তাদের জন্য "একটি বিশেষ পদ্ধতি" উদ্ভাবন করা হয়। তারপর ৪৯ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেম কাউন্সিলে তাদের খাতনা এবং অপর কয়েকটি ইহুদী প্রথা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু "বহু জুডিও ক্রিশ্চিয়ান (ইহুদী খৃষ্টান "এ অব্যাহতি মেনে নিতে অস্বীকার করে।" এ দলটি ছিল পলের দল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং প্রকৃতি পূজারী থেকে খৃষ্টান হওয়া লোকদের ব্যাপারে এ দুই দলের মধ্যে বিরোধ ছিল (৪৯ খৃষ্টাব্দে এন্টিওকের ঘটনা)। পলের বক্তব্য ছিল এই যে, এমন কি ইহুদীদের জন্যও খাতনা, সাব্বাথ এবং মন্দিরের উপাসনা বিধি অতিশয় প্রাচীনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ইহুদীধর্মের প্রতি এ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আনুগত্য থেকে মুক্ত করে খৃষ্টান ধর্মকে ভদ্র সমাজের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।"

ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যে যারা "অনুগত ইহুদী" ছিল তাদের কাছে পল ছিলেন একজন বিশ্বাসঘাতক। তাদের দলিলপত্রে তাঁকে "শত্রু" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তিনি "দ্বিমুখী নীতি" অনুসরণ করতেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে"। "৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চার্চের আওতার মধ্যে ইহুদী খৃষ্টানগণই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পল ছিলেন সম্পূর্ণরূপে একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।" নেতা ছিলেন যিশুর আত্মীয় জেমস, আর তার সঙ্গে ছিলেন পিটার (প্রথম দিকে) ও জন। "জেমস ছিলেন ইহুদী খৃষ্টান দলের মুখপাত্র এবং পলের খৃষ্টধর্মের মুকাবিলায় এ দল ইচ্ছাকৃতভাবেই ইহুদী ধর্মের প্রতি অনুগত থাকত।" জেরুসালেমের ইহুদী খৃষ্টান চার্চে যিশুর পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জেমসের পর নেতা হন "সাইমিয়ন, ক্লিওপাসের পুত্র এবং ক্লিওপাস ছিলেন যিশুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

যে সকল ইহুদী-খৃষ্টান রচনায় যিশুর সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, কার্ডিনাল ডানিয়েলো তা থেকে একাধিক উধৃতি দিয়েছেন। এ রচনাগুলি হচ্ছে হিব্রুদের গসপেল (মিসরের ইহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া), ক্লিমেন্ট রচিত হোমিলিজ এন্ড রিকগনিশন, হিপোটাইপোসিস, জেমসের দ্বিতীয় অ্যাপোক্যালিপস, এবং টমাসের গসপেল। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ সমুদয় রচনাই পরে অ্যাপোক্রিফা বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ পল বিজয়ী হওয়ার পর যে চার্চ কায়েম হয়, তার পক্ষ থেকে এগুলি গোপন করে ফেলা হয়। এবং পরে কাটছাঁট ও রদবদল করে মাত্র চারখানি ক্যানোনিক গসপেল বহাল রাখা হয়)। কার্ডিনাল ডানিয়েলো বলেছেন- "খৃষ্টধর্মের প্রাচীনতম

বইপত্র ইহুদী-খৃষ্টানদেরই রচনা।" তিনি বিস্তারিত ভাবে তার বর্ণনাও দিয়েছেন।

"চার্চের প্রথম একশো বছরে কেবলমাত্র জেরুসালেম ও ফিলিস্তিনেই নয়, বরং সর্বত্রই ইহুদী-খৃষ্টান ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল। পলের বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। পল তাঁর চিঠিপত্রে যে বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন তার কারণ এবং ব্যাখ্যা হচ্ছে এই।" গ্যালাশিয়া, করিনথ, কলোসা, রোম এবং অ্যান্টিওক, সর্বত্রই পলকে এ বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

গাজা থেকে অ্যান্টিওক পর্যন্ত সিরিয়া-ফিলিস্তিন উপকূল যে ইহুদী-খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবাধীন ছিল, "তাঁর উল্লেখ হাওয়ারিগণ ও ক্লিমেন্টের রচনাবলীতেই আছে।" এশিয়া মাইনরেও যে ঐ প্রভাব ছিল, তার আভাস গ্যালাশিয়ান ও কলোসিয়ানদের কাছে লেখা পলের চিঠিতেই পাওয়া যায়। ফ্রিজিয়ায় ঐ প্রভাব থাকার খবর পাওয়া যায় পাপিয়াসের রচনা থেকে। আর গ্রীসের, বিশেষত এপোলোস এলাকার খবর পাওয়া যায় পলের নিজেরই একখানি চিঠি থেকে। এ চিঠিখানি ছিল করিনথিয়ানদের কাছে লেখা তাঁর প্রথম চিঠি। ক্লিমেন্টের চিঠি এবং হারমাসের রাখালের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রোম ইহুদী-খৃষ্ট ধর্মের "একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র" ছিল। সুয়েটোনিয়াস ও ট্যাসিটাসে খৃষ্টান বলে বুঝানো হত ইহুদীদের একটি মযহাবকে। কার্ডিনাল ডানিয়েলো মনে করেন যে, আফ্রিকাতেও প্রথমে ইহুদী-খৃষ্ট ধর্মই প্রচারিত হয়েছিল। হিব্রু গসপেল এবং ক্লিমেন্টের রচনায় সে রকমই আভাস পাওয়া যায়।

যে পটভূমিকায় গসপেল, অর্থাৎ বাইবেল, অর্থাৎ নিউ টেস্টামেন্ট রচিত হয়েছিল, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ সম্পর্কে এ সকল তথ্য অবহিত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। মূল রচনা বহুবার রদবদল হওয়ার পর বাইবেলের যে ভাষ্য আমরা এখন দেখতে পাই, তার আবির্ভাব হয় ৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। তখন বিবাদমান সম্প্রদায় দুটি তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এবং ইহুদী-খৃষ্ট সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। তারপর ৭০ খৃষ্টাব্দে ইহুদী যুদ্ধ ও জেরুসালেমের পতনের পর খৃষ্টানগণ প্রবল হয়ে ওঠে। কার্ডিনাল ডানিয়েলো ঘটনাটি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- "ইহুদীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার পর খৃষ্টানগণ তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকার নীতি গ্রহণ করে। তারপর গ্রীক খৃষ্টানগণ প্রাধান্য লাভ করে, পল মরনোত্তর বিজয় লাভ করেন এবং ইহুদীধর্ম থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পৃথক হয়ে খৃষ্টান ধর্ম একটি তৃতীয় জাতিতে পরিণত হয়। তথাপি ১৪০ খৃষ্টাব্দের ইহুদী বিদ্রোহ পর্যন্ত ইহুদী-খৃষ্টধর্ম সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।"

মার্ক ম্যাথু লুক ও জনের গসপেলের আবির্ভাব ঘটে ৭০ থেকে ১১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তবে এগুলি খৃষ্টানদের প্রথম লিখিত ধর্মীয় বিধান ছিল না। কারণ পলের পত্রাবলী তার অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। ও কুলম্যান মনে করেন যে, পল সম্ভবত

৫০ খৃষ্টাব্দে থেসালোনিয়ানদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি সম্ভবত মার্কের গসপেল রচনা শেষ হওয়ার কয়েক বছর আগেই নিখোঁজ হয়ে যান।

খৃষ্টানধর্মে পলই হচ্ছেন সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি। যিশুর পরিবার পরিজন এবং জেরুসালেমে অবস্থানরত জেমসের সমর্থক হাওয়ারিগণ তাঁকে যিশুর চিন্তাধারার প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতেন। ধর্ম প্রচারের জন্য যিশু যাদের বাছাই করে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাদের বাদ দিয়েই পল খৃষ্টধর্ম উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি জীবনে কখনও যিশুকে দেখেননি, কিন্তু তথাপি তিনি এ কথা বলে তাঁর ধর্ম প্রচারের বৈধতা প্রমান করতে সক্ষম হন যে, একদা তিনি যখন দামেশক যাচ্ছিলেন, তখন যিশু পুনর্জীবিত হয়ে রাস্তায় তাঁকে দেখা দিয়েছেন। পল না থাকলে খৃষ্টধর্মের অবস্থা যে কি দাঁড়াত, এমন একটি প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই উত্থাপন করা যেতে পারে এবং এ প্রশ্নের জবাবে অনেক পরিস্থিতিই কল্পনা করা যেতে পারে। তবে গসপেল সম্পর্কে অন্তত এ কথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই বিবাদমান পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি না হত, তাহলে ঐ রচনা আদৌ সৃষ্টি হত না। দুই দলের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও সংঘর্ষের সময়ই ঐ রচনা সৃষ্টি হয়েছিল। ফাদার কানেনগিসার তাই গসপেলকে "যুদ্ধের রচনা" বলে অভিহিত করেছেন। ঐ সময় উভয় পক্ষ থেকে যিশু সম্পর্কে যে অসংখ্য রচনা সৃষ্টি হয়, তা থেকে বাছাই করেই একটি সংকলন প্রস্তুত করা হয়। ঐ সময় পলের খৃষ্টধর্ম বিজয় লাভ করে এবং তার ফলে তাকে কেন্দ্র করেই রচনাবলী গড়ে ওঠে। এ রচনাবলীই "ক্যানন" নামে অভিহিত এবং চার্চ কর্তৃক স্বীকৃত। অন্যান্য সকল রচনা তখনই অনির্ভরযোগ্য বলে নিন্দিত এবং বর্জিত হয়।

এভাবে ইহুদী-খৃষ্ট ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার কোন প্রভাবই এখন আর কোথাও নেই। তবে "জুডাস্টিক" বললে এখনও ঐ ধর্মের কথাই বুঝা যায়। কার্ডিনাল ডানিয়েলো এ বিলুপ্তির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "চার্চ সকল ইহুদী সংশ্রব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ইহুদী-খৃষ্টান ধর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পাশ্চাত্যে দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। প্রাচ্যে অবশ্য তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে বিশেষত ফিলিস্তিন, আরব, টানসজর্দানিয়া, সিরিয়া ও মেসোপোটোমিয়ায় ঐ ধর্মের ক্ষীণ অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যান্য সকল এলাকা মূল চার্চের সঙ্গে যোগ দেয়, যদিও তাদের সংস্কৃতিতে প্রবল সেমিটিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ইথিওপিয়া এবং কালদিয়ার চার্চে এ প্রভাব এখনও দেখতে পাওয়া যায়।"

চার গসপেলঃ উৎস ও ইতিহাস

খৃষ্ট ধর্মের প্রাথমিক যুগের কোন রচনায় গসপেলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পলের রচনা প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে। দ্বিতীয় শতাব্দীর

মধ্যভাগে, অর্থাৎ ১৪০ সালের পরে ধর্মীয় রচনাবলীর একটি সংকলন সম্পর্কে খবর পাওয়া যেতে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও বলা হয়ে থাকে- "দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকেই বহু খৃষ্টান লেখক জানিয়েছেন যে, তারা পলের অনেকগুলি চিঠি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।" ১৯৭২ সালে প্যারিসে প্রকাশিত "একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন অব দি বাইবেল- নিউ টেস্টামেন্ট নামক পুস্তকের ভূমিকায় এ মন্তব্য করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ পুস্তকখানি এক শতাধিক ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিশেষজ্ঞদের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল।

পরবর্তীকালে যে গসপেল ক্যানোনিক অর্থাৎ সরকারী ভাষ্য বলে গৃহীত হয়, তার রচনা দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে সমাপ্ত হলেও বহুদিন পর্যন্ত তা কারও জানা ছিল না। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঐ গসপেলে বর্ণিত কোন কোন কাহিনী অন্যত্র উধৃত হতে থাকে। তথাপি কাহিনীগুলি মূল গ্রন্থ থেকে উধৃত করা হত না লেখকগণ বাচনিক কিংবদন্তির স্মৃতি থেকে উধৃত করতেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

বাইবেলের ঐ অনুবাদের ভূমিকায় বলা হয়েছে- "১৪০ সালের আগে এমন কোন সংকলন সনাক্ত করা যেত।" ট্রাইকট তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদের ভূমিকায় যা বলেছেন (১৯৬০) এ মন্তব্য ঠিক তার বিপরীত। তিনি বলেছেন- "দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকেই লোকে 'গসপেল' শব্দটি ব্যবহার করত এবং গসপেল বলতে তখন সেই গ্রন্থই বুঝানো হত যে গ্রন্থকে ১৫০ সালের দিকে সেন্ট জাস্টিন 'দি মেমোরাইস অব দি এপোসলস' (হাওয়ারিদের নীতিকথা) বলে অভিহিত করেছেন।" দুর্ভাগ্যবশত এ ধরনের বক্তব্য ও মন্তব্য থেকেই গসপেলের সময় ও তারিখ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ভ্রান্ত ধারণা অবশ্য আরও আছে। গসপেল চারখানি শুরুতেই পূর্ণাঙ্গ আকারে ছিল বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তা আদৌ সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে যিশুর পর এক শতাব্দীরও অধিক কাল সময়ের মধ্যে গসপেল পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। একমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন গ্রন্থের মতে ১৭০ সালের দিকে গসপেলগুলি পূর্ণাঙ্গ হয় এবং সরকারী ভাষ্যের মর্যাদা লাভ করে।

সেন্ট জাস্টিন গসপেলের লেখকদের হাওয়ারি (সাহাবী) বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর এ অভিমত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, একটু পরেই আমরা দেখতে পাব যে, লেখকগণ কেউ হাওয়ারি ছিলেন না।

ট্রাইকট বলেছেন, মথি, মার্ক ও লুকের গসপেল ৭০ সালের আগেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র সম্ভবত মার্কের ক্ষেত্রে ছাড়া এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য বহু লেখকের মত তিনিও গসপেলের লেখকদের যিশুর সঙ্গী বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ কারণে তিনি গসপেল রচনার সম্ভাব্য সময় এমনভাবে নির্ণয় করেছেন, যাতে ঐ সময়

যিশুর জীবনকালের কাছাকাছি হতে পারে। জনের ব্যাপারে ট্রাইকট বলেছেন যে, তিনি ১০০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং খৃষ্টানগণ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে যিশুর নিকট সান্নিধ্যে উপস্থিত দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু তথাপি তাঁর নামে যে গসপেল প্রচলিত আছে, তা যে তাঁরই রচিত, এমন কথা প্রমাণ করা কঠিন। অন্যান্য অনেক ভাষ্যকারের মত ট্রাইকটও মনে করেন যে, জন (এবং মথি) যে সকল ঘটনা বর্ণনা করেছেন তিনি নিজেই সে সকল ঘটনার যোগ্যতম সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সমালোচক এ কথা মানেন না। এমন কি তারা তাঁকে চতুর্থ গসপেলের লেখক বলেও স্বীকার করেন না। কিন্তু গসপেল চারখানিকে যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে যিশুর সাহাবীদের "স্মৃতিকথা" বলে গ্রহণ না করা যায়, তাহলে ঐ গ্রন্থগুলি এল কোথা থেকে?

"দি নিউ টেস্টামেন্ট" (প্রকাশক-প্রেসেস ইউনিভার্সিটেয়ারেস দ্য ফ্রান্স, প্যারিস, ১৯৬৭) নামক গ্রন্থে লেখক ও কুলম্যান বলেছেন- "প্রাচীন খৃষ্টান সম্প্রদায় মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী লিখে ফেলেছিল এবং ইভানজেলিস্টগণ তাদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেছেন মাত্র। তিরিশ চল্লিশ বছর যাবত গসপেল কেবলমাত্র মানুষের মুখে মুখেই ছিল। প্রাচীন খৃষ্টানগণ বিভিন্নভাবে বাণী বা বর্ণনার আকারে তা প্রচার করেছেন মাত্র। তাদের কাছ থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে ইভানজেলিস্টগণ নিজ নিজ বিশ্বাস ও ইচ্ছা মোতাবেক কাহিনী সাজিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ ও বাণীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন এবং অসঙ্গতির স্থলে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করেছেন। 'তারপর' 'যখন তিনি' 'প্রভৃতি' এ ধরনের কথা বসিয়ে দিয়ে তাঁরা যিশুর দুটি কথার মধ্যে সম্পর্ক বিধান এবং ঘটনার ক্রমিকতা ও ধারবাহিকতা দেখিয়েছেন। অর্থাৎ মার্ক, মথি ও লুকের গসপেল (এ তিনখানি সিনোপটিক গসপেল নামে পরিচিত) ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত নয় এবং কাঠামোগত দিক থেকে এগুলি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা মাত্র।"

তিনি আরও বলেছেন- "এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, যিশুর জীবন ও তৎপরতা সম্পর্কে মুখে মুখে চলে আসা কাহিনীগুলি যখন প্রথমবারের মত লিখে ফেলা হয়, তখন জীবনী লেখার প্রয়োজনীয়তার চেয়ে ধর্মপ্রচার, উপাসনা এবং শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথাই লেখকদের মনে বেশী জাগরুক ছিল এবং সকল বিবরণ তাঁরা সেভাবেই লিখেছিলেন। যে বিশ্বাস তাঁরা প্রচার করছিলেন, তার পোষকতায় যিশুর জীবন থেকে নজির উধৃত করেছিলেন। আসলে তাঁদের নিজস্ব উপদেশই ছিল আসল কথা। যিশুর জীবনের নজির তাঁরা এনেছেন সহায়ক বিষয়বস্তু হিসেবে। যিশুর বাণীও তাঁরা কখনও কখনও উধৃত করেছেন বটে, কিন্তু তাও ঐ একই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ জীবনী লেখা নয়, ইতিহাস রচনা করা নয়, ধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য।"

একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন অব দি বাইবেলের ভাষ্যকারগণও গসপেল রচনার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে ঠিক এ কথাই বলেছেন। "মুখে মুখে চলে আসা কাহিনীর

সঙ্গে যিশুর শিষ্যদের বক্তৃতা মিশ্রিত হয়েছে এবং এ মিশ্রিত বিষয়বস্তুই গসপেলে লিখিত হয়েছে এবং গসপেল যেহেতু বিভিন্ন লেখক লিখেছেন, সেহেতু স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন ভিন্ন রচনায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে এবং এক একজনের রচনায় এক এক ধরনের কিংবদন্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।"

নিউ টেস্টামেন্টের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট, এ উভয় শ্রেণীর একশতেরও বেশী সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমবেতভাবে এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল বাইবেল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা ঐ অভিমতের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইতিপূর্বে ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা ভ্যাটিকান কাউন্সিলের ঐ দলিলের কথা একবার উল্লেখ করেছি। ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পর্কে কাউন্সিল বলেছেন যে, ঐ গ্রন্থে "এমন বিষয়বস্তু আছে যা অসম্পূর্ণ এবং অপ্রচলিত।" কিন্তু গসপেল সম্পর্কে তাঁরা এমন কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। পক্ষান্তরে তাঁরা বলেছেন- "কারও পক্ষেই এ সত্য উপেক্ষা করা সম্ভব নয় যে, নিউ টেস্টামেন্ট সহ সকল ধর্মীয় রচনার মধ্যে গসপেলের স্থানই সকলের উর্ধে। কারণ গসপেল আমাদের ত্রাণকর্তার জীবন ও শিক্ষার বিশিষ্ট সাক্ষীদের প্রতিনিধিত্ব করে। চার্চ সর্বদা সকল ক্ষেত্রেই বলে এসেছে এবং এখনও বলছে যে, চারখানি গসপেলই যিশুর সঙ্গীদের কাছ থেকে এসেছে। খোদ যিশুর নির্দেশে তাঁরা যা প্রচার করতেন, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় তাঁরা ঠিক তাই লিখে গিয়েছেন এবং তাঁদের সে রচনাই হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। আর সেই রচনা হচ্ছে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত সুসমাচার। আমাদের হোলি মাদার (পবিত্র মাতা) চার্চ বিনা দ্বিধায় ঐ চার গসপেল অনুমোদন করেন এবং পূর্বের ন্যায় এখনও ঘোষণা করেন যে, ঐগুলি ঐতিহাসিক দিক থেকে খাঁটি এবং মানবের চিরন্তন মোক্ষলাভের জন্য ঈশ্বরের পুত্র যিশুর স্বর্গারোহনের পূর্ব পর্যন্ত যা করেছিলেন এবং যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ গ্রন্থগুলিতে বিধৃত আছে। আমরা যাতে যিশুর জীবন সম্পর্কে সর্বদা সত্য ও অকপট তথ্য লাভ করতে পারি, পবিত্র লেখকগণ গসপেলগুলি ঠিক সেভাবেই লিখে গিয়েছেন।"

এ বক্তব্যে কোন দ্বিধা নেই, কোন সন্দেহ নেই। গসপেলে যিশুর জীবন, কর্ম ও শিক্ষা সঠিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে, এ কথাই এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উপরে আমরা যে সকল লেখকের বক্তব্য উধৃত করেছি, তাদের অভিমতের সঙ্গে ভ্যাটিকান কাউন্সিলের সরকারী অভিমতের কোনই সামঞ্জস্য নেই। বিশেষত ফাদার কানেনগিজার যা বলেছেন এ প্রসঙ্গে তা আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, গসপেলের কথা "আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়, ঐগুলি কোন বিশেষ উপলক্ষ সামনে রেখে রচিত" এবং "যুদ্ধকালীন রচনা মাত্র"। আর গসপেলের লেখকগণ "যিশু সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিংবদন্তিগুলি লিখে

গিয়েছেন মাত্র।"

"একমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন অব দি বাইবেল" পুস্তকে লিখিত মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। গসপেলের রচনা বিভিন্ন মহলের উপযোগী, চার্চের চাহিদা পুরনের উপযোগী এবং ধর্মপুস্তকের কোন কোন বক্তব্য ব্যাখ্যার উপযোগী করে রচিত হয়েছে। কোন ক্ষেত্রে ভুল সংশোধন এবং কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে। ইভানজেলিস্ট লেখকগণ মুখে মুখে চলে আসা কাহিনী থেকে নিজের নিজের পছন্দসই বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে ঐগুলি রচনা করেছেন।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমরা দুটি পরস্পর বিরোধী অভিমতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। একদিকে আছে ভ্যাটিকান কাউন্সিলের অভিমত, আর অপরদিকে রয়েছে বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিক অভিমত। কাউন্সিল বলছেন যে, গসপেলে যিশুর কর্ম ও বাণীর সঠিক বিবরণ আছে। কিন্তু ঐ গসপেলেই যে স্ববিরোধিতা, অসম্ভাব্যতা, প্রাকৃতিক অবাস্তবতা এবং প্রমাণিত সত্যের বিপরীত কথা আছে, তার সঙ্গে ঐ বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধান করা আদৌ সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, কিংবদন্তি থেকে বিষয়বস্তু বাছাই করে নিয়ে লেখকগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক ঐ গসপেল রচনা করেছেন, কিংবা ঐগুলিকে যদি বিশেষ উপলক্ষে রচিত অথবা যুদ্ধকালীন রচনা বলে গণ্য করা হয়, তাহলে ঐ রচনায় যে সকল স্ববিরোধিতা বা অসম্ভাব্যতা দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ সহজেই বোধগম্য হতে পারে। আসলে গসপেল যে মানুষেরই রচনা এবং বর্ণিত পরিস্থিতিতেই রচিত হয়েছে ঐ ভুলগুলিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। লেখকগণ ধরে নেয়া যায় খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁরা কোন তথ্য বা বিবরণে ভুল আছে বলে সন্দেহ না করেই তা লিখে গিয়েছেন। ফলে তাঁদের বিবরণ সমসাময়িক সম্প্রদায়গত প্রতিযোগিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এবং তাদের বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য লেখকের বিবরণের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যিশুর জীবন-কাহিনী পেশ করেছেন।

ইতিহাসগত দিক থেকে গসপেল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের আধুনিক অভিমতই যে সঠিক, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। খোদ গসপেলের বিবরণেই এ কথার সমর্থন আছে।

ম্যাথুর গসপেল (মথি লিখিত সুসমাচার)

নিউ টেস্টামেন্টের প্রথমেই আছে ম্যাথুর গসপেল। অপর তিনখানি গসপেল আছে তার পরে। ম্যাথুর গসপেল আসলে ওল্ড টেস্টামেন্টেরই সম্প্রসারণ বিশেষ। সে হিসাবে

তার স্থান নির্ণয় যথার্থই হয়েছে। "একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন অব দি বাইবেল" পুস্তকের ভাষ্যকারগণ লক্ষ্য করেছেন যে, "যিশু ইজরায়েলের ইতিহাস পূর্ণ করেছেন", এ কথা প্রমাণ করার জন্যই এ গসপেল লেখা হয়। এ জন্য ম্যাথু ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে ঘন ঘন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সকল উধৃতিতে দেখানো হয়েছে যে, ইহুদীগণ যে ত্রাণকর্তার (মেসিয়া-মসিহ) অপেক্ষা করছিল, যিশু তার মতই আচরণ করেছিলেন।

এ গসপেল শুরু হয়েছে যিশুর নসবনামা দিয়ে। (এ নসবনামা যে লুকের বর্ণিত নসবনামার বিপরীত, তা আমরা পরে দেখাবো)। ম্যাথু যিশুর বংশধারা দাউদের মারফত ইব্রাহীম পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। মূল বিবরণে যে ভুল আছে, একটু পরেই তা আমরা উল্লেখ করব। অবশ্য অধিকাংশ ভাষ্যকার এ ভুল নিরবে উপেক্ষা করে থাকেন। তবুও ইব্রাহীম থেকে বংশধারা টেনে এনে রচনার মূল মেজাজ প্রথমেই সাব্যস্ত করে দেওয়াই ছিল ম্যাথুর স্পষ্ট উদ্দেশ্য। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ইহুদী বিধানের প্রতি যিশুর দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা সামনে তুলে ধরেছেন। ইহুদী বিধানের মূলনীতিগুলি (উপাসনা, উপবাস ও দান) এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

যিশু তাঁর শিক্ষা প্রধানত তাঁর নিজের লোকদেরই দেন। বারজন হাওয়ারির সঙ্গে তিনি এভাবে কথা বলেন- "তোমরা পর জাতিগণের পথে যাইওনা এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিওনা, বরং ইসরায়েল কুলের হারানো মেষগণের কাছে যাও।" (মথি ১০৪-৬)। (তৌরাত বা পেনটাটিউকই ছিল শমরীয়দের ধর্মীয় গ্রন্থ। তারা অধিকাংশ ইহুদী আচার-অনুষ্ঠান পালন করত এবং ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের আশা করত। কিন্তু তারা জেরুসালেমের ধর্মমন্দিরের পাল্টা একটি ধর্মমন্দির নির্মাণ করেছিল)। "আমি একমাত্র ইসরায়েল কুলের হারানো মেষগণের নিকটেই প্রেরিত হইয়াছি।" (মথি ১৫, ২৪)। কিন্তু তারপরই মথি তার গসপেলের শেষ ভাগে যিশুর প্রথম শিষ্যদের মিশন সকল জাতির প্রতি সম্প্রসারণ করেছেন। তিনি যিশুর মুখ দিয়ে এ হুকুম জারি করিয়েছেন, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর" (মথি ২৮, ১৯)। কিন্তু প্রথম লক্ষ্য অবশ্যই ইসরায়েল কুল। এ গসপেল সম্পর্কে ট্রাইকট বলেন- "গ্রীক আবরণের নিচে এ বইয়ের হাড় ও গোশত হইতেছে ইহুদী, আত্মাও তাই; সমগ্র বইয়ের মেজাজও ইহুদী এবং তার সুস্পষ্ট আলামতও ঐ বইয়েই আছে।"

একমাত্র এ সকল প্রমাণ ও মন্তব্যের ভিত্তিতেই বলা যেতে পারে যে, মথির গসপেল ইত্যাদি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কিংবদন্তির ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে। ও কুলম্যান বলেছেন, এ সম্প্রদায় "ইহুদী ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, কিন্তু একই সময়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের ধারাবাহিকতাও বজায় রাখার চেষ্টা করছিল। এ গসপেলের মূল বক্তব্য এবং সাধারণ মেজাজ থেকে এরূপ একটি ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টার আভাস পাওয়া যায়।"

তাছাড়া মূল পাঠে রাজনৈতিক বক্তব্যও দেখতে পাওয়া যায়। রোমানদের দখলে

থাকার কারণে ফিলিস্তিন স্বভাবতই স্বাধীন হতে চেয়েছিল এবং এ জন্য তারা আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। সকল জাতির মধ্যে তারা নিজেদের আল্লার মনোনীত জাতি বলে দাবী করায় তারা আশা করছিল যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান হিসাবে সরাসরি তাদের সাহায্য করতে পারেন। কেননা অতীতে তিনি বহুবারই এরূপ সাহায্য করেছেন।

এখন মথির পরিচয় নেয়া যাক। তিনি কেমন লোক ছিলেন? প্রথমেই সরাসরি বলে দেয়া ভাল যে, তাঁকে এখন আর যিশুর অন্যতম সাহাবী বলে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু তবুও ট্রাইকট তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদের (১৯৬০) ভাষ্যে তাঁকে সেভাবেই পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন- "যিশু যখন নিজের অন্যতম শিষ্য হওয়ার জন্য তাঁকে ডেকে নেন, তখন মথি ওরফে লেভি কাফারনাউমের শুল্ক ফাঁড়ি বা কাষ্টম হাউজে কাষ্টম অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন।" চার্চের ফাদার ওরিজেন, জেরোম ও এপিফেনিসও এ অভিমত পোষণ করেন। কিন্তু এ অভিমত এখন আর সঠিক বলে স্বীকার করা হয় না। কারণ একটি বিষয়ে আদৌ কোন দ্বিমত নেই যে মথি "গ্রীক ভাষীদের জন্য লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনি ইহুদী আচার অনুষ্ঠান এবং আরমাইক ভাষা জানতেন।"

একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারগণ সম্ভবত মনে করেন যে, এ গসপেলের উৎপত্তি এভাবে হয়েছে- "সাধারণত ধরে নেয়া হয়ে থাকে যে, এ গসপেল সিরিয়ায় সম্ভবত এনটিওকে বা ফিসিনিয়ায় লিখিত হয়। কারণ সেখানে বহু ইহুদীর বাস ছিল।" (উল্লেখযোগ্য যে মথি যে সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, সে ইহুদী-খৃষ্ট সম্প্রদায়ের অধিবাস আলেকজান্দ্রিয়াতেও হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হয়ে থাকে। অন্যান্য বহু ভাষ্যকারের মত কুলম্যানও এ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন) "জামিনায় ৮০ সালের সিনাগগ সমাবেশে যেমন ঘটেছিল, সিনাগগ ও ফরাসীদের গোঁড়া ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে সেরূপ একটি বিতর্কের আলামত আমরা দেখতে পেয়েছি।" এ পরিস্থিতিতে এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, প্রথম গসপেল ৮০-৯০ সাল সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছিল, কিম্বা তার কিছু আগেও রচিত হয়ে থাকতে পারে। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না, বলা সম্ভব নয়। আমরা যেহেতু লেখকদের আসল নাম জানিনা, সেহেতু খোদ গসপেলেই যে আভাস-ইঙ্গিত আছে, একমাত্র তাই হচ্ছে আমাদের সম্বল- যেমন পেশার পরিচয় থেকে আমাদের লেখককে চিনে নিতে হয়। আমরা জানতে পারি যে, তিনি ইহুদী রচনাবলী ও ঐতিহ্য বিষয়ে সুপন্ডিত। তিনি তাঁর জাতির ধর্মীয় নেতাদের জানেন ও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁদের কঠোরভাবে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারে এবং জনসাধারণের কাছে যিশুকে বোধগম্য করে তুলতে খুবই পারদর্শী। তদুপরি তিনি তাঁর শিক্ষা যাতে মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হয়, সে ব্যাপারে খুবই জোর দিয়ে থাকেন। এ বিবরণ থেকে এমন একজন মানুষের ছবি পাওয়া যায়, যিনি একজন শিক্ষিত ইহুদী কিন্তু পরে খৃষ্টান হয়েছেন; এমন একজন গৃহস্থ "যিনি আপন ভান্ডার হতে নতুন ও পুরাতন দ্রব্য বের করেন (মথি ১৩, ৫২)।" এ বিবরণ সে

কাস্টম অফিসারের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না; কিম্বা যে মথিকে মার্ক ও লুক লেভি নামে অভিহিত করেছেন এবং যিনি বারোজন হাওয়ারির একজন ছিলেন, তার সঙ্গেও খাপ খায় না।

মার্ক ও লুকের মত মথিও যে একই উৎস ও বিষয়বস্তু ব্যবহার করে তাঁর গসপেল লিখেছেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত। তবে তাঁর বর্ণনা যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটু পৃথক ধরনের, তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুলম্যান মনে করেন যে, মথি মার্কের গসপেল থেকে ব্যাপকভাবে বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন, যদিও মার্ক আদৌ যিশুর শিষ্য ছিলেন না।

মথি ওল্ড টেস্টামেন্টের মূল পাঠেও রদবদল করেছেন। তিনি তাঁর গসপেলের শুরুতে যিশুর যে নসবনামা দিয়েছেন, তার সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা তুলনা করার সময় আমরা এ রদবদল দেখতে পাব। তিনি তাঁর গ্রন্থে এমন বর্ণনা দিয়েছেন, যা "আক্ষরিক অর্থেই অবিশ্বাস্য।" যিশুর পুনরুত্থান প্রসঙ্গে প্রহরীদের ভূমিকার ব্যাপারে ফাদার কানেনগিসার এ বিশেষণই প্রয়োগ করেছেন। যিশুর কবরে সামরিক প্রহরী থাকার কাহিনীর অসম্ভাব্যতা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন- "এ পর জাতীয় প্রহরীগণ তাদের উর্ধতন কর্মকর্তাদের খবর না দিয়ে খবর দিয়েছে বড় বড় পুরোহিতদের আর সেই পুরোহিতেরা তাদের পয়সা দিয়েছেন মিথ্যে কথা বলার জন্য। তবে এজন্য মথির প্রতি তাচ্ছিল্যের হাসি না হাসাই ভাল, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর নিজের মত করে কিংবদন্তির তথ্য তাঁর বইতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে, তা 'জেসাস ক্রাইস্ট সুপারস্টার' নামক মার্কিন ফিল্মের জন্যই শোভন হয়েছে।"

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ মন্তব্য যিনি করেছেন, তিনি একজন বিশিষ্ট ধর্মবিদ এবং প্যারিসের ক্যাথলিক ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক।

মথি যিশুর মৃত্যুকালীন ঘটনাবলীর যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে তাঁর উর্বর কল্পনাশক্তির আর একটি নজির পাওয়া যায়।

"আর দেখ, মন্দিরের পর্দাখানি উপর হইতে নিচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।"

মথি বর্ণিত (২৭, ৫১-৫৩) এ ঘটনা অন্য কোন গসপেলে উল্লেখ করা হয়নি। পবিত্র লোকদের দেহ যে কিভাবে যিশুর মৃত্যুর সময় জীবন্ত হল (অন্যান্য গসপেল মতে এ ঘটনা ঘটে শাব্বাথের প্রাক্কালে), এবং তাঁর পুনরুত্থানের পরে কবর থেকে বেরিয়ে এল (অন্যান্য গসপেল মতে এ ঘটনা ঘটে শাব্বাথের পরদিন), তা বুঝতে পারা সত্যিই

কঠিন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবত মথির গসপেলেই দেখতে পাওয়া যায়। যে সকল কথা যিশুর নিজের উক্তি বলে গসপেল লেখকগণ দাবী করে থাকেন, তার মধ্যে মথির এ বিবরণটি ব্যাখ্যা করাই সবচেয়ে কঠিন। যোনার চিহ্ন সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি ১২ অধ্যায়ের ৩৮-৪০ শ্লোকে বলেছেন- "যিশু যখন লেখক ও ফরিশিদের সঙ্গে ছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, এ কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেয়া যাবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্য পুত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর গর্ভে থাকিতেন।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যিশু বলেছেন যে, তিনি তিন দিন তিন রাত মাটির নিচে থাকবেন। এ কারণে মথি (লুক ও মার্কের মতই) যিশুর মৃত্যু ও দাফনের সময় বলেছেন শাব্বাথের প্রাক্কালে। ফলে যিশুর কবরে থাকার মেয়াদ তিন দিন হয় বটে, কিন্তু তিন রাত হয় না; হয় আসলে দু রাত। অপর একটি স্থানেও (১৬, ১-৪) মথি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেখানে তিনি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের কথা বলেননি। লুকও মেয়াদ উল্লেখ করেননি (১১, ২৯-৩২)। পরে আমরা দেখতে পাব যে, মার্কের বর্ণনায় (৮,১১-১২) আছে, যিশু নাকি বলেছেন যে, ঐ কালের কোন চিহ্ন দেয়া হবে না।

গসপেলের ভাষ্যকারগণ হামেশা এ প্রসঙ্গটি উপেক্ষা করে থাকেন। তথাপি ফাদার রোজেট এ অসঙ্গাব্যতা উল্লেখ করে বলেছেন যে, যিশু মাত্র তিন দিন কবরে ছিলেন- একটি পুরো দিন এবং দুটি রাত। তিনি অবশ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, আসলে "ওটা হচ্ছে কথার একটি বিশেষ ধরন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত অর্থ হচ্ছে তিন দিন।" এরূপ একটি অর্থহীন যুক্তি যে ভাষ্যকারগণ প্রয়োগ করতে পারেন, তা সম্ভবত আশা করা যায় না। তাঁদের এ আচরণ সত্যিই দুঃখজনক। লেখকের অথবা নকলকারের ভুলের দরুণই এ অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, এ কথাও যদি তাঁরা বলতেন, তাহলে নৈতিক দিক থেকে তা অধিক সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য হত।

কিন্তু এ সকল অসঙ্গতি ও অসঙ্গাব্যতা ছাড়াও মথির গসপেলের একটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইহুদী-খৃষ্ট সম্প্রদায় মূল ইহুদী ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখছে, গ্রন্থের সর্বত্র এ ভাবধারা ও মেজাজই হচ্ছে সবচেয়ে প্রবল। ইহুদী-খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কের গসপেল (মার্ক লিখিত সুসমাচার)

চারখানি গসপেলের মধ্যে এ গসপেলখানিই সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে প্রাচীন।

কিন্তু এ গ্রন্থ কোন হাওয়ারির লেখা নয়। লেখক হয়ত বড়জোর কোন হাওয়ারির শিষ্য ছিলেন।

কুলম্যান বলেছেন যে, তিনি মার্ককে যিশুর শিষ্য বলে গণ্য করেন না। তবে এ গসপেল রচনার কৃতিত্ব মার্কের উপর আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে যারা সন্দেহ পোষণ করেন তাদের জন্য তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থ "কোন হাওয়ারির শিক্ষার ভিত্তিতে রচিত নয় বলে মথি ও লুক যদি জানতেন, তাহলে তাঁরা এ গ্রন্থের ব্যবহার যেভাবে করেছেন, তা করতেন না।" কিন্তু এ যুক্তিতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কুলম্যান তাঁর নিজের সন্দেহের সমর্থনে বলেছেন যে, তিনি নিউ টেস্টামেন্ট থেকে "জন ওরফে মার্ক" নামক এক ব্যক্তির উক্তি হামেশা উধৃত করে থাকেন। কিন্তু এ সকল উধৃতিতে কোন গসপেল লেখকের নাম উল্লেখ করা হয় না এবং মার্কের রচনার মূল পাঠেও কোন লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

এ বিষয়ে তথ্যের অভাব থাকার দরুণ ভাষ্যকারগণ এমন সব খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা স্পষ্টতই বাহুল্য বলে মনে হয়। মার্কের গসপেলে এরূপ একটি বিবরণ আছে- "আর, একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে চাদর জড়াইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল; তাহারা তাহাকে ধরিল, কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল।" (মার্ক ১৪, ৫১-৫২)। একমাত্র মার্কের গসপেলেই এ ঘটনার বিবরণ আছে বলে ভাষ্যকারগণ ধরে নিয়েছেন যে ঐ যুবক মার্কই হয়ে থাকবেন, সেই বিশ্বস্ত শিষ্য যিনি তাঁর গুরুকে অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন। (একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন)। অন্যান্য ভাষ্যকারের মতে এ ঘটনা হচ্ছে "ব্যক্তিগত স্মৃতি, সত্যতার প্রমাণ, বেনামী দস্তখত, এবং তিনি যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ।"

কুলম্যান মনে করেন যে, "লেখক ইহুদী বংশজাত ছিলেন বলে যে অনুমান করা হয়, বহু শব্দ ও বাক্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়।" কিন্তু রচনায় ব্যবহৃত ল্যাটিন শব্দ ও বাক্য থেকে সম্ভবত ধরে নেয়া যেতে পারে যে তিনি গসপেলখানি রোমে রচনা করেছিলেন। "যে সকল খৃষ্টান ফিলিস্তিনে বাস করে না, তিনি তাদের লক্ষ্য করে কথা বলেছেন এবং ব্যবহৃত আরমাইক শব্দগুলি সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

মার্ক রোমে পিটারের সঙ্গী ছিলেন বলে একটি ধারণা বহুদিন যাবত প্রচলিত আছে। পিটারের প্রথম চিঠির শেষ অনুচ্ছেদ হচ্ছে এ ধারণার ভিত্তি (অবশ্য ঐ চিঠি পিটারেরই লেখা বলে যদি ধরে নেয়া হয়)। পিটার লিখেছিলেন- "ব্যাবিলনে অবস্থিত সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায় একইভাবে মনোনীত, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আমার পুত্র মার্কও আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।" একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যে বলা হয়েছে- "ব্যাবিলন বলতে সম্ভবত রোমই বুঝানো হয়েছে।" এ অনুমান থেকে ভাষ্যকারগণ ধরে নিয়েছেন যে, মার্ক যেহেতু পিটারের সঙ্গে রোমে ছিলেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে, সেহেতু মার্কই লেখক হয়ে থাকবেন। অর্থাৎ অনুমানের ওপর অনুমান।

সেই যে ১৫০ সালে হিরাপোলিশের বিশপ পাপিরাস যে যুক্তিতে মার্ককে এ গসপেলের রচয়িতা বলে দাবী করেছিলেন, এবং তাঁকে "পিটারের দোভাষী" এবং সম্ভবত **"পলের** সহযোগী" বলে উল্লেখ করেছিলেন, এখানেও ঠিক সেই একই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ **করা** হয়েছে আর কি!

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মার্কের গসপেলের রচনাকাল দাঁড়ায় পিটারের মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন মতে ৬৫ ও ৭০ সালের মধ্যে এবং কুলম্যানের মতে ৭০ সালে।

মূল পাঠে কিন্তু একটি বড় গোলমাল পাওয়া যায়। রচনার কোথাও ঘটনার কোন ক্রমিকতা রক্ষা করা হয়নি। বিবরণের শুরুতেই (১, ১৬-২০) মার্ক সেই চারজন জেলের কথা বলেছিলেন, যারা যিশুর একটিমাত্র কথাতেই সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে তার সঙ্গী হয়েছিল। তারা যিশুকে চিনত না, কিন্তু যেইমাত্র তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মানুষ ধরার জেলে বানিয়ে দেব," অমনি তারা তার সঙ্গে চলে গেল। প্রত্যেক ঘটনারই যে একটি সম্ভাব্যতা আছে, মার্কের বোধহয় তা মনে হয়নি।

ফাদার রোজেটের মতে মার্ক হচ্ছেন একজন "বিশৃংখল লেখক", চারজনের মধ্যে "দুর্বলতম লেখক, সবচেয়ে কাঁচা লেখক"। একটি ঘটনার বিবরণ যে কিভাবে লিখতে হয়, তিনি তাও জানেন না। ফাদার রোজেট তাঁর এ মন্তব্যের পোষকতায় বারজন হাওয়ারি বাছাই করার বিবরণটি উধৃত করেছেন। বিবরণটি এই- "পরে তিনি পর্বতে উঠিয়া, আপনি যাহাদিগকে ইচ্ছা করিলেন, নিকটে ডাকিলেন; তাহাতে তাঁহারা তাঁহার কাছে আসিলেন। আর তিনি বারজনকে নিযুক্ত করিলেন, যেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও যেন তিনি তাঁহাদিগকে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং যেন তাঁহারা ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এভাবে তিনি বারজন নিযুক্ত করিলেন এবং সাইমনকে পিটার নাম দিলেন" (মার্ক ৩, ১৩-১৬)।

ফাদার রোজেট মনে করেন যে, এভাবে কখনও কোন সঙ্গী বাছাই করা আদৌ সম্ভব হইতে পারে না।

যোনার চিহ্নের ব্যাপারে মার্ক যে মথি ও লুকের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যিশুর ধর্ম প্রচারের সময় লোকদের চিহ্ন (নবুয়তের প্রমাণ) দেখানোর ব্যাপারে মার্ক এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি বলেছেন- "পরে ফরিশিরা বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষা করার জন্য তাঁহার নিকটে আকাশ হইতে একটি চিহ্ন দেখিতে চাহিল। তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এ কালের লোকেরা কেন চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি এ লোকদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আবার নৌকায় উঠিয়া অন্য পারে গেলেন।" (মার্ক ৮, ১১-১৩)।

অতিপ্রাকৃতিক বলে প্রতিয়মান হতে পারে এমন কোন কাজ না করার জন্য যিশুর যে সংকল্প ছিল, এখানে তার নিজের তরফ থেকেই তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। ফলে একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারগণ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কারণ লুক যেখানে বলেছেন যে যিশু একটিমাত্র চিহ্ন দেখাবেন (যোনার চিহ্ন; মথিও তাই বলেছেন), সেখানে মার্ক বলেছেন যে, কোন চিহ্নই দেখান হবে না। লুক অবশ্য আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, যিশু "চিহ্ন হিসেবে নিজেই কতিপয় অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা দেখালেন" (লুক ৭, ২২ ও ১১, ২০)।

মার্কের সমগ্র গসপেল চার্চ কর্তৃক আদি ও আসল বলে স্বীকৃত। কিন্তু তবুও আধুনিক ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে, শেষ অধ্যায়টি (১৬, ১৯-২০) পরে জুড়ে দেয়া হয়েছে। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারগণ তো এ ব্যাপারে খুবই মুখর।

কোডেক্স ভ্যাটিকানাস এবং কোডেক্স সিনাইটিকাস নামে গসপেলগুলির চতুর্থ শতাব্দীর আমলের যে পুর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি পাওয়া যায়, তার কোনটিতেই ঐ শেষ অধ্যায়টি নেই। কুলম্যান বলেছেন- "পরবর্তী কালে কতিপয় গ্রীক পান্ডুলিপি এবং অপর কয়েকটি সংস্করণে ঐ উপসংহার যোগ করা হয়েছে, এবং তার বিষয়বস্তু নেয়া হয়েছে অন্যান্য গসপেল থেকে।" আসলে এ সংযোজিত উপসংহারের কয়েকটি পাঠ দেখতে পাওয়া যায়। দীর্ঘ পাঠও আছে, আবার সংক্ষিপ্ত পাঠও আছে, এবং ১৯৫২ সালে প্রকাশিত বাইবেলের রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড (সংশোধিত মান) সংস্করণে এ **উভয় প্রকার** পাঠই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোন কোন দীর্ঘ পাঠে আবার কিছু কিছু অতিরিক্ত বিষয়বস্তুও দেখতে পাওয়া যায়।

ফাদার কানেনগিসার এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন- "যে সম্প্রদায়ের লোকেরা মার্কের গসপেলের আসল হওয়ার সনদ দিয়েছে, সরকারীভাবে ঐ গ্রন্থ তাদের হাতে পড়ার সময়ই ঐ শেষের শ্লোকগুলি বাদ দেয়া হয়েছে। মথি, লুক বা জন শ্লোকগুলি দেখেননি। কিন্তু কিছু যেন নেই অথচ থাকা উচিত, শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়া উচিত সকলেই তা অনুভব করেছিলেন। বহু দিন পরে মথি, লুক ও জনের একই ধরনের রচনা যখন সর্বত্র প্রচলিত ছিল, তখন মার্কের গসপেলের জন্য একটি উপযুক্ত শেষ অধ্যায় রচনা করা হয় এবং এজন্য অন্যান্য গসপেল থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু মূলের সঙ্গে এ সংযোজনের যে মিল হয়নি, তা মার্কের গসপেলের ১৬ অধ্যায়ের ৯ থেকে ২০ শ্লোক পর্যন্ত পড়লে সহজেই ধরা যায়। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত গসপেলের রচনাবলীতে যে কতখানি স্বাধীনতার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, এ ঘটনা থেকে তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।"

মানুষ যে ধর্ম পুস্তকে রদবদল করেছে, এখানে একজন বিখ্যাত ধর্মবিদের কাছ থেকেই তার অকপট স্বীকারোক্তি পাওয়া যাচ্ছে।

লুকের গসপেল (লুক লিখিত সুসমাচার)

কুলম্যানের মতে লুক হচ্ছেন একজন "পুরাবৃত্ত রচয়িতা", আর ফাদার কানেনগিসার মনে করেন যে, তিনি একজন "প্রকৃত ঔপন্যাসিক।" থিওপিলিয়াসকে লেখা পূর্বকথায় লুক বলেছেন যে, যিশু সম্পর্কে পূর্বে যারা বিবরণ লিখেছেন, তাদের অনুসরণে একই বিষয়ে তিনি নিজেও একটি বিবরণ লিখতে যাচ্ছেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি হাওয়ারিদের প্রচারিত তথ্য সহ চাক্ষুস সাক্ষীদের তথ্য ও বর্ণনা ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ তিনি নিজে একজন চাক্ষুস সাক্ষী নন। সুতরাং বিবরণটি সুপরিকল্পিত এবং সাজানো-গুছানো হবে বলে আশা করা যায়। এ বিবরণের ভূমিকা তিনি এভাবে লিখেছেনঃ

"আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসে যে সকল ঘটনা ঘটেছে এবং তার যে সকল তথ্য ও বর্ণনা চাক্ষুস সাক্ষী ও প্রচারকদের মারফত আমাদের কাছে এসেছে, অনেকেই তা সংগ্রহ করে একত্রিত করার কাজে হাত দিয়েছেন। আমি ঐ সকল বিষয়ে আগাগোড়া অবহিত হয়েছি বলে মনে করি যে, আমি যদি আপনার জন্য নিজেই ধারাবাহিকতা সহকারে এবং সুশৃংখলভাবে ঐ বিবরণ লিখি, তাহলে ভালই হবে এবং আপনাকে যে সকল বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, তার সত্য বিবরণ আপনি জানতে পারবেন।"

এ ভূমিকার প্রথম বাক্য থেকেই মার্কের সঙ্গে লুকের পার্থক্য ধরা যায়। লুকের গসপেল ধ্রুপদি গ্রীক ভাষায় লিখিত একটি উত্তম সাহিত্যকর্ম এবং অমার্জিত বিষয়বস্তু থেকে মুক্ত।

লুক একজন অভিজাত বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসেবে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইহুদীদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। কুলম্যান দেখিয়েছেন যে, লুক মার্কের ইহুদী বিষয়ক অধিকাংশ অনুচ্ছেদই বাদ দিয়েছেন, যিশুর প্রতি ইহুদীদের অবিশ্বাস বড় করে দেখিয়েছেন এবং যে সমরীয়দের যিশু অপছন্দ করতেন, তাদের সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল বলে দেখিয়েছেন। পক্ষান্তরে মথি বলেছেন যে, যিশু হাওয়ারীদের সর্বদা সমরীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলতেন। গসপেল লেখকগণ যে তাঁদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত মনোভাব অনুসারে যিশুর মুখে কথা তুলে দিয়েছেন, তার অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে এ হচ্ছে একটি। তারা হয়ত সরল বিশ্বাসেই এ কাজ করেছেন। গসপেলগুলি যে 'যুদ্ধকালীন রচনা' অথবা 'কোন বিশেষ উপলক্ষে রচিত', এ প্রমাণের পর তা কি আর অস্বীকার করার উপায় আছে? লুক ও মথির গসপেলের মেজাজ ও আওয়াজ তুলনা করা হলে ঐ বক্তব্য আরও বেশী পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু লুক আসলে কে ছিলেন? পল তাঁর কয়েকখানি চিঠিতে ঐ একই নামের যে চিকিৎসকের কথা বলেছেন, তিনি এবং গসপেল লেখক লুক একই ব্যক্তি বলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারগণ মনে করেন-

"যে নিখুঁত ও নির্দিষ্ট ভাষায় তিনি পীড়িত ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে গসপেল লেখকের চিকিৎসকের পেশা সাব্যস্ত হয়ে যায় বলে কয়েকজন ভাষ্যকার মনে করেন।" এ মন্তব্য অতিকথন এবং বাহুল্যপূর্ণ। লুক আসলে ঐরূপ কোন "বর্ণনা" দেননি। "যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন, তা তৎকালীন সমাজের বিদগ্ধজনের ভাষা।" লুক নামে পলের একজন সফর সঙ্গী ছিলেন, কিন্তু তিনিই কি সেই ব্যক্তি? কুলম্যান তাই মনে করেন।

লুকের গসপেলের সময়কাল কয়েকটি ঘটনার ভিত্তিতে অনুমান করা যায়- লুক মার্ক ও মথির গসপেলের সহায়তা নিয়েছেন। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের বর্ণনা থেকে মনে হয় তিনি সম্ভবত ৭০ সালে টিটাসের সেনাবাহিনী কর্তৃক জেরুসালেমের অবরোধ ও ধ্বংস দেখেছিলেন। তিনি সম্ভবত এ সময়ের পরে তাঁর গসপেল লেখেন। আধুনিক সমালোচকগণ সময়টি ৮০-৯০ সাল বলে মনে করেন। কয়েকজন অবশ্য আরও আগে লেখা হয়েছে বলে উল্লেখ করে থাকেন।

লুকের বিভিন্ন বর্ণনা তাঁর পূর্ববর্তীদের বর্ণনার সঙ্গে আদৌ মেলে না। এ বিষয়ে আগেই মোটামুটি একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ১৮১ থেকে শুরু করে পর পর কয়েক পৃষ্ঠায় এ অমিলের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আর কুলম্যান তাঁর 'নিউ টেস্টামেন্ট' নামক কিতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় লুকের গসপেল থেকে এমন কয়েকটি বিবরণ উধৃত করেছেন, যা অন্য কোন গসপেলে পাওয়া যায় না এবং এগুলি তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে নয়।

যিশুর শৈশবকালের বর্ণনা গসপেলের একটি বিশিষ্ট বিষয়। মথি বিষয়টি লুকের তুলনায় ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মার্ক যিশুর শৈশবকালের উল্লেখমাত্রও করেননি।

মথি ও লুক, এ দুজন যিশুর দু রকমের নসবনামা দিয়েছেন। যুক্তি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুখানি নসবনামার পার্থক্য ও অসঙ্গাব্যতা এত বেশী যে, এ বইয়ের একটি পৃথক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মথি ইহুদীদের লক্ষ্য করে লেখার কারণে কেন যে ইব্রাহীম থেকে নসবনামা শুরু করেছেন এবং কেন যে তিনি দাউদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তা সহজেই বুঝা যায় এবং অনুরূপভাবে লুক একজন অভিজাত বিদগ্ধজন হিসাবে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কারণে কেন যে তাঁর নসবনামা আরও আগে থেকে শুরু করেছেন, তাও সহজেই বোধগম্য। দাউদের পর থেকে এ নসবনামা যে পরস্পর বিরোধী, তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব।

মথি, মার্ক ও লুক যিশুর শিক্ষা ও প্রচারের অনেকগুলি পর্যায়ের বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। খৃষ্টধর্মের এমন গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা, সেই ইউকারিস্ট (নিস্তারপর্বের ভোজ- যিশুর সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের সর্বশেষ রুটি-মদ্য ভোজন) সম্পর্কেও লুকের বর্ণনা মথি ও মার্কের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। (জনের বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয়,

কারণ নিস্তার পর্বের ভোজের সময় ধর্মীয় রীতি হিসাবে ইউকারিস্ট চালু হয়েছে বলে তিনি কোন উল্লেখই করেননি)। ফাদার রোজেট তাঁর ইনিশিয়েশন টু দি গসপেল নামক পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, ইউকারিস্ট অনুষ্ঠান প্রচলনের বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন (২২, ১৯-২৪), তা মথি (২৬, ২৬-২৯) ও মার্কের (১৪, ২২-২৪) ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ মথি ও মার্কের ভাষা প্রায় একই রকমের। "পক্ষান্তরে লুকের শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট প্রায় সাধু পলের মত (করিনথিয়ানদের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রথম পত্র ১১, ২৩-২৫)।

আমরা আগেই দেখেছি যে, যিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে লুক তাঁর গসপেলে যা বলেছেন, এক্টস অব দি এপোসলস (হাওয়ারিদের কার্যক্রম) কিভাবে ঠিক তার বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি এ গ্রন্থের লেখক হিসেবে পরিচিত এবং স্বীকৃত; এবং গ্রন্থখানি নিউ টেস্টামেন্টের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গসপেলে তিনি পুনরুত্থানের ঘটনা ইস্টারের দিন ঘটেছিল বলেছেন, কিন্তু এক্টস গ্রন্থে বলেছেন, তার চল্লিশ দিন পরে ঘটেছিল। এ স্ববিরোধিতার কারণে খৃষ্টান বিশেষজ্ঞদের যে কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে হয়েছে, তা আমরা আগেই দেখেছি।

একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারদের মত যাঁরা বস্তুনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন, তাঁরা নিরুপায় হয়ে স্বীকার করেছেন যে, নীতিগতভাবে "বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে নির্ভুল রচনা করা লুকের মূল লক্ষ্য ছিল না।" যিশুর কবর থেকে উত্থান সম্পর্কে এক্টস গ্রন্থে লুকের বিবরণের সঙ্গে পলের বিবরণের তুলনা করতে গিয়ে ফাদার কানেনগিসার বলেছেন- "চারজন ইভানজেলিস্টের মধ্যে লুকই সবচেয়ে বেশী অনুভূতিপ্রবণ এবং সাহিত্যধর্মী। এবং তাঁর মধ্যে একজন প্রকৃত ঔপন্যাসিকের সকল গুণই বিদ্যমান।"

জনের গসপেল (জোহান লিখিত সুসমাচার)

জনের গসপেল অপর তিনখানি গসপেল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ পার্থক্য এমনই প্রবল ও প্রকট যে, ফাদার রোজেট তাঁর ইনিশিয়েশন টু দি গসপেল গ্রন্থে অপর তিনখানি গসপেল সম্পর্কে মন্তব্য করার পর জনের গসপেল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা পাঠকের মনে একটি তাৎক্ষণিক চমক সৃষ্টি করে। তিনি বলেন- "এ এক পৃথক জগত।" সত্যিই তাই। বিষয়বস্তু বাছাই, সাজানোর ধরন, বর্ণনা ও কথোপকথনের ভঙ্গিতে এ গ্রন্থ বিশিষ্ট। রচনাশৈলী, ভৌগলিকতা এবং ঘটনার ক্রমিকতাও বিশিষ্ট। এবং কুলম্যানের মতে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও পৃথক ও বিশিষ্ট। অন্যদের তুলনায় জন যিশুর উক্তি পৃথকভাবে লিখেছেন। ফাদার রোজেট খেয়াল করে দেখেছেন যে, অন্যান্য গসপেলে যিশুর উক্তিগুলি "মৌখিক কথাবার্তার মত, জীবন্ত ও বাস্তব মনে হয়," কিন্তু জনের গসপেলে পুরোটাই কেমন যে ধ্যানের ভাষা এবং এ মেজাজ এতই

গেল যে, মাঝে মাঝে "মনে হয়, এগুলি কি যিশুরই উক্তি! নাকি জন তাঁর নিজের অজান্তে নিজের চিন্তা-চেতনা দিয়ে যিশুর ধারণায় সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন!"

কিন্তু জনের পরিচয় কি? তিনি কে ছিলেন? এ প্রশ্নের জবাব খুবই বিতর্কিত। এ ব্যাপারে নানা জনে নানা কথা বলেছেন। ফাদার রোজেট ও এট্রাইকট এ ব্যাপারে এমন একটি শিবিরের অনুসারী, যাঁরা জনের পরিচয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। তাঁরা বলেন, জনের গসপেল একজন চাক্ষুস সাক্ষীর রচনা, জন ছিলেন জেবেদির ছেলে এবং জেমসের ভাই। তাঁর সম্পর্কে অনেক খবরই সুবিধিত এবং অনেক বহুল প্রচারিত বইপত্রে তা ছাপাও হয়েছে। প্রতিকৃতি বিশারদদের মতে প্রায় সকল প্রতিকৃতিতেই জনকে যিশুর পাশে দেখা যায়, যেমন লাস্ট সাপারের (শেষ ভোজ) সময়। হাওয়ারি জন এমন একজন সুপরিচিত ব্যক্তি যে, গসপেলখানি তার লেখা নয়, এমন কথা বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না।

ঐ চতুর্থ গসপেল অত দেরিতে লেখা হলেও ঐ বিলম্ব বোধহয় জনের বিরুদ্ধে তেমন কোন মারাত্মক যুক্তি হিসেবে দাড় করানো যায় না। এ গ্রন্থ যিশুর তিরোধানের পর প্রথম শতাব্দীর সম্ভবত শেষভাগে রচিত হয়েছিল। রচনার সময় যদি যিশুর তিরোধানের ষাট বছর পরে বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে যিশুর আমলে জন যে যুবক বয়সের ছিলেন এবং তিনি যে একশো বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এ ঘটনার সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতি পূর্ণ হয়।

ফাদার কানেনগিসার তাঁর যিশুর কবর থেকে উত্থান সম্পর্কিত গবেষণায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, একমাত্র পল ছাড়া নিউ টেস্টামেন্ট লেখকদের মধ্যে অন্য কেউ ঐ ঘটনা নিজ চোখে দেখেছেন বলে দাবী করতে পারেন না। তবুও জন দেখা যায় বলছেন যে, যিশু প্রথমবার টমাস ছাড়া কয়েকজন (সম্ভবত জন সহ) হাওয়ারির সমাবেশে দেখা দেন (২০, ১৯-২৪) এবং আট দিন পরে দ্বিতীয় বার একত্রে সকল হাওয়ারিকে দেখে দেন (২০, ২৫-২৯)।

কিন্তু ও কুলম্যান তাঁর দি নিউ টেস্টামেন্ট নামক গ্রন্থে এ ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি।

একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ গসপেল জনের লেখা বলে মেনে নিতে অধিকাংশ ভাষ্যকার রাজি নন। অবশ্য এ (জনের লেখা না হওয়ার) সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ সকল আলামত থেকে এ কথাই মনে হয় যে, ঐ গসপেলের যে এবারত আজ আমরা দেখতে পাই, তা সম্ভবত কয়েকজন লেখকের রচনা। ঐ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে- "যে আকারে ঐ গসপেল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা সম্ভবত লেখকের শিষ্যগণ প্রচার করেছিলেন এবং তাঁরা ২১ অধ্যায়, এবং খুব সম্ভবত কতিপয় টিকা (৪,২ ও ৪,১; ৪,৪৪; ৭,৩৭ ঘ; ১১,২;১৯,৩৫) নিজেরাই যোগ করে দিয়েছিলেন। ভ্রষ্টা রমণীর কাহিনীর (৮,২-১১) ব্যাপারে সকলেই

একমত যে, এ ঘটনাটির উৎস অজ্ঞাত এবং কাহিনীটি পরে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চার্চ কর্তৃপক্ষ এ কাহিনীকে মূল গ্রন্থের অঙ্গ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।" কুলম্যান মনে করেন যে, "১৯, ৩৫ শ্লোকটি চাক্ষুস সাক্ষীর দস্তখত" হিসেবে কিতাবে এসেছে। সমগ্র গসপেলের মধ্যে এ একটিমাত্র সুস্পষ্ট দস্তখত আছে, যদিও ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে, এটা পরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

কুলম্যান মনে করেন যে, পরে যোগ করার ব্যাপারটি এ গসপেলের ক্ষেত্রে খুবই পরিষ্কার, যেমন ২১ অধ্যায়। এ অধ্যায়টি সম্ভবত "কোন শিষ্যের রচনা এবং তিনি মূল এবারতেও ছোটখাট রদবদল করে থাকতে পারেন।"

এ গসপেলের রচয়িতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ যে সকল অনুমান করে থাকেন, এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এ বিষয়ে যে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা রয়েছে, উপরে উধৃত বিশিষ্ট খৃষ্টান লেখকদের মন্তব্য থেকেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

জনের বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। অপর তিনটি গসপেলের বর্ণনার সঙ্গে এ কাহিনীগুলির পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। কুলম্যান এ পার্থক্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি অপর তিনজন ইভানজেলিস্টের মুকাবিলায় জনের মধ্যে একটি পৃথক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পেয়েছেন এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই জন "কাহিনী, শব্দ, এবং বর্ণনার ভঙ্গি বাছাই করেছেন। ফলে তাঁর বর্ণনা দীর্ঘ হয়েছে এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে যিশুর মুখ দিয়ে তাই বলিয়েছেন যা খোদ পবিত্রাত্মা তাঁকে জানিয়েছিলেন।" এ কারণেই তার বর্ণনায় ভিন্নতা এসেছে।

অনুমান করা যেতে পারে যে, জন তাঁর গসপেল সকলের শেষে লিখেছেন বলে নিজেদের চিন্তাধারার পোষকতার জন্য সহায়ক কাহিনীগুলিই বেছে নিয়েছেন। অন্যান্য গসপেলের কোন কোন বর্ণনা জনের গসপেলে না থাকার জন্য বিস্মিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন গ্রন্থের ২৮২ পৃষ্ঠায় এরূপ বর্ণনার কয়েকটি নজীর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনার আদৌ কোন উল্লেখ না থাকা অস্বাভাবিক মনে হয়। যেমন ইউকারিস্ট অনুষ্ঠান চালু করার বিষয়টি আদৌ বর্ণনা করা হয়নি। অথচ এ অনুষ্ঠানটি খৃষ্টধর্মের একটি মৌলিক ব্যাপার এবং ধর্মীয় সমাবেশের ভিত্তি স্বরূপ। জনের মত একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, যিনি ধ্যানের উপর এত জোর দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এ ঘটনাটি উল্লেখ না করা অচিন্তনীয় ব্যাপার। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর লাস্ট সাপারের বর্ণনা, শিষ্যদের পা ধোয়ানো, জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার ভবিষ্যদ্বাণী এবং পিটারের অস্বীকৃতির বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

পক্ষান্তরে জনের গসপেলে এমন অনেক কাহিনী আছে, যা অপর তিনখানি গসপেলে নেই। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন গ্রন্থের ২৮৩ পৃষ্ঠায় এগুলির উল্লেখ আছে।

এক্ষেত্রে সম্ভবত অনুমান করা যেতে পারে যে, অন্যরা কাহিনীগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি, কিন্তু জন করেছেন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, জনের বর্ণনায় (২১, ১-১৪) দেখা যায় যিশু কবর থেকে উঠে এসে টাইবেরিয়াস সাগরের তীরে শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। এ ঘটনাটি লুকের অলৌকিকভাবে মাছ ধরার ঘটনার হুবহু নকল ছাড়া আর কিছু নয়; অবশ্য জন অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জুড়ে দিয়েছেন। লুকের বিবরণে (৫, ১-১১) অবশ্য বলা হয়েছে যে, মাছ ধরার ঘটনাটি যিশুর জীবিত থাকা কালে ঘটেছিল। এ বিবরণে জনের ঘটনাস্থলে হাজির থাকার একটি ইঙ্গিত আছে এবং জন তখন একজন প্রচারক ছিলেন বলে প্রবাদ আছে। যেহেতু জনের ঐ বর্ণনা তাঁর গসপেলের ২১ অধ্যায়ে আছে এবং এ অধ্যায়টি পরে যোগ করা হয়েছে বলে সকলে স্বীকার করেছেন, সেহেতু সহজেই অনুমান করা যায় যে, লুকের গসপেলে জনের নামের উল্লেখ থাকার কারণেই জনের গসপেলে কাহিনীটি পরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যিশুর জীবনের একটি ঘটনা বহুকাল পরে বর্ণনা করার প্রয়োজন একজন গসপেল লেখকের এবারত বদল করতেও সংকোচ বোধ করা হয়নি।

অপর একটি বিষয়ে জনের গসপেলের সঙ্গে অপর তিনখানি গসপেলের পার্থক্য আছে। বিষয়টি হচ্ছে যিশুর ধর্মপ্রচারের মেয়াদ। মথি, মার্ক ও লুক বলেছেন, যিশু এক বছর কাল ধর্মপ্রচার করেন। জন বলেছেন, দু বছর। কুলম্যান এ পার্থক্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। একুম্যানিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারগণ এ বিষয়ে বলেছেন- "প্রথম তিনজন বলেছেন যে, যিশু দীর্ঘদিন গ্যালিলিতে ছিলেন; তারপর তিনি জুডিয়া অভিমুখে রওনা হন এবং পথে তাঁর অনেকদিন কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি জেরুসালেমে অল্প কিছুদিন অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে জন বলেছেন যে, যিশু ঘন ঘন এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা সফর করতেন। তারপর তিনি জুডিয়ায়, বিশেষত জেরুসালেমে দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন (১, ১৯-৫১; ২, ১৩-৩, ৩৬; ৫, ১-৪৭; ১৪, ২০-৩১)। তিনি কয়েকটি পাসওভার (ইহুদীদের পান ভোজনের উৎসব; দেবদুতরা মিসরে জনপদ ধ্বংস করে, কিন্তু ইহুদীদের ঘরবাড়ি অক্ষত রাখে, সেই ঘটনার বার্ষিকী) অনুষ্ঠানের কথাও উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁর মতে যিশুর ধর্ম প্রচারের মেয়াদ হয় দু বছরেরও বেশী।"

এ অবস্থায় আমরা কার কথা বিশ্বাস করব? মথি, মার্ক, লুকের? না জনের?

গসপেলের উৎস

গসপেলের যে সাধারণ পরিচয় ইতিমধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে এবং বিশেষত এবারত পরীক্ষা করে দেখার পর এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, রচনাগুলি "অসংলগ্ন ও ধারাবাহিকতা বিহীন" এবং স্পষ্টতই "সমন্বয়ের অযোগ্য ও স্ববিরোধী।" এ রায়

দিয়েছেন একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন অব দি বাইবেল গ্রন্থের ভাষ্যকারগণ। এ বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের বরাত দেয়া খুবই প্রয়োজন, কারণ বিষয়টি এমন অনুভূতিপ্রবণ যে, তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। গসপেল সাহিত্যের কতিপয় বিব্রতকর বৈশিষ্ট সম্পর্কে চিন্তাশীল পাঠকের মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে, গসপেল রচনার সমকালীন ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কিত কতিপয় **ধারণা** থেকে তার জবাব যে কিভাবে পাওয়া যায়, তা আমরা আগেই দেখতে পেয়েছি। **এখন** বর্তমান যুগের বই-পুস্তকে কি বলা হয়েছে, বিশেষত গসপেল রচনার সময় ইভানজেলিস্টগণের ব্যবহৃত উৎস সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, তা জানা প্রয়োজন। রচনা সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তীকালীন ইতিহাস থেকে বর্তমানে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় কিনা, তাও অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

চার্চ ফাদারদের আমলে উৎসের প্রশ্নটি খুব সহজভাবে গ্রহণ **করা হয়েছিল**। খৃষ্টধর্মের গোড়ার দিকে উৎস **বলতে** একমাত্র মথি লিখিত গসপেলের সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি বুঝানো হত। ব্যাপারটি সমস্যা**র আকারে** দেখা দেয় মার্ক ও লুকের প্রসঙ্গে। জন প্রসঙ্গে কোন সমস্যাই ছিল না, কে**ননা** তাঁকে পৃথক ধরনের লেখক বলে মনে করা হত। গসপেলের দ্বিতীয় লেখক হিসেবে স্বীকৃত মার্ক সম্পর্কে সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন যে, তিনি মথির রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার (মথির) গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেছেন মাত্র। আর তৃতীয় লেখক লুক সম্পর্কে তাঁর অভিমত হচ্ছে এই যে, তিনি মথি ও মার্ক, এ দুজনের গ্রন্থ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। লুকের নিজস্ব ভূমিকা থেকেও যে এ অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

অর্থাৎ বিভিন্ন গসপেলের বয়ানের মধ্যে যে মিল ও সাদৃশ্য আছে, তা আমাদের মত সেই আমলের পাঠকের কাছেও ধরা পড়েছিল। বর্তমান যুগে একুমেনিক্যাল টানশ্লেশনের ভাষ্যকারগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ হিসেব বের করেছেনঃ

১। তিন গসপেলে একই শ্লোক আছে... ৩৩০টি।

২। মথি ও মার্কে একই শ্লোক আছে... ১৭৮টি।

৩। মার্ক ও লুকে একই শ্লোক আছে... ১০০টি।

৪। মথি ও লুকে একই শ্লোক আছে... ২৩০টি।

আবার প্রত্যেক গসপেলে এমন কিছু শ্লোক আছে, যা অন্য কোন গসপেলে নেই। এরূপ শ্লোকের সংখ্যা হচ্ছে- মথি ৩৩০, মার্ক ৫৩, এবং লুক ৫০০।

চার্চ ফাদারদের আমল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত দেড় হাজার বছর যাবত গসপেলের উৎস সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামায়নি। সকলে প্রবাদ ও উপকথাকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আধুনিক যুগে এ সকল তথ্য উদঘাটিত হওয়ার পর একটি নতুন উপলব্ধি শুরু হয়েছে এবং একজন ইভানজেলিস্ট অপর ইভানজেলিস্ট থেকে তথ্য নিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিমত অনুসারে কিভাবে যে নিজের বিবরণ

রচনা করেছেন, তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিবরণ রচনার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ তথ্য একদিকে যেমন এসেছে সংশ্লিষ্ট সমাজের মৌখিক প্রবাদ থেকে, অপর দিকে তেমনি এসেছে লিখিত আরমাইক দস্তাবেজ থেকে। এ দস্তাবেজ একত্রে সংগৃহিত আকারে সহলভ্য ছিল কিনা তা জানার কোন উপায় নেই। তবে একথা ঠিক যে প্রত্যেক ইভানজেলিস্ট তাঁর নিজের নিজের প্রয়োজনে তার অংশবিশেষ মাত্র ব্যবহার করেছেন।

বিগত একশো বছরে এ বিষয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং তাব ফলে একাধিক থিওরির জন্ম হয়েছে। এ সকল থিওরি ব্যাপক ও বিস্তারিত এবং ক্রমান্বয়ে আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে। প্রথম থিওরিটি "হোজম্যানের দুই উৎস থিওরি" (১৮৬৩) নামে পরিচিত। কুলম্যান এবং একুমেনিক্যাল টানশ্লেশনের ভাষ্যকারগণ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, এ থিওরিতে বলা হয়ে থাকে যে, মথি ও লুক একদিকে হয়ত মার্ক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং অপরদিকে তাঁরা হয়ত এমন একটি সাধারণ দস্তাবেজ ব্যবহার করেছেন, যা পরে হারিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া তাদের উভয়ের হয়ত নিজস্ব পৃথক পৃথক উৎসও ছিল। এ বিবরণ থেকে নিম্নবর্ণিত ছকে উপনীত হওয়া যায়ঃ

কুলম্যান এ বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেনঃ

১। মথি ও লুক মার্কের যে রচনা ব্যবহার করেছেন, তা সম্ভবত তাঁর গসপেল নয়, আগের কোন রচনা হতে পারে।

২। মৌখিক প্রবাদের উপর এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। অথচ এ বিষয়ের উপরই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল; কারণ যিশুর তিরিশ বা চল্লিশ বছরের বাণী ও তৎপরতার বিবরণ একমাত্র এ মৌখিক প্রবাদেই ধরে রাখা হয়েছিল এবং যে সকল খৃষ্টান সম্প্রদায় এ প্রবাদ লিখে ফেলেছিল, প্রত্যেক ইভানজেলিস্টই তাদের মুখপাত্র ছিলেন মাত্র। এভাবে সম্ভবত আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিভিন্ন প্রাচীন খৃষ্টান সম্প্রদায় যিশুর জীবন ও প্রচার সম্পর্কে যা কিছু অবহিত ছিল, আমাদের সামনে এখন যে গসপেল আছে, তাতে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের

বিশ্বাস এবং ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাও তাতে প্রতিফলিত হয়েছে। আর ইভানজেলিস্টগণ ছিলেন সেই সমাজেরই মুখপাত্র।

সাম্প্রতিক কালে এবারত পরীক্ষা করে গসপেলের উৎসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐ এবারত গঠিত হওয়ার একটি আরও জটিল প্রক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। জেরুসালেমের বাইব্লিক্যাল স্কুলের দুজন অধ্যাপক ফাদার বেন ও ফাদার বয়েসমার্ড লিখিত "সিনপসিস অব দি ফোর গসপেলস" (১৯৭২-৭৩) নামক গ্রন্থে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, জনশ্রুতি ও প্রবাদের ক্রমবিকাশের পাশাপাশি এবারতের ক্রমবিকাশও একইভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে ঘটেছে। ফাদার বেনয় গ্রন্থের ফাদার বয়েস মার্ড লিখিত অংশের যে ভূমিকা লিখেছেন, তাতে এ ক্রমবিকাশের ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন- "প্রবাদের সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে শব্দ প্রয়োগ ও বর্ণনাভঙ্গি বর্তমানে যে আকার ধারণ করেছে, তা স্পষ্টতই এবং বোধগম্য কারণেই মূলের মত নয়। কোন কোন পাঠক হয়ত এ কথা জানতে পেরে বিস্মিত বা বিব্রত হবেন যে, যিশুর কোন কোন উক্তি, উপমা বা তাঁর নিজের ভাগ্য সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী আজ আমরা যে আকারে পড়ছি, তিনি নিজে ঠিক সেই আকারে বলেননি। ঐ সকল কথা যাঁরা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরা তা নিজেদের মত করে বদল বা রূপান্তর করে দিয়েছেন। যাঁরা এ জাতীয় ঐতিহাসিক তদন্তের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের কাছে এ সত্য বিস্ময় এবং এমনকি কেলেংকারির ব্যাপার বলেও মনে হতে পারে।"

ফাদার বয়েসমার্ড একটি জটিল ছকের মারফত মূল এবারতের রদবদল ও রূপান্তর ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছক তথাকথিত "দুই উৎস থিওরি" থেকে এসেছে এবং বিভিন্ন এবারতের পরীক্ষা এবং তুলনামুলক আকারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। বিষয়টি অতিশয় জটিল বিধায় এখানে তার কোন সংক্ষিপ্তসার দেয়া সম্ভব নয়। কৌতুহলী পাঠক প্যারিসের লেস এডিশনস ডু সার্ফ প্রকাশিত মূল গ্রন্থ "সিনপুস ডেস কোরাট্রেস ইভানজাইলস" পড়ে দেখতে পারেন।

চার প্রকারের মূল দলীলকে গসপেলের মূল উৎসের প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের নাম দেওযা হয়েছে ক, খ, গ ও ঘ।

ক- দলীল এসেছে ইহুদী-খৃষ্টান উৎস থেকে। মথি ও মার্ক এ দলীল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

খ- দলীল হচ্ছে ক-দলীলের পুনর্ব্যাখ্যা। যে সকল গির্জায় প্রাচীন মূর্তিপূজা ও খৃষ্টীয় উপাসনা একই সঙ্গে চালু ছিল, সেই সকল গীর্জায় ব্যবহারের জন্য এ পুনর্ব্যাখ্যা করা হয়। মথি ছাড়া সকল ইভানজেলিস্টই এ দলীল দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

গ--দলীল মার্ক, লুক ও জনের অনুপ্রেরণার উৎস।

ফ-দলীল হচ্ছে মথি ও লুক যে সকল উৎস ব্যবহার করেছেন, তার অধিকাংশের প্রতীক। এ দলীল হচ্ছে "দুই উৎস থিওরি"র সাধারণ দলীল।

কিন্তু বর্তমানে আমরা গসপেলের এবারত যে আকারে দেখতে পাই, তা ঐ চারটি মূল দলীলের কোনটির ভিত্তিতে সরাসরি রচিত হয়নি। মাঝখানে একটি মধ্যবর্তী পাঠ বা সংস্করণ ছিল- মধ্যবর্তী বা মাধ্যমিক মথি, মাধ্যমিক মার্ক, মাধ্যমিক লুক ও মাধ্যমিক জন নামে যা পরিচিত। এ চারখানি মাধ্যমিক দলীল থেকে চারখানি গসপেলের চূড়ান্ত সংস্করণ রচিত হয় এবং অন্যান্য অনুরূপ গসপেল রচনাতেও অনুপ্রেরণা জোগায়। এক দলীলের সঙ্গে একাধিক দলীলের যে জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, একটু পরে একটি ছকে তা দেখানো হয়েছে। ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে এ গবেষণার ফলাফলের একটি সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, গসপেল এবারতের যেমন একটি 'ইতিহাস' আছে, তেমনি ফাদার বয়েসমার্ডের ভাষায় একটি 'ইতিহাস-পর্ব বিবরণও' আছে। অর্থাৎ চূড়ান্ত সংস্করণের আগে একটি মাধ্যমিক সংস্করণও প্রণীত হয়েছিল। যিশুর জীবনের একটি সুপরিচিত ঘটনা, অর্থাৎ অলৌকিকভাবে মাছ শিকারের ঘটনা লুকের গ্রন্থে যেখানে যিশুর জীবদ্দশায় ঘটেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে, জনের গ্রন্থে সেখানে যিশুর কবর থেকে উঠে আসার পর ঘটেছিল বলে লিখিত হয়েছে। এ অসামাঞ্জস্য স্পষ্টতই বিরাট। কিন্তু বিভিন্ন উৎসের ব্যবহার এবং বিভিন্ন সংস্করণ প্রণয়েনের কথা যদি স্মরণ রাখা যায়, তাহলে একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়ত খুঁজে পাওয়া যায়। এ অবস্থার ফলে আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, আমরা যখন গসপেল পড়ি তখন আমরা যে যিশুর নিজের বলা কথা পড়ছি, এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ফাদার বেনয় একটু ঘুরিয়ে বললেও ঠিক এ কথাই বলতে চেয়েছেন। তিনি পাঠককে হুশিয়ারও করে দিয়েছেন, আবার সান্ত্বনাও দিয়েছেন- "যিশুর নিজের মুখে বলা কথা সরাসরি শুনার আশা পাঠককে যদিও ত্যাগ করতে হয়, তাহলেও তার জানা উচিত যে তিনি চার্চের কথা শুনছেন এবং চার্চ যে প্রভু যিশুর স্বর্গীয়ভাবে নিযুক্ত মুখপাত্র দোভাষী, এ বিশ্বাস তার থাকা উচিত। তার আরও জানা উচিত যে, প্রভু যিশু বহুদিন আগে এ পৃথিবীতেই আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আর এখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁর মহিমায়, তাঁর গরিমায়।"

বাইবেলের এবারত যিশুর নিজের কথা না হওয়ার এ আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সঙ্গে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের বিপরীত ঘোষণা কিভাবে সমন্বয় করা সম্ভব? কাউন্সিল বলেছেন- "চার্চ এ চারখানি গসপেল এ কথা বলে নির্দ্বিধায় সমর্থন ও অনুমোদন করছেন যে, এ গ্রন্থগুলি ঐতিহাসিকভাবে খাঁটি ও অকৃত্রিম; এবং ঈশ্বরের পুত্র যিশু তাঁর স্বর্গে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত এ পৃথিবীর জীবনে মানুষের চিরন্তন মুক্তি ও মোক্ষ লাভের জন্য যা কিছু করেছিলেন, বলেছিলেন, ও শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা সঠিক ও বিশ্বস্ত ভাবে এ গ্রন্থ গুলিতে বিধৃত হয়েছে।"

স্পষ্টতই জেরুসালেমের বাইব্লিক্যাল স্কুলের গ্রন্থে (সিনপসিস অব দি ফোর গসপেলস) এ ঘোষণার সত্যতা সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে।

ফাদার এম ই বয়েসমার্ড
সিনপসিস অব দি ফোর গসপেল
সাধারণ ছক

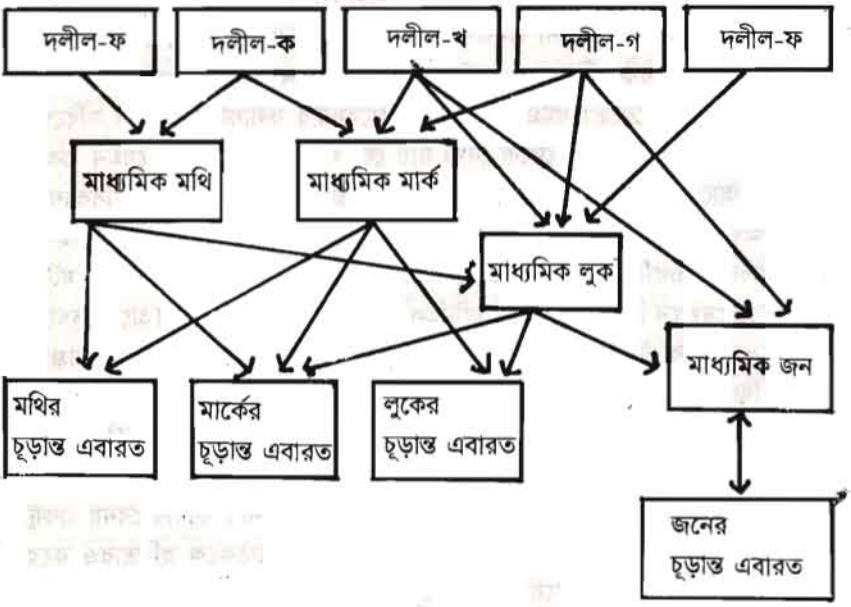

দলীল ক খ গ ফ= এবারত সংকলনে ব্যবহৃত মূল দলীল
মাধ্যমিক= এবারতের মাধ্যমিক সংস্করণ

এবারতের ইতিহাস

গসপেলগুলি লেখা হয়ে যাওয়ার পর তা নতুন ধর্ম খৃষ্টবাদের মৌলিক পুরাণে পরিণত হয়েছিল এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মতই তার উল্লেখ করা হত, এমন কোন ধারণা করা হলে তা ভুল হবে। কারণ তখন যিশুর কথা ও হাওয়ারিদের শিক্ষায় প্রধান বাহন ও উৎস ছিল মৌখিক প্রবাদ। আর লিখিত আকারে বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল পলের চিঠিপত্র। এ চিঠিগুলি গসপেলের কয়েক দশক আগেই লেখা হয়েছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ১৪০ সালের আগে গসপেল রচনার কোন সংকলনের অস্তিত্ব থাকার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন কোন ভাষ্যকার অবশ্য এখনও বিপরীত কথাই লিখে থাকেন। আমরা আরও দেখেছি যে, ১৭০ সালের আগে পর্যন্ত গসপেলগুলি পুরাণ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেনি।

খৃষ্টধর্মের প্রথম আমলে যিশু সম্পর্কে বহুবিধ রচনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এগুলি সঠিক ও আসল নয় বলে বহাল্ রাখা হয়নি; এবং চার্চের হুকুমে এ জাতীয় সকল রচনা গোপন করে ফেলা হয়। এ কারণে এগুলির নাম দেয়া হয়েছে 'এপোক্রিফা।' অবশ্য গোপন করা বা সরিয়ে ফেলা হলেও কিছু কিছু রচনা সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কারণ একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারদের মতে "এগুলি সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে মনে করা হত।" একই ধারণা বারনাবাসের চিঠি সম্পর্কেও পোষণ করা হত; কিন্তু অন্যান্য রচনা "নির্মমভাবে অপসারণ করা হয়" এবং তার ফলে এখন সেইগুলির অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া যায়। এ রচনাগুলিকে ভ্রান্তির বাহক বলে গণ্য করা হয় বিধায় বিশ্বাসী খৃষ্টানদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। তবুও চার্চের ফাদারদের উধৃতি থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায় যে, নাজারিনদের বাইবেল, হিব্রুদের বাইবেল এবং মিসরীয়দের বাইবেল মূল বাইবেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। টমাসের বাইবেল ও বারনাবাসের বাইবেল সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে।

কোন কোন গোপন করে ফেলা রচনায় কিছু কিছু ঘটনার কাল্পনিক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি জনপ্রিয় জনশ্রুতি মাত্র। লেখকগণ বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই এ সকল উদ্ভট বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য এ ধরনের জনশ্রুতি অন্যান্য সকল বাইবেলেও পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে যিশুর মৃত্যুকালের কথিত ঘটনাবলী সম্পর্কে মথির কাল্পনিক বিবরণ স্মরণ করা যেতে পারে। আসলে খৃষ্টবাদের গোড়ার দিকের সকল রচনাতেই কিছু কিছু গুরুত্বহীনতা ও চটুলতার সন্ধান পাওয়া যায়। এ সত্য সততার সঙ্গে স্বীকার করা উচিত।

চার্চ যখন সুসংগঠিত হয়ে উঠছিল, সে সময় যিশুর সম্পর্কিত রচনার বহুলতার কারণে কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু ছাঁটাই-বাছাই করেন। সম্ভবত একশো বাইবেল বাতিল করে দেয়া হয় এবং মাত্র চারখানি বহাল রাখা হয়। এ চারখানি বাইবেলই এখন "ক্যানোনিক" বা স্বীকৃত বলে গণ্য হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সাইনোপের মার্শিয়ম এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি ইহুদীদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং তখন সমগ্র ওল্ড টেস্টামেন্ট, যিশুর আবির্ভাবের পর রচিত ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমগ্র রচনা, এবং ইহুদী-খৃষ্ট প্রবাদ ভিত্তিক সকল রচনা বাতিল বলে গণ্য করতেন। তিনি একমাত্র লুকের গসপেলকে সঠিক বলে গণ্য করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, লুক পল ও তাঁর রচনাবলীর একমাত্র মুখপাত্র।

এ কারণে চার্চ মাশিয়ানকে বিপরীত মতাবলম্বী দু'জন বলে ঘোষণা করেন। তবে মথি, মার্ক, লুক ও জনের গসপেলের সঙ্গে পলের পত্রাবলীও অনুমোদন করেন। এ তালিকায় হাওয়ারিদের কার্যাবলীর ন্যায় অপর কিছু রচনাও যোগ করা হয়। তবে এ

তালিকা কখনই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়নি; কারণ প্রথম কয়েক শতাব্দী যাবত এ তালিকা বরাবর রদবদল হয়েছে। পরবর্তী কালে যে সকল রচনা বাতিল বলে গণ্য হয়েছে, এক সময় তা অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল; আবার বর্তমানে যে সকল রচনা অনুমোদিত নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলি ঐ সময় বাতিল বলে গণ্য করা হত। এ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ৩৯৩ সালের হিপোরেজিয়াস কাউন্সিল এবং ৩৯৭ সালের কার্থেজ কাউন্সিল পর্যন্ত বজায় ছিল তবে ঐ চারখানি গসপেল অবশ্য সর্বদাই অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও চার্চ কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ রচনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় ফাদার বয়েসমার্ড দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাঁর দুঃখে শরিক হতে চাই। তিনি অবশ্য চার্চের এ হঠকারিতার কিছুটা সংশোধন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর "সিনোপসিস অব দি ফোর গসপেলস" নামক গ্রন্থে চারখানি স্বীকৃতি গসপেলের পাশাপাশি ঐ বাতিল রচনাও কিছু কিছু স্থান দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও ঐ সকল গ্রন্থ বিভিন্ন পাঠাগারে পাওয়া যেত।

ঐ শতাব্দীতেই বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনা কঠোরভাবে সুশৃংখল ও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। গসপেলের প্রাচীনতম পান্ডুলিপিগুলিও ঐ সময়ের রচনা। তার আগের রচনা, তৃতীয় শতাব্দীর পাপিরি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর অপর একখানি গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমাদের পর্যন্ত এসেছে। গাছের ছালের ওপর গ্রীক ভাষায় লেখা দুখানি প্রাচীনতম পান্ডুলিপি চতুর্থ শতাব্দীতেই রচিত হয়। তার মধ্যে একখানি হচ্ছে "কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস।" এ গ্রন্থ এখন ভ্যাটিক্যান পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে; তবে কোথায় এবং কিভাবে যে তা পাওয়া গিয়েছে, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অপরখানি হচ্ছে, "কোডেক্স সিনাইটিকাস।" এ গ্রন্থখানি সিনাই পাহাড়ে পাওয়া যায় এবং এখন লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এ গ্রন্থে চার্চ কর্তৃক বাতিল ঘোষিত দুটি রচনা অন্তর্ভুক্ত আছে।

একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে আরও আড়াইশত (গাছের ছালে লেখা) পান্ডুলিপি আছে বলে জানা যায় এবং তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম পান্ডুলিপিটি রচিত হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। "তবে নিউ টেস্টামেন্টের যে সকল কপি আমাদের পর্যন্ত এসেছে, তার সবগুলি কিন্তু এক রকমের নয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাদের মধ্যে নানা প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে এবং এ পার্থক্যের সংখ্যা অনেক। কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণগত, শব্দগত বা শব্দের পরম্পরাগত। কিন্তু অন্যত্র এ পার্থক্য এমন আকার ধারণ করেছে যে, সমগ্র অনুচ্ছেদের অর্থই তার ফলে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। কেউ এ পার্থক্যের নমুনা দেখতে চাইলে তিনি "নোভাম টেস্টামেন্টাম গ্রেইস', (নেসল-এলান্ড, ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটিজ,

লন্ডন, ১৯৭১) নামক গ্রন্থখানি নাড়াচাড়া করে দেখতে পারেন। এ গ্রন্থে গ্রীক ভাষায় তথাকথিত 'মধ্যপন্থী' এবারত আছে এবং টিকা ও হাশিয়া সহ সকল সংস্করণের পার্থক্যের নমুনা আছে।

পান্ডুলিপি যতই প্রাচীন বা সম্মানিত হোক না কেন, তার এবারতের সঠিক হওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু সর্বদাই বিতর্কিত। কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস এ মন্তব্যের একটি উৎকৃষ্ট নজীর। ১৯৬৫ সালে ভ্যাটিক্যানের সম্পাদনায় এ গ্রন্থের একটি ফটো-ব্লক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্পাদকগণ তাঁদের ভূমিকায় জানিয়েছেন- "এ পান্ডুলিপি নকল করার (দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নকল করা হয় বলে মনে করা হয়) কয়েক শতাব্দী পরে লেখাগুলি স্পষ্ট করার জন্য একজন লেখক তার ওপর নতুন করে কলম বুলিয়ে দেন; কিন্তু ঐ লেখার যে অংশ তিনি ভুল বলে মনে করেন, তার ওপর কলম বুলাননি।"। ফলে যে অংশে কলম বুলান হয়নি, তার রং খুব হালকা হলেও লেখাগুলি আবছা আবছা বুঝা যায়। তবে নতুন করে কালি দিয়ে মূল লেখা স্পষ্ট করার কাজ যে খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে করা হয়েছে, এমন কোন আলামত পাওয়া যায় না। সম্পাদকগণ বলেছেন- "কয়েক শতাব্দী যাবত যাঁরা এ পান্ডুলিপি সংশোধন করেছেন বা তার হাশিয়া লিখেছেন, তাঁদের সঠিক পরিচয় এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে নতুন করে কলম বুলানোর সময় কিছু কিছু সংশোধন যে করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে এ এবারতকে চতুর্থ শতাব্দীতে নকল করা বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু খোদ ভ্যাটিক্যানে গিয়ে অনুসন্ধান করলে বুঝা যায় যে, তার পরে কয়েক শতাব্দী যাবত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হাতে ঐ এবারত রদবদল করা হয়েছে।

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, অন্যান্য এবারতের সঙ্গে তুলনা করলেই তো সঠিক-বেঠিক নির্ণয় করা যেতে পারে। হ্যাঁ তা ঠিক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন এবারতের অর্থই যখন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তখন তুলনা করার জন্য একটিকে আদি ও আসল বলে বেছে নেয়ার উপায় কি? তাছাড়া একথা তো এখন জানাই যাচ্ছে যে, প্রাচীনকালে একজন লেখক অপরের লেখার ওপর কলম বুলিয়ে যে সংশোধন করেছিলেন, তাই এখন সঠিক বলে মনে করা হচ্ছে। পরে আমরা দেখতে পাব যে, জন লিখিত একটি অনুচ্ছেদে "প্যারাক্লিট" সম্পর্কিত একটিমাত্র শব্দ প্রয়োগের ফলে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার অর্থ ও ভাবধারা কিভাবে সম্পূর্ণরূপে বদল হয়ে যায়। (প্যারাক্লিট একটি গ্রীক শব্দ, অর্থ শান্তিদাতা, চরম প্রশংসিত, সত্যের বাহক প্রভৃতি। এ শব্দটি দ্বারা বইবেলে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। জন ১৬ ঃ ১৩। বাইবেলের অন্যত্র আরও স্পষ্ট ইশারা আছে। -বাংলা অনুবাদক)।

বিভিন্ন এবারতের পার্থক্য সম্পর্কে কুলম্যান তাঁর 'দি নিউ টেস্টামেন্ট' নামক গ্রন্থে বলেছেন- "পরবর্তী কালের এবারতে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা কোন কোন ক্ষেত্রে

অসাবধানতার ফলে ঘটেছে। নকলনবিশ হয়ত একটি শব্দ বাদ দিয়েছেন, কিম্বা একবারের বদলে দুবার লিখেছেন, কিম্বা কোন বাক্যে একই শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে ঐ দু শব্দের মধ্যবর্তী বাক্যাংশ হয়ত বিলকুল বাদ দিয়েছেন। এ সব কিছুই ভুলক্রমে হয়ে থাকতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার হয়ত ইচ্ছাকৃত ভাবেও সংশোধন করা হয়ে থাকতে পারে। যিনি নকল করেছেন, তিনি হয়ত নিজের ধ্যান-ধারণা মুতাবেক সংশোধন করেছেন, কিম্বা পার্থক্য কমিয়ে আনার সজ্ঞান চেষ্টায় অপর কোন এবারতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সংশোধন করেছেন। পরে নিউ টেস্টামেন্টের রচনাবলী যখন ক্রমে ক্রমে প্রাচীন খৃষ্টীয় সাহিত্য থেকে পৃথক হতে থাকে এবং পবিত্র বলে গণ্য হতে থাকে, তখন নকলকারীগণও সাবধান হয়ে যান। তাঁরা পূর্ববর্তী নকলকারীদের মত ভুল না করে অথবা স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ না করে পবিত্র জ্ঞানে হুবহু নকল করতে থাকেন, এবং তার ফলে আগের পার্থক্যগুলি হুবহু বহাল রাখেন। তাছাড়া কোন কোন নকলনবিশ কোন দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করার জন্য মার্জিনে হাশিয়া লেখেন। পরবর্তী নকলনবিশ হয়ত মনে করেন যে, হাশিয়ার অংশটি সম্ভবত ভুলক্রমে এবারতের বাইরে লেখা হয়েছে এবং তার ফলে তিনি হাশিয়াটি এবারতের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। এ প্রক্রিয়ার ফলে নতুন এবারত আসলে আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।"

কোন কোন পাণ্ডুলিপির নকলকারী এবারতে ব্যাপক রদবদল করেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর 'কোডেক্স বেজাই ক্যান্টাব্রিজিনসিস'-এর ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটেছে। কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস এবং কোডেক্স সিনাইটিকাস-এর পর এ গ্রন্থখানিই সর্বাধিক সম্মানিত। নকলকারী সম্ভত লক্ষ্য করেন যে, যিশুর নসবনামার ব্যাপারে মথি ও লুকের বিবরণে পার্থক্য রয়েছে। ফলে তিনি লুকের গসপেল নকল করার সময় তাতে মথি লিখিত নসবনামা ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু পরে যখন তাঁর খেয়াল হয় যে, লুকের নসবনামার চেয়ে মথির নসবনামায় কয়েকটি নাম কম আছে, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছেমত কয়েকটি বাড়তি নাম সেখানে বসিয়ে দেন।

এ অবস্থায় এমন কথা বলা কি আদৌ সম্ভব যে, মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপির চেয়ে ষষ্ঠ শতাব্দীর জেরোমের 'ভালগেট' অথবা তারও আগের 'ভেটাস ইটালিয়া'র মত ল্যাটিন তরজমা, অথবা সুরিয়ানি ও কপটিক তরজমা বেশি নির্ভরযোগ্য? এ সকল তরজমা হয়ত উপরে উল্লেখিত পাণ্ডুলিপি থেকে করা হয়েছে এবং পরে সেই পাণ্ডুলিপি গায়েব হয়ে গিয়েছে। সঠিক তথ্য আমরা কিছুই জানি না।

এ সকল বিভিন্ন সংস্করণের এবারতকে কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্টের ভিত্তিতে কয়েকটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কুলম্যানের মতে এ শ্রেণীগুলি নিম্নরূপঃ

প্রথম শ্রেণীঃ তথাকথিত সিরীয় এবারত। এ এবারত সংকলনের ভিত্তিতে অধিকাংশ প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে। ছাপাখানার কল্যাণে

ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে এ এবারত ইউরোপের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তবে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এ এবারতটিই সম্ভবত সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ তথাকথিত পাশ্চাত্য এবারত। এ শ্রেণীতে আছে প্রাচীন ল্যাটিন সংস্করণ এবং গ্রীক ও ল্যাটিন উভয় ভাষার কোডেক্স বেজাই ক্যান্টাব্রিজিনসিস। একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের ভাষ্যকারদের মতে এ এবারতের একটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট হচ্ছে ব্যাখ্যা দেয়া, ভিন্নতর শব্দ প্রয়োগ করে একই অর্থ প্রকাশ করা, ভুল তথ্য পরিসংখ্যান দেয়া এবং স্ববিরোধিতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা।

তৃতীয় শ্রেণীঃ তথাকথিত নিরপেক্ষ এবারত। কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস এবং কোডেক্স সিনাইটিকাস এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ এবারতে যথেষ্ট বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা আছে বলে কথিত হয়ে থাকে। নিউ টেস্টামেন্টের আধুনিক সংস্করণে এ এবারতই প্রধানত অনুসরণ করা হয়ে থাকে; যদিও একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের মতে এখানেও যথেষ্ট ত্রুটি আছে।

এ ব্যাপারে আধুনিক যুগের সমালোচকগণ একমাত্র যা করতে পারেন, তা হচ্ছে একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশনের মতে এই যে, তাঁরা চেষ্টা চরিত্র করে "এমন একটি এবারত পুনর্গঠন করতে পারেন, যা অন্তত মূলের কাছাকাছি আসতে পারে। কিন্তু তবুও অবস্থা যাই হোক না কেন সেই মূল আর ফিরে পাওয়ার কোন উপায় নেই।"

চার গসপেল ও আধুনিক বিজ্ঞান

চার গসপেলে এমন ঘটনা খুব কমই আছে যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক অলৌকিক ঘটনার কথা। এরূপ ঘটনার বহু বিবরণ আছে, কিন্তু কোন অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক মন্তব্য করা তো সম্ভব নয়। অলৌকিক ঘটনা দু প্রকারের আছে। প্রথম প্রকারের ঘটনা মানুষ সম্পর্কে, বিশেষত রোগীকে আরোগ্য করা সম্পর্কে- যেমন উন্মাদ, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করা এবং লাজারাসকে পুনর্জীবিত করা। এবং দ্বিতীয় প্রকারের ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে বস্তুর আচরণ- যেমন যিশুর পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, কিংবা পানি মদে পরিণত হয়ে যাওয়া। কখনও কখনও অবশ্য নিছক স্বাভাবিক ঘটনাও অস্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। কারণ সময়ের ব্যবধান খুবই কম ছিল- যেমন তাৎক্ষণিক ভাবে ঝড় থেমে যাওয়া বা ডুমুর গাছের নিষ্পত্র হয়ে ম্রিয়মান হয়ে যাওয়া এবং একত্রে বিপুল পরিমাণ মাছ ধরা; মনে হয় যেন সমুদ্রের সকল মাছ আগে থেকে জাল ফেলার জায়গায় এসে জড়ো হয়ে ছিল।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান বিধায় এ সকল ঘটনা তিনি সহজেই ঘটাতে পারেন এবং

তাতে বিস্মিত হওয়ারও কিছু নেই। মানুষের কাছে যা দুঃসাধ্য, অসাধ্য বা অসম্ভব বলে মনে হয়, আল্লার কাছে তা আদৌ তেমন নয়। কিন্তু তাই বলে যিনি আল্লায় বিশ্বাস করেন, তিনি তো প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করতে পারেন না। আল্লার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা এবং প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস করার মধ্যে আদৌ কোন বিরোধ নেই। কারণ এ দুটি আসলে একই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

যিশু যে একজন কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি তা বিশ্বাস করতে রাজি আছি। কিন্তু প্রথম মানব ও ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র বিশ পুরুষের ব্যবধান ছিল, এরূপ কোন বর্ণনা সম্বলিত কোন এবারতকে যখন সঠিক এবং আল্লার অনুপ্রাণিত বলে ঘোষণা করা হয়, তখন আমি তা মেনে নিতে অক্ষম। লুক তাঁর গসপেলে এ কথাই বলেছেন (৩, ২৩-২৮)। লুকের এ বর্ণনা এবং এ একই বিষয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা কেন যে নিছক মানবিক কল্পনা মাত্র, একটু পরেই আমরা তার কারণ বর্ণনা করব।

যিশুর জন্ম সম্পর্কে কুরআনের মত বাইবেলেও একই বিবরণ আছে। সমগ্র মানবজাতির জন্য সাধারণ যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, মাতৃগর্ভে যিশুর উৎপত্তির ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রযোজ্য হয়নি। ঘটনাটি ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের আওতার বাইরে ঘটেছে। মায়ের ডিম্বাশয়ে সৃষ্ট ডিম্বকোষের কোন শুক্রকীটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। অথচ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে মাতার ডিম্বকোষের সঙ্গে পিতার শুক্রকীটের মিলিত হওয়ার পরই একটি শিশুর জন্ম গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে। অবশ্য পুরুষের সম্মিলন ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে জীবের স্বাভাবিক জন্মগ্রহণ সম্ভব হতে পারে এবং বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ প্রক্রিয়া "পার্থেনোজেনেসিস" নামে পরিচিত। কোন কোন পতঙ্গ, অমেরুদন্ডী প্রাণী ও পাখির ক্ষেত্রে কখনও কখনও এ প্রক্রিয়ায় জন্ম গ্রহণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। তবে এ জাতীয় ঘটনা অবশ্যই বিরল ও দুর্লভ। কোন কোন স্তন্যপায়ী জীব, বিশেষত নারী খরগোশের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, পুরুষ সম্মিলন ছাড়া ডিম্বকোষ থেকে খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের ভ্রূণ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশী অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব হয়নি এবং পুরুষ সম্মিলন ছাড়া পুর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণের ঘটনা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই হোক কিম্বা পরীক্ষাগারেই হোক, এখনও জানা যায়নি। যিশুর ব্যাপারটি একটি একক ঘটনা। মেরি কুমারী মাতা ছিলেন। তাঁর সতীত্ব অক্ষুন্ন ছিল এবং যিশু ছাড়া তাঁর আর কোন সন্তান হয়নি। যিশু তাই জীব বিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম।

বাইবেলে কখনও কখনও যিশুর ভাই ও বোনের কথা বলা হয়েছে (মথি ১৩, ৪৬-৫০ ও ৫৪-৫৮); মার্ক ৬,১-৬; জন ৭, ৩ ও ২, ১২)। যে দুটি গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হচ্ছে 'য়্যাডেলফোই' ও 'য়্যাডেলফাই' এবং তার অর্থ হচ্ছে সহোদর ভাই ও সহোদর বোন। মূলে যে সেমিটিক শব্দ আছে, তার অর্থ হচ্ছে আত্মীয়, এবং সম্ভবত

চাচাতো ফুফাতো প্রভৃতি ভাই বোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। গ্রীক ভাষার অনুবাদে স্পষ্টতই ভুল করা হয়েছে।

যিশুর নসবনামা

মথি ও লুকের গসপেলে যে দুটি নসবনামা আছে, তাতে বিষয়বস্তুর সত্যতা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতির ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ নসবনামা দুটির নির্ভুলতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহের কারণ আছে। খৃষ্টান ভাষ্যকারগণ এ বিষয়ে খুবই বিব্রত করে থাকেন। কারণ ঐ নসবনামা যে আসলে মানুষের কল্পনা প্রসুত, তা তারা আদৌ স্বীকার করতে চাননা। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর জেনেসিসের স্যাকারডোটাল এবারতের লেখকগণ নিজেদের কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করে আদি মানুষের একটি নসবনামা প্রস্তুত করেছিলেন। মথি ও লুক এ নসবনামা থেকে প্রচুর তথ্য নিয়েছেন এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনার সঙ্গে মিশিয়ে নিজের নসবনামা প্রস্তুত করেছেন।

প্রথমেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া প্রয়োজন যে, যিশুর ব্যাপারে পুরুষ নসবনামার আদৌ কোন মূল্য নেই। কারণ তাঁর কোন পিতা ছিল না। সুতরাং তাঁর নসবনামা যদি কেউ প্রস্তুত করতে চায়, তাহলে আসলে তা হতে হবে তাঁর মাতা মেরির নসবনামা।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত বাইবেলের সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ থেকে মথি বর্ণিত নসবনামা নিচে উদ্ধৃত করা হল। উল্লেখযোগ্য যে, মথির গসপেলের শুরুতেই এ নসবনামা আছেঃ

ইব্রাহীমের পুত্র দাউদ তৎপুত্র যিশু খৃষ্টের নসবনামা

ইব্রাহীম	ইসহাকের পিতা ছিলেন
ইসহাক	ইয়াকুবের পিতা ছিলেন
ইয়াকুব	জুডা ও তার ভাইদের পিতা ছিলেন
জুডা	তামারের গর্ভজাত পেরেজ ও জেরাহর পিতা ছিলেন
পেরেজ	হেজরোনের পিতা ছিলেন
হেজরোন	র‍্যামের পিতা ছিলেন
র‍্যাম	আম্মিনাদাবের পিতা ছিলেন
আম্মিনাদাব	নাহশোনের পিতা ছিলেন
নাহশোন	সালমোনের পিতা ছিলেন
সালমোন	রাহাবের গর্ভজাত বোয়াজের পিতা ছিলেন
বোয়াজ	রুথের গর্ভজাত ওবেদের পিতা ছিলেন

ওবেদ	জেসের পিতা ছিলেন
জেসে	রাজা দাউদের পিতা ছিলেন
দাউদ	উরিয়ার স্ত্রীর গর্ভজাত সোলায়মানের পিতা ছিলেন
সোলায়মান	রেহোবোমের পিতা ছিলেন
রেহোবোম	আবিজার পিতা ছিলেন
আবিজা	আসার পিতা ছিলেন
আসা	জেহোশাফাতের পিতা ছিলেন
জোরাম	উজ্জিয়ার পিতা ছিলেন
উজ্জিয়া	জোথামের পিতা ছিলেন
জোথাম	আহাজের পিতা ছিলেন
আহাজ	হেজেকিয়ার পিতা ছিলেন
হেজেকিয়া	মানাসের পিতা ছিলেন
মানাসেহ	আমোসের পিতা ছিলেন
আমোস	জোসিয়ার পিতা ছিলেন
জোসিয়া	জেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা ছিলেন

এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল ব্যাবিলনে বহিষ্কৃত হওয়ার সময়। বহিষ্কারের পরঃ

জেকোনিয়া	শিলটিয়েলের পিতা ছিলেন
শিলটিয়েল	জেরুব্বাবেলের পিতা ছিলেন
জেরুব্বাবেল	আবিউদের পিতা ছিলেন
আবিউদ	এলিয়া কিমের পিতা ছিলেন
এলিয়াকিম	আজোরের পিতা ছিলেন
আজোর	জাদোকের পিতা ছিলেন
জাদোক	আচিমের পিতা ছিলেন
আচিম	এলিউদের পিতা ছিলেন
এলিউদ	এলিয়াজারের পিতা ছিলেন
এলিয়াজার	মাটহানের পিতা ছিলেন
মাটহান	ইয়াকুবের পিতা ছিলেন
ইয়াকুব	ইউসুফের পিতা ছিলেন, এ ইউসুফ মেরীর স্বামী ছিলেন, মেরীর গর্ভে যিশুর জন্ম হয় এবং তিনি খৃষ্ট নামে অভিহিত হন।

সুতরাং ইব্রাহীম থেকে দাউদ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, দাউদ থেকে ব্যাবিলনে বহিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, এবং ব্যাবিলনে বহিষ্কৃত হওয়া থেকে খৃষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ

(মথি ১,১-১৭)।

লুক (২,২৩-৩৮) যে নসবনামা দিয়েছেন, তা মথি থেকে ভিন্নতর। সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ বাইবেল থেকে তাঁর এবারত উধৃত করা হলঃ

"আর যিশু নিজে, যখন তিনি কার্য আরম্ভ করেন, কমবেশী তিরিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন; তিনি, যেমন ধরা হইত, যোসেফের (ইউসুফের) পুত্র, ইনি এলির পুত্র, ইনি মওতের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, ইনি মলকির পুত্র, ইনি জান্নায়ের পুত্র, ইনি যোসেফের পুত্র, ইনি মওথিয়ের পুত্র, ইনি আমোসের পুত্র, ইনি নলুমের পুত্র, ইনি ইষলির পুত্র, ইনি নগির পুত্র, ইনি মাটের পুত্র, ইনি মওথিয়ের পুত্র, ইনি শিমিয়ির পুত্র, ইনি বুদার পুত্র, ইনি যোহানার পুত্র, ইনি রিশার পুত্র, ইনি জেরুব্বাবিলের পুত্র, ইনি শলটিয়েলের পুত্র, ইনি নোরির পুত্র, ইনি মলকির পুত্র, ইনি আদ্দির পুত্র, ইনি কোশমের পুত্র, ইনি ইলমদমের পুত্র, ইনি এরের পুত্র, ইনি যিশুর পুত্র, ইনি ইলিয়েশরের পুত্র, ইনি মওতের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, ইনি শিমিয়োনের পুত্র, ইনি যুদার পুত্র, ইনি যোশেফের পুত্র, ইনি যোনমের পুত্র, ইনি ইলিয়াকিমের পুত্র, ইনি নিলেয়ার পুত্র, ইনি মিন্নার পুত্র, ইনি মওথের পুত্র ইনি নাথনের পুত্র, ইনি দাউদের পুত্র, ইনি যিশরের পুত্র, ইনি ওবোদের পুত্র, ইনি বোয়সের পুত্র, ইনি সলমোনের পুত্র, ইনি নহশোনের পুত্র, ইনি আম্মিনাদবের পুত্র, ইনি আদমানের পুত্র, ইনি অনি'র পুত্র, ইনি হিশরোনের পুত্র, ইনি **পেরশের** পুত্র, ইনি যিহুদার পুত্র, ইনি যাকোবের পুত্র, ইনি ইসহাকের পুত্র, ইনি ইব্রাহীমের পুত্র, ইনি তেরহের পুত্র, ইনি নাহোরের পুত্র, ইনি সরুগের পুত্র, ইনি রিয়ুর পুত্র, ইনি পেলগের পুত্র, ইনি এবরের পুত্র, ইনি শেলহের পুত্র, ইনি কেননের পুত্র, ইনি আরফকশদের পুত্র, ইনি শেমের পুত্র, ইনি নোহের পুত্র, ইনি লেমকের পুত্র, ইনি মথুশেলহের পুত্র, ইনি হনোকের পুত্র, ইনি জেরদের পুত্র, ইনি মহললেলের পুত্র, ইনি কৈনন**ের** পুত্র, ইনি ইনোশের পুত্র, ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।"

এ নসবনামা দুভাগে ভাগ করে দুটি পৃথক তালিকায় দেখালে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাবে। প্রথম তালিকা দাউদের আগে পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় তালিকা দাউদের পরবর্তীকালের।

দাউদের পূর্বে

মথির বিবরণ	লুকের বিবরণ
	১। আদম
	২। শেথ
	৩। ইনোস
	৪। কৈনান
	৫। মহালালিন

	৬। জারেদ
	৭। ইনোক
	৮। মেথুসেলাহ
	৯। লামেক
	১০। নূহ
	১১। শেম
	১২। আরফাকসাদ
	১৩। কৈনান
	১৪। শেলাহ
	১৫। ইবার
	১৬। পেলেগ
	১৭। রিউ
	১৮। সেরুগ
মথি ইব্রাহীমের পুর্ববর্তী কোন নাম উল্লেখ করেননি।	১৯। নাহোর
	২০। তেরাহ
১। ইব্রাহীম	২১। ইব্রাহীম
২। ইসহাক	২২। ইসহাক
৩। যাকোব	২৩। যাকোব
৪। জুদাহ	২৪। জুদাহ
৫। পেরেজ	২৫। পেরেজ
৬। হেজরোন	২৬। হেজরোন
৭। র‍্যাম	২৭। আরনি
৮। আম্মিনাদাব	২৮। আদমিন
৯। নাহশোন	২৯। আম্মিনাদাব
১০। সালমন	৩০। নাহশোন
১১। বোয়াজ	৩১। সালা
১২। ওবেদ	৩২। বোয়াজ
১৩। জেসে	৩৩। ওবেদ
১৪। দাউদ	৩৫। দাউদ
দাউদের পরে মথির বিবরণ	লুকের বিবরণ
১৪। দাউদ	৩৫। দাউদ

১৫। সলোমন
১৬। রেহোবোম
১৭। আবিজাহ
১৮। আসা
১৯। জেহোশাফাত
২০। জোরাম
২১। উজ্জিয়া
২২। জোথাম
২৩। আহাজ
২৪। হেজেকিয়া
২৫। মানাসেহ
২৬। আমোস
২৭। জেসিয়া
২৮। জেকোনিয়া
ব্যাবিলনে বহিস্কার
২৯। শিলটিয়েল
৩০। জেরুব্বাবেল
৩১। আবিউদ
৩২। এলিয়াকিম
৩৩। আজোর
৩৪। যাদোক
৩৫। অচিম
৩৬। এলিউদ
৩৭। এলিয়াজার
৩৮। মওন
৩৯। যাকোব
৪০। যোসেফ
৪১। যিশু

৩৬। নাথন
৩৭। মওথা
৩৮। মেন্না
৩৯। মেলেয়া
৪০। এলিয়াকিম
৪১। জোনাম
৪২। যোসেফ
৪৩। জুহাদ
৪৪। সামিওন
৪৫। লেভি
৪৬। মওত
৪৭। জোরিম
৪৮। এলিজার
৪৯। যোশুয়া
৫০। আর
৫১। এলমাদাম
৫২। কোসাম
৫৩। আদ্দি
৫৪। মেলচি
৫৫। নেরি
৫৬। শিলটিয়েল
৫৭। জেরুববাবেল
৫৮। রেহসা
৫৯। যোয়ানন
৬০। যোদা
৬১। যোসেক
৬২। সেমিন
৬৩। মওথিয়াস
৬৪। মাআথ
৬৫। নাজ্জাই
৬৬। এসলি
৬৭। নাহুম
৬৮। আমোস

৬৯। মওথিয়াস
৭০। যোসেফ
৭১। যান্নাই
৭২। মেলচি
৭৩। লেভি
৭৪। মওত
৭৫। হেলি
৭৬। যোসেফ
৭৭। যিশু

পান্ডুলিপিতে ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্গে মিলের পার্থক্য

বানানের পার্থক্য ছাড়াও দুই গসপেলের নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি লক্ষণীয়ঃ

মাথুর গসপেল

গ্রীক ও ল্যাটিন উভয় ভাষায় রচিত কোডেক্স বেজাই ক্যান্টাব্রিজিনসিস নামক ষষ্ঠ শতাব্দীর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পান্ডুলিপিতে কোন নসবনামা নেই। গ্রীক পান্ডুলিপি থেকে নসবনামাতো গায়েব হয়ে গিয়েছেই, এমনকি ল্যাটিন পান্ডুলিপি থেকেও বহুলাংশে গায়েব হয়ে গেছে। প্রথম দিককার পৃষ্ঠাগুলি বোধহয় হারিয়েই গিয়েছে।

মথি যে এ বিষয়ে কিভাবে ওল্ড টেস্টামেন্ট বিকৃত করেছেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংখ্যার একটি চমকপ্রদ প্রদর্শণীর জন্য তিনি নসবনামায় বর্ণিত নামের জোড়া বাঁধতে শুরু করেন; কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি তিনি শেষ পর্যন্ত তা সমাপ্ত করেননি।

লুকের গসপেল

ইব্রাহীমের পূর্বে- লুক ২০টি নামের উল্লেখ করেছেন কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টে মাত্র ১৯টি নামের উল্লেখ আছে (পূর্বে প্রদত্ত আদমের বংশধরদের তালিকা দেখুন)। আরফাকসাদের (১২ নং) নামের পরে লুক কৈনান (১৩ নং) নামটি যোগ করেছেন, অথচ আদিপুস্তকে তাঁকে আরফাকসাদের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়নি।

ইব্রাহীম থেকে দাউদ- পান্ডুলিপিতে এ সময়ে ১৪ থেকে ১৬টি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দাউদ থেকে যিশু

কোডেক্স বেজাই ক্যান্টাব্রিজিনসিসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের নমুনা পাওয়া যায়। এ পার্থক্যের কারণ হচ্ছে এই যে, লুক মথির নসবনামা থেকে তথ্য নিয়ে নিজেই একটি খেয়ালি নসবনামা প্রস্তুত করেন এবং নকলনবিশগণ তার সঙ্গে আরও পাঁচটি নাম জুড়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ পাণ্ডুলিপি থেকে মথির গসপেলের নসবনামাটি হারিয়ে যায়। ফলে এখন মিলিয়ে দেখার আর কোন উপায় নেই।

এবারতে সমালোচনা

আমাদের সামনে যে দুটি নসবনামা আছে, তার দুটিতেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট আছে- দুটি ধারাই ইব্রাহীম ও দাউদের মারফত প্রবাহিত হয়েছে। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমরা নসবনামাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নেব- (১) আদম থেকে ইব্রাহীম, (২) ইব্রাহীম থেকে দাউদ, (৩) দাউদ থেকে যিশু।

(১) আদম থেকে ইব্রাহীম

মথি তাঁর নসবনামা ইব্রাহীম থেকে শুরু করেছেন। সুতরাং এখানে তাঁর বিবরণের অস্তিত্ব নেই। একমাত্র লুকই আদম পর্যন্ত ইব্রাহীমের ২০ জন পূর্ব পুরুষের নাম দিয়েছেন। অথচ আদি পুস্তকে (অধ্যায় ৪, ৫ ও ১১) যে মাত্র ১৯ জনের নাম আছে, তা আমরা আগেই দেখেছি।

কিন্তু ইব্রাহীমের পূর্বে মাত্র ১৯ বা ২০ পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন, এমন কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? ওল্ড টেস্টামেন্টের আলোচনায় এ সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আদি পুস্তকে বর্ণিত আদমের বংশধরদের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে এবং বাইবেলে বর্ণিত সময়ের মেয়াদ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব থেকে ইব্রাহীমের জন্মকাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে উনিশ শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমানে ধরে নেয়া হয় যে, ইব্রাহীম খৃষ্টপূর্ব ১৮৫০ সালে জীবিত ছিলেন এবং তার ভিত্তিতে ওল্ড টেস্টামেন্টের তথ্য মোতাবেক দেখা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব মোটামুটি ভাবে খৃষ্টপূর্ব আটত্রিশ শতাব্দীতে হয়েছিল। লুক তাঁর গসপেলে স্পষ্টতই এ তথ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। এ হিসাব নকল করার ব্যাপারে তিনি একটি সুস্পষ্ট অসত্য কথা বলেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চূড়ান্ত ঐতিহাসিক যুক্তি আমরা আগেই দেখেছি।

ওল্ড টেস্টামেন্টের তথ্য বর্তমানে যে আর গ্রহণযোগ্য নয়, তা সকলেই স্বীকার করেন। দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলে এ প্রকার তথ্যকে "অপ্রচলিত" বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গসপেলে যে এ বৈজ্ঞানিক ভাবে অসঙ্গত তথ্যই ব্যবহার করা হয়েছে, এ অভিমত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং যাঁরা গসপেল এবারতের ঐতিহাসিক নির্ভুলতার সমর্থন

করে থাকেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এ যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভাষ্যকারগণ এ বিপদের আশংকা করতে বিলম্ব করেননি। তাই তাঁরা এ বলে পার পেতে চান যে, এ নসবনামা সম্পূর্ণ নয় এবং লুক কিছু কিছু নাম বাদ দিয়ে গেছেন। তাঁরা দাবী করেন যে, তিনি উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই নাম বাদ দিয়েছেন। কারণ তাঁর "একমাত্র লক্ষ্য ছিল ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভিত্তিতে অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট সম্বলিত বংশধারার একটি মোটামুটি ধারা কায়েম করা"। (এট্রাইকট, লিটল ডিকশনারী অব দি নিউ টেস্টামেন্ট, প্যারিস)। কিন্তু এবারতে যা আছে তার ভিত্তিতে এ কথা বলার আদৌ কোন যুক্তি নেই। কারণ এবারতে পরিষ্কার বলা আছে, ক খ-এর পিতা ছিলেন, কিংবা খ-কএর পুত্র ছিলেন। বিশেষত ইব্রাহীমের আগের জামানার ক্ষেত্রে লুক ওল্ড টেস্টামেন্টের উপরেই নির্ভর করেছেন, আর সেখানে এ ভাবে বিবরণ দেয়া আছে- ক-এর বয়স প বছর হওয়ার পর তিনি খ-এর পিতা হন; খ-এর বয়স ধ বছর হওয়ার পর তিনি গ-এর পিতা হন। সুতরাং ফাঁক পড়ার কোন উপায় নেই।

বর্তমান যুগে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তার ভিত্তিতে লুক বর্ণিত যিশুর ইব্রাহীম-পূর্ব নসবনামা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(২) ইব্রাহীম হতে দাউদ

এ আমলের ক্ষেত্রে দুএকটি নাম ছাড়া দুজনের নসবনামা প্রায় মিলে যায়। যে নামগুলি মেলে না, সেগুলি নকলকারীর ভুল বলে সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

কিন্তু তাই বলে কি গসপেল-লেখক মথি ও লুক নির্ভুল বিবরণ দিয়েছেন বলে ধরে নিতে হবে?

ইতিহাসবিদগণের হিসাব মুতাবিক দাউদ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকের মানুষ ছিলেন এবং ইব্রাহীম ছিলেন খৃষ্টপূর্ব ১৮০০-১৮৫০ সালের দিকের মানুষ। এখন মথি বা লুকের বিবরণ সঠিক বলে মেনে নিতে হলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, মোটামুটি ভাবে আটশত বছর সময়ের মধ্যে ১৪ থেকে ১৬ পুরুষ বাস করেছে। কিন্তু এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার? এ আমলটি সম্পর্কিত গসপেল বিবরণে যা বলা হয়েছে, তাতে সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সীমারেখা প্রায় অতিক্রম হয়ে গেছে।

(৩) দাউদের পরের আমল

দাউদ থেকে যোসেফ পর্যন্ত অর্থাৎ যিশু পর্যন্ত বংশধারা মিলাতে গেলে দেখা যায় যে, মথির বিবরণের সঙ্গে লুকের বিবরণ আদৌ মিলছে না।

লুকের ব্যাপারে কোডেক্স বেজাই ক্যান্টব্রিজিনসিসে যে সুস্পষ্ট জালিয়াতি করা

হয়েছে, আপাতত তা বাদ দিয়ে রেখে সর্বাধিক সম্মানিত দুটি পাণ্ডুলিপি কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস এবং কোডেক্স সিনাইটিকাসে কি বলা হয়েছে, তা আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি।

লুকের নসবনামায় দাউদের (৩৫ নং) পরে এবং যিশু (৭৭ নং) পর্যন্ত মোট ৪২টি নাম আছে। পক্ষান্তরে মথির নসবনামায় দাউদ (১৪ নং) থেকে যিশু (৪১ নং) পর্যন্ত মোট ২৭টি নাম আছে। দাউদের পরে যিশুর যে সকল (কাল্পনিক) পূর্বপুরুষের নাম দেয়া হয়েছে, তা দুজনের বিবরণে দু রকম। তাছাড়া বর্ণিত নামও দুই বিবরণে এক রকম নয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

মথি আমাদের বলেছেন যে, ইব্রাহীমের পর যিশুর নসবনামায় ১৪টি নাম যে কিভাবে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তা তিনি আবিষ্কার করেছেন। প্রথম ভাগ ইব্রাহীম থেকে দাউদ পর্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগ দাউদ থেকে ব্যাবিলনে দেশান্তর হওয়া পর্যন্ত এবং তৃতীয় ভাগ দেশান্তর থেকে যিশু পর্যন্ত। তাঁর এবারতের প্রথম দু ভাগে ১৪টি করে নাম আছে বটে- কিন্তু তৃতীয় ভাগে আছে মাত্র ১৩টি নাম, ১৪টি নয়। তাঁর দেয়া তালিকায় দেখা যায় যে, শিয়ালথিয়েলের নাম আছে ২৯ নম্বরে, আর যিশুর নাম ৪১ নম্বরে। তাঁর এবারতের এমন কোন পাঠ খুঁজে পাওয়া যায় না, যেখানে তৃতীয় ভাগে ১৪টি নাম দেয়া আছে।

মথি তাঁর দ্বিতীয় ভাগে নামের সংখ্যা ১৪টি করার জন্য ওল্ড টেস্টামেন্টের এবারতে ব্যাপক রদবদল করেছেন। দাউদের ছয়জন আওলাদের নাম (১৫ থেকে ২০ নম্বর) ওল্ড টেস্টামেন্টের বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু দ্বিতীয় বংশাবলী অধ্যায়ে আই-ওরামের (২০ নম্বর) তিনজন আওলাদের যে আহাজিয়াহ, জেয়াশ ও আমাজিয়াহ নাম দেয়া আছে, তা তিনি গোপন করেছেন। অন্যত্র মথি বলেছেন যে, জেকোনিয়াহ (২৮ নম্বর) জোসিয়ার পুত্র, কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের দ্বিতীয় রাজাবলী অধ্যায়ে দেখা যায় যে, জোসিয়া ও জেকোনিয়ার মাঝখানে আর একজন আছেন এবং তাঁর নাম এলিয়াকিম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দাউদ থেকে ব্যাবিলনে দেশান্তর হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৪টি নামের একটি কৃত্রিম তালিকা পেশ করার জন্য মথি ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণিত নসবনামা রদবদল করেছেন। তাছাড়া মথির তৃতীয় ভাগে একটি নাম কমও আছে। অর্থাৎ বাইবেলের বর্তমানে চালু সংস্করণগুলির কোনটিতেই পুরাপুরি ১৪টি নাম নেই। একটি নাম কম থাকার ব্যাপারটি হয়ত কোন প্রাচীন নকলনবিশের ভুল বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু সেটা আসলে কোন বড় ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোন ভাষ্যকারই এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য না করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাদের এ নীরবতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কি হতে পারে? ডব্লু ট্রিলিং তাঁর "দি গসপেল একর্ডিং টু ম্যাথু" (প্রকাশক-ডেসক্লি, প্যারিস) নামক গ্রন্থে মাত্র একটি বাক্য লিখে নীরবতার এ পূণ্যময় ষড়যন্ত্র বরবাদ করে দিয়েছেন। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ

একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন ও কার্ডিনাল ডানিয়েলো সহ এ গসপেলের বিভিন্ন ভাষ্যকার মথির ৩ × ১৪ হিসেবের বিরাট প্রতীকধর্মী তাৎপর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ এ তাৎপর্য মথির কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এ হিসাবে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত নাম গোপন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

মথির এ কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখানোর জন্য ভাষ্যকারগণ যে কোন না কোন অজুহাত খাড়া করতে পারেন, তাতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মথি যা দেখাতে চেয়েছেন, নাম গোপন করার ফলে সেই মূল উদ্দেশ্যই যে বরবাদ হয়ে গেছে, এ সত্যটি এড়িয়ে যাওয়ার তাদের উপায় কি?

আধুনিক বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য ও মন্তব্য

কার্ডিনাল ডানিয়েলো তাঁর "গসপেলস অব চাইল্ডহুড" (প্রকাশক এডিশনস দ্য সিউইল, প্যারিস) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, মথির 'সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রকল্পায়নের' একটি বিশেষ প্রতীকধর্মী গুরুত্ব আছে, কারণ এ প্রস্তাবনাতেই যিশুর বংশ পরিচয় প্রমাণিত হয়েছে এবং লুকও বিষয়টি সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে মথি ও লুক আসলে ইতিহাসবিদ, এবং তারা "ঐতিহাসিক অনুসন্ধান" সমাপ্ত করেছেন এবং ঐ নসবনামা তাঁরা 'যিশুর পারিবারিক দস্তাবেজ থেকে সংগ্রহ করেছেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যিশুর পারিবারিক দস্তাবেজের কোন হদিশ কখনই পাওয়া যায়নি। লেখক বলেছেন যে, তিনি ইউসেবিয়াস পামফিলি লিখিত ধর্মীয় ইতিহাস থেকে ঐ দস্তাবেজের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছেন। কিন্তু খোদ পামফিলির যোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে বলার মত অনেক কথাই আছে। তাছাড়া যিশুর পারিবারিক দস্তাবেজে দু রকমের দুখানি নসবনামাই বা থাকবে কেন? দুজন তথাকথিত, 'ঐতিহাসিক' দু রকমের দুখানি নসবনামা দিয়েছেন বলেই কি ঐ দস্তাবেজে দুখানি ভিন্ন ভিন্ন নসবনামা আবিষ্কার করতে হয়েছে?

কার্ডিনাল ডানিয়েলোর এ দৃষ্টিভঙ্গির যাঁরা সমালোচনা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতিই তিনি খড়গহস্ত হয়েছেন- "গসপেলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু বিশেষজ্ঞই পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি ইহুদী-খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, এবং সেমিটিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কারণে তাঁদের পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তারা প্লেটো, ডেসকার্টে, হেগেল ও হিডেগার প্রভাবিত নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ঐ ব্যাখ্যায় আরোপ করেছেন। সুতরাং তাঁরা যে নানাবিধ বিষয়বস্তু একত্রে মিশিয়ে ফেলেছেন, তা সহজেই বুঝা যায়।" অথচ ঐ কাল্পনিক নসবনামার প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব গ্রহণ করার সঙ্গে প্লেটো, ডেসকার্টে, হেগেল বা হিডেগারের মত দার্শনিকদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

মথির ৩ × ১৪ উপপাদ্যের অর্থ খুঁজতে গিয়ে লেখক একটি উদ্ভট প্রস্তাবনা

উত্থাপন করে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর কথাগুলিই এখানে উধৃত করা যেতে পারে- "আসলে এখানে ইহুদী ওহীর সাধারণ দশ সপ্তাহের কথা বলা হইয়াছে। আদম থেকে ইব্রাহীম পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রথম তিন সপ্তাহ বাদ দিতে হবে; তাহলে বছরগুলির সাত সপ্তাহ অবশিষ্ট থাকবে; তার প্রথম ছয় সপ্তাহ হবে সাতের ছয়গুন, যার সম্পর্ক হচ্ছে, চৌদ্দর তিনটি শ্রেণীর; আর অবশিষ্ট সপ্তম সপ্তাহ শুরু হয়েছে যিশুর সময় থেকে, কারণ যিশুর সঙ্গে সঙ্গেই দুনিয়ার সপ্তম যুগ শুরু হয়েছে।" এ ধরনের ব্যাখ্যা স্পষ্টতই মন্তব্যের অযোগ্য।

একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন- নিউ টেস্টামেন্ট-এর ভাষ্যকারগণও একই ধরনের হাস্যকর সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মথির ৩ × ১৪ উপপাদ্য তারা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

(ক) ১৪ সংখ্যাটি হিব্রু নাম ডেভিডের তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাত্মিক যোগফল হতে পারে- ডি=৪, এবং ভি=৬, সুতরাং ৪+৬+৪=১৪।

(খ) ৩ × ১৪ = ৬ × ৭, এবং 'ইব্রাহীমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে পবিত্র ইতিহাসের শুরু হয়েছে, তার ষষ্ঠ সপ্তাহের শেষে যিশু আগমন করেন।"

লুকের ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থে আদম থেকে যিশু পর্যন্ত ৭৭টি নাম দেয়া হয়েছে, এবং পুনরায় ৭ সংখ্যাটি এভাবে আনা হয়েছে- ৭৭-কে ৭ দিয়ে ভাগ করা হয়েছে, অর্থাৎ ৭ × ১১ = ৭৭। স্পষ্টতই কোন শব্দ যোগ দিয়ে বা বিয়োগ করে যে সংখ্যাতাত্ত্বিক পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সর্বত্রই ৭৭টি নাম সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও কাল্পনিক। তবে লক্ষ্যনীয় যে, সংখ্যার এ খেলার সঙ্গে উপপাদ্যটি বেশ মিলে গিয়েছে।

গসপেলে যিশুর যে দুটি নসবনামা আছে, তার ভিত্তিতে খৃষ্টান ভাষ্যকারগণ মথি ও লুকের কল্পনাশক্তির মতই চিন্তার কসরত দেখিয়েছেন।

বিবরণের স্ববিরোধিতা ও অসম্ভাব্যতা

চারটি গসপেলের প্রত্যেকটিতে এমন অনেক ঘটনার বিবরণ আছে, যা হয়ত একটি মাত্র, কিংবা কয়েকটি, কিংবা সকল গসপেলেই আছে। এরূপ কোন ঘটনার বিবরণ যখন একটিমাত্র গসপেলে পাওয়া যায়, তখন কিছু গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। কখনও দেখা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা হয়ত কেবলমাত্র একখানি গসপেলে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যিশুর পুনরুত্থানের দিন স্বর্গে আরোহণের কথা বলা যেতে পারে। অন্যত্র, বিভিন্ন ঘটনা দুই বা ততোধিক গসপেলে খুবই ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। খৃষ্টানগণ সাধারণত এ সকল স্ববিরোধিতা উপেক্ষা করে থাকেন; কিন্তু একাধিক গসপেলের মধ্যে এ পার্থক্য যদি কখনও তাঁরা আবিষ্কার করেন, তাহলে সত্যিই তাঁরা বিস্মিত হয়ে যান। তাঁদের এ বিস্ময়ের কারণ হচ্ছে এই যে, দীর্ঘদিন যাবত

তাঁদের এ আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, নিউ টেস্টামেন্টের লেখকগণ যে সকল ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার প্রত্যেকটি তাঁরা নিজ চোখে দেখেছেন।

এ জাতীয় অসম্ভাব্যতা ও স্ববিরোধিতার কিছু কিছু ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যিশুর শেষ বয়সের ঘটনায় এবং বিশেষত তাঁর নির্যাতন ভোগের পরবর্তী ঘটনাবলীতেই বর্ণনার পার্থক্য এবং স্ববিরোধিতার নজীর বেশী পাওয়া যায়।

নির্যাতনের বিবরণ

ফাদার রোজেট নিজেই লক্ষ্য করেছেন যে, পাসওভারের ঘটনাটি (মিসরের দাসত্ব থেকে ইহুদীদের মুক্তিলাভের স্মারক উৎসব) শিষ্যদের সঙ্গে যিশুর শেষ ভোজের প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন গসপেলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জন বলেছেন যে, শেষ ভোজ "পাসওভার উৎসবের আগে" অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু অপর তিনজন ইভানজেলিস্ট বলেছেন যে, ভোজটি ঐ উৎসব চলাকালেই হয়েছে। এ পার্থক্যের ফলে একটি স্পষ্ট অসম্ভাব্যতা দেখা দিয়েছে- পাসওভার উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কের পার্থক্যের কারণে খোদ ভোজের ব্যাপারটিই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইহুদী ইতিহাসে পাসওভারের গুরুত্ব এবং খৃষ্টান ইতিহাসে শিষ্যদের কাছ থেকে যিশুর শেষ বিদায় গ্রহণকালীন ভোজের গুরুত্ব সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিফহাফ আছেন, তাঁদের পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কিভাবে সম্ভব যে, ইভানজেলিস্টগণ ঐ ঘটনা দুটির পরম্পরা বিলকুল ভুলে গিয়েছেন?

একইভাবে প্যাশনের (যিশুর নির্যাতিত ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা) বর্ণনা এক একজন ইভানজেলিস্ট একেক ভাবে দিয়েছেন। বিশেষত জনের বর্ণনা অপর তিন জনের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তাছাড়া জন শেষ ভোজ ও প্যাশনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা খুবই দীর্ঘ- মার্ক ও লুকের বর্ণনার প্রায় দ্বিগুণ এবং মথির বর্ণনার প্রায় দেড় গুণ। জনের গসপেলে চার অধ্যায় (১৪-১৭) ব্যাপী শিষ্যদের প্রতি যিশুর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা আছে। এ বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, তিনি তাঁর শেষ উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর শেষ ধর্মীয় ওছিয়ত দিয়েছেন। কিন্তু অপর তিনখানি গসপেলে এ বক্তৃতার চিহ্নমাত্রও নেই। পক্ষান্তরে মথি, লুক ও মার্ক গেথসিমেন বাগানে যিশুর প্রার্থনার যে বিবরণ দিয়েছেন, জন তার উল্লেখ মাত্রও করেননি।

জনের গ্রন্থে ইউকারিস্টের বিবরণ নেই

জনের গ্রন্থে প্যাশনের বিবরণ পড়তে গিয়ে যে বিষয়টি পাঠকের কাছে সবচেয়ে বড় আকারে ধরা পড়ে, তা হচ্ছে এই যে, তিনি যিশু ও তাঁর শিষ্যদের শেষ ভোজকালীন

ইউকারিস্ট (পবিত্র রুটি ও মদ খেয়ে যিশুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া) অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখই করেননি।

শেষ ভোজের অংকিত চিত্র সম্পর্কে অবহিত নন এমন খৃষ্টান সম্ভবত একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐ ছবিতে দেখা যায় যিশু শেষ বারের মত তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে এক টেবিলে বসেছেন। দুনিয়ার প্রায় সকল খ্যাতনামা শিল্পীই এ ছবিটি এঁকেছেন এবং তাতে দেখা যায় যে, জন যিশুর পাশেই বসে আছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এ জনকেই আমরা ঐ নামে প্রচলিত গসপেলের লেখক বলে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত।

অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও একথা সত্য যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই জনকে চতুর্থ গসপেলের লেখক বলে মনে করেন না। এবং এ গসপেলে ইউকারিস্টের কোন উল্লেখ নেই। অথচ রুটি ও মদ পবিত্র হয়ে যিশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হওয়ার ঐ ঘটনা খৃষ্টান উপাসনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হলেও অন্যান্য ইভানজেলিস্টগণ এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু জন এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। চারজনের বর্ণনায় কেবলমাত্র দুটি বিষয়ে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়- পিটারের অস্বীকৃতি এবং একজন হাওয়ারির বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী (জুডাস ইসকারিয়টের নাম কেবলমাত্র মথি ও জন উল্লেখ করেছেন)। আর যিশু যে ঐ ভোজের আগে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছেন, তা একমাত্র জনের বর্ণনাতেই পাওয়া যায়।

কিন্তু জনের গ্রন্থে ঐ ইউকারিস্টের উল্লেখ না থাকার কারণ কি? নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে যে জবাবটি প্রথম মনে আসে তা হচ্ছে এই যে, অপর তিনখানি গ্রন্থের কাহিনী যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে জনের গ্রন্থের ঐ অংশটি সম্ভবত হারিয়ে গেছে। কিন্তু খৃষ্টান ভাষ্যকারগণ এ রূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি। তাঁদের কিছু অভিমত এ প্রসঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

এ.ট্রাইকট তার দি লিটল ডিকশনারী অব দি নিউ টেস্টামেন্ট নামক গ্রন্থে "লাস্ট সাফার" শিরোনামে বলেছেন- "বারোজন শিষ্যের সঙ্গে যিশু যে শেষ খানা খেয়েছিলেন এবং ঐ সময় তিনি ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন প্রথম তিনটি গসপেলে (মথি, মার্ক ও লুক) এ বিষয়ে বর্ণনা আছে এবং চতুর্থ গসপেলে (জন) বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।" কিন্তু "ইউকারিস্ট" শিরোনামে তিনি লিখেছেন- "প্রথম তিনখানি গসপেলে এ অনুষ্ঠান প্রবর্তনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে; এটা নবীর ধর্মীয় শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যিশুর 'জীবনের রুটি' বিষয়ক বক্তৃতার বিবরণ প্রসঙ্গে জন (৬, ৩২-৫৮) ঐ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আরও অনেক তথ্য ও বিবরণ যোগ করেছেন।" অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, জন যে ইউকারিস্ট প্রবর্তনের কোন বর্ণনাই দেননি, এ কথা তিনি আদৌ উল্লেখ করেননি। তিনি অনেক তথ্য ও বিবরণের যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে ইউকারিস্ট প্রবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই; কারণ জন মূলত শিষ্যদের পা ধুয়ে দেয়ার ঘটনাটিই বর্ণনা করেছেন। ভাষ্যকার ট্রাইকট 'জীবনের রুটি' প্রসঙ্গে যে উল্লেখ করেছেন, তা

একটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। শেষ ভোজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মূসার নেতৃত্বে মিসর থেকে পালিয়ে আসার পর ইহুদীগণ বিরান ময়দানে অবস্থানের সময় আল্লার তরফ থেকে প্রতিদিন মান্না নামের যে খানা পেত, যিশু তাঁর বক্তৃতায় সে কথা উল্লেখ করেছিলেন মাত্র এবং একমাত্র জনের গ্রন্থেই এ উল্লেখের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রুটির কথা বলতে গিয়ে যিশু প্রসঙ্গত ইউকারিস্টের যে উল্লেখ করেন, জন তাঁর পরবর্তী অনুচ্ছেদে তাও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অপর তিনখানি গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অপর তিনজন যা বলেছেন সে সম্পর্কে জন কিছু বলেননি; আবার জন যা বলেছেন (যিশুর কথিত ভবিষ্যদ্বাণী) সে সম্পর্কে তাঁরাও কিছু বলেননি। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি!

নিউ টেস্টামেন্ট বাইবেলের একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন-এর ভাষ্যকারগণ জনের গ্রন্থে ইউকারিস্ট সম্পর্কে বিবরণ না থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন- "জনসাধারণ ত প্রাচীন ইসরায়েলের কিংবদন্তি বা রেওয়াজ সম্পর্কে তেমন আগ্রহশীল নন। সম্ভবত এ কারণেই তিনি ইউকারিস্ট প্রবর্তনের ঘটনাটি বর্ণনা করেননি।" এ যুক্তি কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? জন ইহুদীদের প্রাচীন রেওয়াজে আগ্রহী না হতে পারেন, কিন্তু নতুন খৃষ্টান ধর্মের অমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান তিনি কিভাবে উপেক্ষা করতে পারেন?

খৃষ্টান বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে এতই বিব্রতবোধ করে থাকেন যে, জনের রচনার মধ্যে তাঁরা যিশুর জীবনের এমন একটি ঘটনা আবিষ্কার করতে চান, যেখানে ইউকারিস্টের অনুরূপ কোন ঘটনার বিবরণ বা ইশারা পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ও কুলম্যানের কথা বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'দি নিউ টেস্টামেন্ট' নামক গ্রন্থে বলেছেন- "পানিকে মদে রূপান্তরিত করা এবং পাঁচখানি রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে আহার করানোর ঘটনার মধ্যে শেষ ভোজের তথা ইউকারিস্ট অনুষ্ঠানের আগাম ইশারা আছে।" স্মরণ করা যেতে পারে যে, কানা নামক স্থানে একটি শাদীর মজলিসে মদের ঘাটতি দেখা দিলে যিশু পানিকে মদে রূপান্তরিত করেন। জন তাঁর গ্রন্থে (২ ১-১২) এ ঘটনাটি যিশুর প্রথম মুজেজা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, এ চারজন ইভানজেলিস্টের মধ্যে একমাত্র তিনিই এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। পাঁচখানি যবের রুটি অলৌকিক ভাবে সংখ্যায় এত বেশী হয়েছিল যে, পাঁচ হাজার লোকের আহার অনায়াসে হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা দুটি বর্ণনার সময় জন কোন বিশেষ মন্তব্য করেননি এবং আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ যে অনুরূপ ঘটনায় তার আভাষ পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন, তাকে বড়জোর তাঁদের কল্পনাশক্তির অস্বাভাবিক বিস্তার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কুলম্যান ঐ ধরনের যুক্তি আরও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যিশু যে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও একজন অন্ধকে আরোগ্য করেন, তার মধ্যে "ব্যাপটিজমের ভবিষ্যদ্বাণী

আছে" এবং যিশুর ইন্তেকালের পর "তাঁর দেহের এক পাশ থেকে যে পানি ও রক্ত বেরিয়েছিল, তার মধ্যে ব্যাপটিজম ও ইউকারিস্ট একই সূত্রে গ্রথিত হওয়ার প্রমাণ আছে।" এ ধরনের যুক্তি সম্পর্কে আর কি মন্তব্য করা যেতে পারে?

ফাদার রোজেট তাঁর 'ইনিশিয়েশন টু দি গসপেল' নামক গ্রন্থে অসকার কুলম্যানের আর একটি অদ্ভুত যুক্তি এভাবে বর্ণনা করেছেন- "অসকার কুলম্যানের মত কোন কোন ধর্মবিদ শেষ ভোজের পূর্বে (যিশু কর্তৃক শিষ্যদের) পা ধুয়ে দেয়ার ঘটনাকে ইউকারিস্ট প্রবর্তনের প্রতীক রূপে গণ্য করে থাকেন।"

জনের গ্রন্থে ইউকারিস্টের উল্লেখ না থাকার ব্যাপারটি সাধারণ খৃষ্টানদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ধর্মবিদগণ যে কোন স্তরে নেমে গিয়ে কি সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তা লক্ষ্য করলে সত্যিই অবাক হতে হয়!

মৃত্যুর পর যিশুর হাজির হওয়া

মথির গ্রন্থে যিশুর মৃত্যুর সময় একটি কথিত অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কল্পনাশক্তির যে অবাধ বিস্তার করা হয়েছে, উদাহরণ হিসাবে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যিশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে চারজন গসপেল লেখক চার রকমের, অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী বিবরণ দিয়েছেন। ফাদার রোজেট তাঁর 'ইনিশিয়েশন টু দি গসপেল' গ্রন্থের ১৮২ পৃষ্ঠায় এ পরস্পর বিরোধী এবং এমন কি হাস্যকর বিবরণের কিছু নজীর উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন- "যে সকল মহিলা কবরে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা প্রথম তিনখানি গসপেলে তিন রকমের দেয়া আছে। জনের গসপেলে কেবল একজন মহিলার কথা বলা হয়েছে, এবং তিনি হচ্ছেন মেরি ম্যাগডালেন। কিন্তু তিনি আবার বহুবচনে কথা বলেছেন- 'তাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে, তা আমরা জানি না'- সুতরাং মনে হয় তিনি একা ছিলেন না। মথির গ্রন্থে একজন ফেরেশতা মহিলাদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, তারা গ্যালিলিতে যিশুর দেখা পাবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যিশু তাঁর কবরের পাশেই তাঁদের দেখা দেন। লুক সম্ভবত এ স্ববিরোধিতা অনুমান করে তাঁর নিজের গ্রন্থে বিবরণটি একটু বদলে দেন। ফেরেশতা বললেন- 'গ্যালিলিতে থাকার সময় তিনি আপনাদের কিভাবে বলেছিলেন তা স্মরণ করুন...। প্রকৃতপক্ষে লুক যিশুর তিনবার হাজির হওয়ার কথা বলেছেন। জনও তিনবারের কথা বলেছেন- দুবার জেরুসালেমে একটি উপরতলার কামরায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে এবং একবার গ্যালিলি উপসাগরের তীরে। মথি গ্যালিলিতে মাত্র একবার হাজির হওয়ার কথা বলেছেন।"

ফাদার রোজেট তাঁর এ পরীক্ষা থেকে মার্কের সংশ্লিষ্ট বিবরণ বাদ দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, ঐ অংশটি "সম্ভবত অন্য কারও রচনা।"

ঐ সকল তথ্য থেকে প্রমানিত হয় যে, যিশু একত্রে পাঁচ হাজারেরও বেশী লোকের সঙ্গে দেখা দিয়েছেন, জেমসের সঙ্গে দেখা দিয়েছেন, সকল হাওয়ারির সঙ্গে দেখা দিয়েছেন এবং পলের নিজের সঙ্গেও দেখা দিয়েছেন বলে করিন্থিয়ানদের নিকট লিখিত পলের প্রথম চিঠিতে (১৫, ৫-৭) যে উল্লেখ আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

অবস্থা যখন এই, তখন তাজ্জবের কথা হচ্ছে এই যে, ফাদার রোজেট ঐ একই গ্রন্থে যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে কোন কোন রচনায় বালসুলভ কল্পনার সাড়ম্বর বর্ণনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অথচ এ মন্তব্য মথি ও পল সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য; কারণ ঐ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য অন্যান্য হাওয়ারিদের বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

তাছাড়া যিশুর পলের সঙ্গে দেখা দেওয়া সম্পর্কে লুক 'হাওয়ারিদের তৎপরতায় (এক্টস অব এপোসলস) যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সংগে ঐ বিষয়ে পলের নিজের বর্ণনার যথেষ্ট গরমিল রয়েছে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে ফাদার কানেনগিসার তাঁর 'ফেথ ইন দি রিজারেকশন, রিজারেকশন অব ফেথ' (১৯৭৪) নামক গ্রন্থে জোর দিয়ে বলেছেন যে, পল যিশুর পুনরুত্থানের "একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী এবং নিউ টেস্টামেন্টের অপর কোন লেখক ঐ সম্মান দাবী করতে পারেন না এবং তাঁর রচনার মারফত তার কথা সরাসরি আমাদের কাছে এসেছে"। অথচ পুনরুজ্জীবিত যিশুর সংগে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে দেখা হয়েছে বলে তিনি কখনও উল্লেখ করেননি। অবশ্য "তিনবার খুবই সতর্কতার সংগে তিনি বিষয়টির অবতারণা করেছেন বটে, কিন্তু কখনও কোন বর্ণনা দেননি।"

যে পল প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্ত্বেও পরিষ্কার করে কিছু বলেননি, তার সংগে গসপেলের বর্ণনার পরস্পর বিরোধিতা স্বতই প্রকট ও প্রকাশিত।

অসকার কুলম্যানও তাঁর 'দি নিউ টেস্টামেন্ট' নামক গ্রন্থে লুক ও মথির বর্ণনার মধ্যে বিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন। লুক বলেছেন, যিশু জুডিয়ায় দেখা দেন; আর মথি বলেছেন, গ্যালিলিতে।

এ প্রসঙ্গে জন ও লুকের বর্ণনার পরস্পর বিরোধিতাও লক্ষ্য করা যেতে পারে। জন বলেছেন (২১, ১-১৪) যে, যিশু কবর থেকে উঠে এসে তিবারিয়াস সাগর তীরে জেলেদের সংগে দেখা দেন; ফলে তারা এত বেশী মাছ ধরতে সক্ষম হয় যে, তা বয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে। এ কাহিনী আসলে ঐ একই স্থানে অলৌকিকভাবে মাছ ধরার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং লুক এ কাহিনীটি (৫,১-১১) যিশুর জীবিত কালের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

যিশুর এ দেখা দেয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ফাদার রোজেট তাঁর গ্রন্থে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, ঘটনার "অসংলগ্ন, অস্পষ্ট ও বিশৃংখল চরিত্র বরং বিশ্বাসই উৎপন্ন করে"। কারণ ঐ সকল তথ্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে,

ইভানজেলিস্টগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন যোগসাজশ ছিল না; নইলে তাঁরা সকলে মিলে অতি অবশ্যই একটি মাত্র বর্ণনা দিতেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যোগসাজশ হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল কি? এ যুক্তি সত্যিই অদ্ভুত! আসলে তাঁরা হয়ত তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রচলিত কিংবদন্তিই লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং সকল কিংবদন্তিতেই (তাঁদের অজ্ঞাতে) কল্পনার বিস্তার ছিল। ঘটনার বর্ণনায় অত স্ববিরোধিতা ও অসম্ভাব্যতা থাকার কারণে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

যিশুর স্বর্গারোহণ

স্ববিরোধিতা আরও আছে, বিবরণের একেবারে শেষ পর্যন্তই আছে। কারণ জন বা মথি যিশুর স্বর্গারোহণের কথা আদৌ উল্লেখ করেননি, উল্লেখ করেছেন কেবল মার্ক ও লুক।

মার্ক বলেছেন (১৬, ১৯), যিশু "উর্ধে স্বর্গে উত্থিত হইলেন এবং ঈশ্বরের ডানপাশে আসন গ্রহণ করিলেন", কিন্তু তিনি যিশুর কবর থেকে বেরিয়ে আসার যে ঘটনা বলেছেন, তার কতদিন পর স্বর্গারোহণের ঘটনা ঘটে, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। উল্লেখযোগ্য যে, মার্কের বাইবেলের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে ঐ বাক্যটি আছে। ফাদার রোজেট মনে করেন যে, অনুচ্ছেদটি "জাল", কিন্তু চার্চের মতে বিলকুল সহি।

তারপর লুকের বিবরণ। একমাত্র লুক স্বর্গারোহণের ঘটনার একটি অবিরোধিত বিবরণ দিয়েছেন (২৪, ৫১)। তিনি বলেছেন- "তিনি তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং উর্ধে স্বর্গে নীত হইলেন।" তাঁহাদের বলতে এখানে এগার জন হাওয়ারির কথা বলা হয়েছে, কারণ দ্বাদশ হাওয়ারির জুরাস আগেই ইন্তেকাল করেন। কবর থেকে বেরিয়ে আসা এবং হাওয়ারিদের সঙ্গে দেখা দেয়ার বিবরণের পর স্বর্গারোহণের কথা বলা হয়েছে; ফলে মনে হয়, কবর থেকে বেরিয়ে আসা এবং স্বর্গে আরোহণের ঘটনা একই দিনে ঘটেছিল। 'হাওয়ারিদের তৎপরতা কিভাবে লুক (সকলে তাকেই লেখক বলে মনে করেন) প্যাশন ও স্বর্গারোহণের মাঝামাঝি সময়ে হাওয়ারিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন- "নির্যাতন ভোগের পর তিনি জীবিত অবস্থায় (যার অনেক প্রমাণ আছে) তাদের সামনে হাজির হন। এভাবে চল্লিশ দিন হাজির হন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলেন (অধ্যায় ১,৩)।"

এ বর্ণনার ভিত্তিতেই ইস্টারের (যিশুর কবর থেকে উত্থিত হওয়ার উৎসব) চল্লিশ দিন পর স্বর্গারোহণের উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ উৎসবের তারিখটি লুকের গসপেলের বর্ণনার সরাসরি বিরোধী। অপর কোন গসপেলে এ তারিখের যৌক্তিকতা অন্য কোন ভাবে দেখানো হয়নি।

এ সামঞ্জস্যহীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল খৃষ্টান মাত্রই এ বিষয়ে বিব্রত বোধ করে

থাকেন। 'একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন' গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, যিশুর মিশনের সঙ্গে এ চল্লিশ দিনের হয়ত কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

তবে যে সকল ভাষ্যকার সবকিছুই ব্যাখ্যা করতে চান এবং সকল অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে চান, তারা সেই বিষয়ে কিছু অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বাইব্লিক্যাল স্কুল অব জেরুসালেম কর্তৃক ১৯৭২ সালে সম্পাদিত 'দি সিনপসিস অব দি ফোর গসপেলস' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খন্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা) এরূপ একটি অদ্ভুত ব্যাখ্যা আছে। সেখানে "স্বর্গারোহন" শব্দটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- "প্রকৃত পক্ষে দৈহিক অর্থে কোন স্বর্গারোহন ঘটেনি, কারণ ঈশ্বর যেমন নিচে থাকেন না, তেমনি উপরেও থাকেন না?" এ মন্তব্যের অর্থ অনুধাবন করা বড়ই মুশকিল। কারণ লুক যদি উর্ধলোকে আরোহণই না বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আসলে কি বুঝিয়েছেন? এ গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে, "এক্টস অব এপোসলস গ্রন্থে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ দিন পর স্বর্গারোহণের ঘটনা ঘটে বলে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি সাহিত্যিক কৌশল আছে; এবং যিশুর দুনিয়ায় হাজির হওয়ার যে পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এ কথা গুরুত্বসহকারে বুঝানোর জন্যই এ কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। লুকের গসপেলে অবশ্য ইস্টার রবিবারের সন্ধ্যায় স্বর্গারোহণের ঘটনা ঘটে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কবর থেকে উত্থিত হওয়ার দিন সকালে শূন্য কবর আবিষ্কৃত হওয়ার পরবর্তী কালীন বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করার সময় লুক দুই ঘটনার মধ্যে কোন বিরতি দেননি। এটাও অতি অবশ্যই একটি সাহিত্যিক কৌশল। যিশুর কবর থেকে উত্থিত হওয়া এবং শিষ্যদের সঙ্গে দেখা দেয়ার মাঝখানে কিছুটা সময় অতিবাহিত হতে দেয়ার জন্যই এ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

এ ব্যাখ্যার অর্থ যে আসলে কি, তা স্পষ্টই বোধগম্য নয়। তবে ভাষ্যকার যে কথার জাল বুনে নিজেই একটি বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন, তা বুঝতে সম্ভবত তেমন অসুবিধে হয় না। ফাদার রোজেট তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেখানে তাঁর নিজের এ সংকট আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি আবার একবার নয়, দুবার স্বর্গারোহণের কথা বলেছেন- যিশুর দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থান ও স্বর্গারোহণ একই ঘটনার দুটি অংশ বটে, কিন্তু শিষ্যদের দৃষ্টিতে তাঁর দেখা হওয়ার ঘটনার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গারোহণের ঘটনা ঘটেনি। চার্চের আমল যাতে শুরু হতে পারে, সেজন্য শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করার পরই তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা দেয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে স্বর্গারোহণ করেন।

যে সকল পাঠক এ সুগভীর যুক্তির (যার কোন কিতাবি বুনিয়াদ নেই) অর্থ বা তাৎপর্য অনুধাবন করতে অক্ষম, তাঁদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে ফাদার রোজেট বলেছেন- "অন্যান্য বহু ঘটনার মত এ ক্ষেত্রেও ধর্মীয় তাৎপর্য উপেক্ষা করে বাইবেলের বর্ণনা

আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হলে সমস্যাটি সমাধানের অযোগ্য বলেই মনে হবে। কোন বাস্তব ঘটনাকে সামঞ্জস্যহীন প্রতীকে প্রকাশ করার ব্যাপার এখানে নেই। এখানে যা আছে তা হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের পার্থিব জীবনের অনুভূতি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যা বুঝতে সক্ষম, ঠিক সেই ধরনের বিষয় ও বস্তুর মারফত ধর্মীয় লেখকগণ রহস্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তাদের এ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আসলে ব্যাখ্যার অযোগ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকারগণ এ ধরনের অর্থহীন বাক্যজাল বিস্তার করে থাকেন। অবশ্য সমর্থনের অযোগ্য কিছু সমর্থন করতে গেলে এছাড়া আর কোন উপায়ও থাকে না।

যিশুর শেষ কথোপকথন ও জনের গসপেলের প্যারাক্লিট

একমাত্র জনই শিষ্যদের সংগে যিশুর শেষ কথোপকথনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। শেষ ভোজের পর এবং যিশুর গ্রেফতার হওয়ার আগে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনা শেষ হয়েছে যিশুর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে। জনের গসপেলের চারটি অধ্যায় (১৪-১৭) ব্যাপী এ ঘটনা ও বক্তৃতার বিবরণ আছে। অপর কোন গসপেলে অবশ্য এ বিষয়ে কোন উল্লেখমাত্রও নেই। ঐ চারটি অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে, খৃষ্টানদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত। শাগরেদদের কাছ থেকে একজন মহাসম্মানিত ওস্তাদের বিদায় গ্রহণের উপযোগী ভাবগম্ভীর ও পবিত্রতার পরিবেশে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

অথচ যিশুর আধ্যাত্মিকতার প্রমাণ সম্বলিত এ মর্মস্পর্শী বিদায় দৃশ্যটি মথি মার্ক ও লুকের গ্রন্থে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ অনুপস্থিতির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কি হতে পারে? প্রশ্ন করা যেতে পারে- আদিতে ঐ প্রথম তিনখানি গসপেলে কি ঐ এবারত ছিল? পরে কি তা গায়েব করা হয়েছে? কেন? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। জবাব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বিষয়টি সত্যিই রহস্যাবৃত এবং দূর্জ্ঞেয়।

এ ঘটনার প্রধান প্রধান বিষয়, যা যিশুর বক্তৃতায় আছে, তা হচ্ছে যিশু বর্ণিত মানুষের ভবিষ্যত অবস্থা, শিষ্যদের সমাবেশে তাঁর বক্তৃতা করার সবিশেষ আগ্রহ, তাঁদের মারফত সমগ্র মানব জাতির সামনে সত্য উপস্থাপিত করা এবং তাঁদের দুনিয়া ত্যাগের পর মানুষকে অতি অবশ্যই যে পথ প্রদর্শকের অনুসরণ করতে হবে, তাঁর পরিচয় তুলে ধরা এবং এ ব্যাপারে তাঁর নিজের নির্দেশ ও সুপারিশ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া। জনের গসপেলে ঐ পথ প্রদর্শককে গ্রীক ভাষায় "প্যারাক্লিটোস" বলা হয়েছে; ইংরেজী ভাষায় বলা হয়ে থাকে "প্যারাক্লিট"। ঐ গসপেলের সংশ্লিষ্ট মূল অনুচ্ছেদগুলি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

"তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর একজন সহায়ক (প্যারাক্লিট) তোমাদিগকে দিবেন।" (১৪, ১৫-১৬)।

কিন্তু প্যারাক্লিট শব্দের অর্থ কি? জনের গসপেলের যে এবারত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাতে শব্দটির ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছেঃ

"কিন্তু সেই সহায়ক, পবিত্র আত্মা যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (১৪-২৬)।

"তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।" (১৫-২৬)।

"সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না; বরং যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তিনি তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।" (১৬, ১৩-১৪)।

জনের চারটি অধ্যায় (১৪-১৭) এখানে পুরোপুরি উধৃত করা হয়নি। তবে যেটুকু উধৃত করা হয়েছে তাতে মূল বক্তব্য সঠিকভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, ইবারতে 'প্যারাক্লিট' 'পবিত্র আত্মা' একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি সহজে চোখে পড়ার মত নয়। বিশেষত এ কারণে যে, ইবারতের উপশিরোনামগুলিই সাধারণত তরজমায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এবং ভাষ্যকাররা তাঁদের রচনায় প্রাচীন ভাবধারাটিই তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকেন। তবুও যদি অর্থ উপলব্ধি করতে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে তাহলে তিনি অপরাপর বিশেষজ্ঞের যে কোন ব্যাখ্যা পড়ে নিতে পারেন। এ.ট্রাইকট তাঁর "লিটল ডিকশনারি অব দি নিউ টেস্টামেন্ট" গ্রন্থে প্যারাক্লিট শব্দটির ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেনঃ

"এ শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে তরজমা করা এবং একমাত্র জনই নিউ টেস্টামেন্টে এ নাম বা উপাধিটি ব্যবহার করেছেন। শেষ ভোজের পর দেয়া যিশুর বক্তৃতার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন, সেখানে তিনি চারবার এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন (১৪, ১৬ ও ২৬; ১৫, ২৬ এবং ১৬, ৭)। আর একবার ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রথম পত্রে (২, ১)। গসপেলে শব্দটি পবিত্র আত্মার প্রতি এবং পত্রে যিশুর প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্যারাক্লিট শব্দটি খৃষ্টের জন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থ উকিল, পক্ষ সমর্থনকারী, সুপারিশকারী, মধ্যস্থতাকারী। যিশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, পিতা ও পুত্র আত্মা পাঠিয়ে দেবেন। পুত্র তাঁর মর-জীবনে তাঁর শিষ্যদের উপকারে যে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন, ঐ আত্মা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সেই ভূমিকা পালন করবেন। তিনি যিশুর বিকল্প হয়ে প্যারাক্লিট বা শক্তিমান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মধ্যস্থতা করবেন।"

এ ভাষ্যকারের মতে তাহলে দেখা যাচ্ছে, যিশুর দুনিয়া ত্যাগের পর এ পবিত্র আত্মাই মানুষের শেষ পথ প্রদর্শক হবেন। এ অভিমত কি জনের ইবারতের সঙ্গে মিলে যায়? এ প্রশ্ন উত্থাপন করার প্রয়োজন আছে, কেননা কারণ থেকে ফলাফল আসে। এ যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করা হলে দেখা যায় যে, নিচের কথাগুলি পবিত্র আত্মার প্রসঙ্গে ঠিক মানায় না- "তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, বরং যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তিনি তোমাদিগকে জানাইবেন।" পবিত্র আত্মার কথা বলা এবং শুনতে পারার ক্ষমতা থাকার ব্যাপারটি অকল্পনীয়। যুক্তি ও সংহতির স্বার্থে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়া উচিত, কিন্তু আমার জানা মতে কোন ভাষ্যকারই এ প্রশ্নটি উত্থাপন বা বিবেচনা করেননি।

এ বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভের জন্য মূল গ্রীক ইবারতটি দেখে নেয়া প্রয়োজন। কারণ সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে, জন অন্য কোন ভাষাতে নয়, গ্রীক ভাষাতেই লিখেছিলেন। আমি 'নোভাম টেস্টামেন্টাম গ্রায়েস" (নসল এন্ড এন্ডাল, ইউনাইটেড বাইবেলস সোসাইটি' লন্ডন, ১৯৭১) নামক গ্রীক ভাষার বাইবেলখানি পড়ে দেখেছি।

ইবারতের সমালোচনা করতে গেলে প্রথমেই বিভিন্নতা খুঁজে দেখতে হয়। জনের গসপেলের যতগুলি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে একমাত্র সুরিয়ানি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত পালিম্পসেস্ট সংস্করণের ১৪, ২৬ অনুচ্ছেদে এমন একটি বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়, যার ফলে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। (এ পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত হয় এবং ১৮১২ সালে এগনেস এস লুইস কর্তৃক সিনাই পাহাড়ে আবিষ্কৃত হয়। প্রথম এবারতের উপরে অপর একটি ইবারত লেখা ছিল, এবং এ দ্বিতীয় ইবারতটি উঠিয়ে ফেলার পর মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। এ কারণে পাণ্ডুলিপিটির নাম পালিম্পসেস্ট রাখা হয়)। এখানে 'পবিত্র আত্মা' বলা হয়নি, সেরেফ আত্মা বলা হয়েছে। নকলনবিশ কি ভুলক্রমে 'পবিত্র' শব্দটি বাদ দিয়েছেন, নাকি পবিত্র আত্মার কথা বলা ও শুনতে পাবার ক্ষমতা থাকার হাস্যকরতা লক্ষ্য করে ইচ্ছাকৃতভাবেই পবিত্র শব্দটি লেখেননি? এছাড়া এ পাণ্ডুলিপিতে আরও কিছু বিভিন্নতা আছে কিন্তু সেগুলি মূলত ব্যাকরণগত এবং অর্থের কোন হেরফের ঘটায়না; ফলে তা নিয়ে আর আলোচনার কোন দরকার নেই। এক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, 'কথা বলা' ও 'শুনতে পাওয়া' ক্রিয়াপদের যে অর্থ এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, জনের গসপেলের অন্যান্য সকল পাণ্ডুলিপিতেও ঠিক সেই অর্থই প্রয়োগ করা হয়েছে।

'শুনতে পাওয়া' ক্রিয়াপদটি গ্রীক ভাষার "আকৌও' ক্রিয়াপদের তরজমা, অর্থ 'শব্দ অনুধাবন করা' এ শব্দ থেকেই 'একৌস্টিকস' (ধ্বনিবিজ্ঞান) শব্দটি এসেছে।

'কথা বলা' ক্রিয়াপদটি গ্রীক ভাষার 'লালেও' ক্রিয়াপদের তরজমা; সাধারণ অর্থ শব্দ বের করা, বিশেষ অর্থ কথা বলা। গসপেলের গ্রীক ইবারতে এ শব্দটি ঘনঘন ব্যবহার করা হয়েছে এবং ধর্ম প্রচারের সময় যিশু যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

করেছেন, তখনই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে কথা বলার সময় ঐ বিশেষ শব্দটির প্রয়োগ হয় না, বরং সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কথা বলার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়। গ্রীক ভাষায় নিতান্ত নৈমিত্তিক অর্থেই শব্দ নির্গত হবার ক্ষেত্রে ঐ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সুতরাং যে সকল প্রাণীর কথা বলার ও শুনতে পাবার উপযোগী ইন্দ্রিয় আছে, কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই 'আকৌও' ও 'লালেও' ক্রিয়াপদ দুটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োগ করা যেতে পারে না।

এ কারণে জনের গসপেলের গ্রীক ভাষার পাণ্ডুলিপির যে অনুচ্ছেদে ১৪, ২৬) পবিত্র আত্মা শব্দ দুটি রয়েছে, তা আদৌ বোধগম্য নয়- "কিন্তু সেই সহায়ক, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দেবেন" ইত্যাদি। জনের গসপেলের একমাত্র এ অনুচ্ছেদেই প্যারাক্লিট (সহায়ক) ও হোলি স্পিরিট (পবিত্র আত্মা) একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

পবিত্র আত্মা শব্দ দুটি বাদ দিলে সমগ্র ইবারতের অর্থ পরিষ্কার ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। জন অবশ্য তাঁর প্রথম পত্রে এভাবে বোধগম্য কথাই বলেছেন। যেখানে তিনি প্যারাক্লিট বলতে যিশুকে বুঝিয়েছেন এবং এ প্যারাক্লিট হচ্ছেন ঈশ্বরের পক্ষের মধ্যস্থতাকারী (গসপেলের বহু তরজমা ও ভাষ্যে, বিশেষত প্রাচীন তরজমা ও ভাষ্যে প্যারাক্লিট শব্দটি 'সান্ত্বনা দানকারী' বলে তরজমা করা হয়েছে; কিন্তু এ তরজমা সম্পূর্ণ ভুল)। জনের মতে, যিশু বলেন (১৪, ১৬) -"আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করব এবং তিনি আর একজন প্যারাক্লিট তোমাদের দিবেন," অর্থাৎ তিনি বলছেন যে, এ দুনিয়ার জীবনে তিনি নিজে যেমন মানুষের জন্য ঈশ্বরের পক্ষের মধ্যস্থতাকারী ছিলেন, ঠিক সেইরূপ "আর একজন" মধ্যস্থতাকারী পাঠিয়ে দেয়া হবে।

সুতরাং যুক্তি ও সঙ্গতির আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, জন বর্ণিত প্যারাক্লিট যিশুর মতই একজন মানুষ, এবং তাঁর কথা বলা ও শুনতে পাবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং যিশু যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর পরে আর একজন মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাবেন; এবং তিনি জন বর্ণিত ভূমিকা পালন করবেন, অর্থাৎ নবী হিসেবে তিনি আল্লার কথা শুনতে পাবেন এবং সেই কথা মানুষকে জানিয়ে দেবেন। জনের ব্যবহৃত শব্দগুলির যথাযথ অর্থ গ্রহণ করা হলে এ হচ্ছে তাঁর এবারতের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।

বর্তমানকালের এবারতে যে 'পবিত্র আত্মা' শব্দ দুটি দেখতে পাওয়া যায়, তা সম্ভবত পরে উদ্দেশমূলকভাবেই যোগ করা হয়েছে। মূল অর্থে যে যিশুর পর আর একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা বদল করার মতলবেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ, খৃষ্টীয় চার্চ যখন গঠিত হয়, তখন তার অন্যতম শিক্ষা ছিল এই যে, যিশুই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।

উপসংহার

চারখানি গসপেল ঐতিহাসিকভাবে নির্ভুল, আদি ও অকৃত্রিম, এবং যিশু যা করেছিলেন এবং যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা ঐ গসপেলের মারফত বিশ্বস্তভাবে বাহিত হয়ে এসেছে। খৃষ্টানদের এ প্রাচীনপন্থী মতবাদ ভ্যাটিক্যানের সাম্প্রতিকতম কাউন্সিলেও সমর্থিত হয়েছে। অথচ এ গ্রন্থে যে সকল তথ্য লিবিপদ্ধ করা হয়েছে এবং বিশিষ্ট খৃষ্টান ধর্মবিদদের যে সকল অভিমত উধৃত করা হয়েছে, তাতে নির্ভুলতা ও অকৃত্রিমতার ঐ দাবী সরাসরি বাতিল হয়ে যায়।

এ বিষয়ে কয়েক প্রকারের যুক্তি দেখানো যেতে পারে।

একই বিষয়ে একাধিক গসপেলের বিবরণ পরস্পর বিরোধী এবং পরস্পর বিরোধী দুটি ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া আধুনিক জ্ঞান থেকে পাওয়া বাস্তব তথ্যের বিরোধী কোন দাবী বা অসম্ভাব্যতাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে গসপেলে দেয়া যিশুর দুটি নসবনামা এবং তাতে বর্ণিত অসত্য বিবরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সকল স্ববিরোধিতা, অসম্ভাব্যতা ও অসমতা বহু খৃষ্টানেরই নজরে পড়ে না। ঘটনাক্রমে কখনও পড়লে তারা বিস্মিত হন; কারণ, পাদ্রী ও ভাষ্যকারদের কাল্পনিক রহস্যময় ও কাব্যিক ব্যাখ্যা পড়ে তাঁদের মন-মগজ আগে থেকে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোন কোন বিষয় 'অসুবিধাজনক' বলে অভিহিত করে ভাষ্যকারগণ তা ব্যাখ্যা করার জন্য যে অনাবশ্যক বাক্যজাল বিস্তার করে থাকেন, তার কয়েকটি উদাহরণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া গসপেলে এমন কিছু অনুচ্ছেদ আছে, যা জাল বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে; কিন্তু চার্চ সেগুলি সহীহ বলে ঘোষণা করে থাকে।

ফাদার কানেনগিসারের মতে, এবারতের আধুনিক সমালোচনার ফলে এমন সব তথ্য বেরিয়ে এসেছে, যা 'বাইবেলের ধর্মীয় বর্ণনা পদ্ধতির জন্য বিপ্লবাত্মক', এবং তার ফলে গসপেলে লিখিত যিশু সম্পর্কিত তথ্য ও ঘটনাবলী এখন আর আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই', কারণ ঐ সকল বিবরণ বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ সামনে রেখে রচিত হয়েছে, অন্য কথায়, ঐগুলি 'যুদ্ধকালীন রচনা'। আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে ইহুদী- খৃষ্টবাদের ইতিহাস এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিদ্বেষ ও বৈরিতার কথা বিস্তারিতভাবে জানা গেছে। সেই পটভূমিকায় রচিত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ তাই আধুনিক পাঠকের কাছে রীতিমত বিব্রতকর। যদিও বহু খৃষ্টান এখনও মনে করেন যে, গসপেল লেখক ইভানজেলিস্টগণ তাঁদের বর্ণিত ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন, তথাপি ঐ ধারণা এখন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। জেরুসালেমের বাইবেল স্কুলে যে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে (ফাদার বেনয় ও ফাদার বয়েসমার্ড), তাতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, গসপেলগুলি কয়েকবার লিখিত; পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়েছে। তাছাড়া, ফাদারদ্বয় পাঠকদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন যে, গসপেলে তাঁরা

যেন "যিশুর কোন উক্তি সঠিক বা সরাসরি ভাবে পাবার আশা না করেন।"

তবে গসপেলগুলির যে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যিশু সম্পর্কিত বর্ণনার মারফত আমরা এ গ্রন্থগুলি থেকে লেখকদের পরিচয় ও চরিত্র জানতে পারি, তাঁরা যে নিজ নিজ আদি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রবাদ ও কিংবদন্তির মুখপাত্র ছিলেন, সেকথা জানতে পারি, এবং বিশেষত পলের সঙ্গে ইহুদী-খৃষ্ট সম্প্রদায়ের বিবাদ ও বিরোধের কথা জানতে পারি। কার্ডিনাল ডানিয়েলোর গ্রন্থ এ সকল বিষয়ে একখানি নির্ভরযোগ্য কোষগ্রন্থ।

কোন কোন ইভানজেলিস্ট যে তাঁর নিজস্ব মতবাদের সমর্থনে যিশুর জীবনের কোন কোন ঘটনা বিকৃত করেছেন, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে? কোন কোন ঘটনা যে তাঁরা বাদ দিয়েছেন, তাতেই বা বিস্মিত হবার কি আছে? আর বর্ণিত কোন কোন ঘটনা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে?

এ সকল প্রশ্ন থেকে গসপেলের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বর্ণনামূলক কবিতার তুলনা করার জন্য আমাদের মনে একটি স্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। 'সং অব রোলান্ড' (চ্যানসন দ্য রোলান্ড) নামক কবিতার সঙ্গে তুলনাটি বোধহয় সবচেয়ে নিখুঁত হতে পারে। এ কবিতায় একটি সত্য ঘটনা কল্পনার আলোকে বর্ণিত হয়েছে এবং এ জাতীয় কবিতার মধ্যে এ কবিতাটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, রোলান্ড রাজা শার্লিমেনের পশ্চাদরক্ষী বাহিনী পরিচালনার সময় আকস্মিকভাবে রণক্ষেত্রে গিরিপথে শত্রুপক্ষের হাতে আক্রান্ত হন। ঐতিহাসিক মতে ঘটনাটি ৭৭৮ সালের ১৫ই আগস্ট ঘটেছিল (এগিনহার্ড), এবং তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না। কিন্তু কাব্যের বর্ণনায় এ সামান্য ঘটনাটিকে ধর্মযুদ্ধের একটি গৌরবময় অধ্যায় এবং রণকৌশলের শ্রেষ্ঠতম নিপুণতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। কবিতায় কল্পনার ব্যাপক বিস্তার আছে বটে, কিন্তু সেই কারণে সত্য ঘটনাটি মিথ্যা হয়ে যায় নি। কারণ, এ কথা সত্য যে, শত্রুদের হামলা থেকে নিজের দেশকে রক্ষার জন্য শার্লিমেনকে বহু যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছিল এবং রোলান্ড সম্পর্কিত ঐ ঘটনাটি ছিল তারই একটি অংশ।

গসপেল সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যেতে পারে। মথির কল্পনাপ্রবণতা, বিভিন্ন গসপেলের পরস্পর বিরোধিতা, অসম্ভাব্যতা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে গরমিল হওয়া, বারবার এবারত বিকৃত হওয়া প্রভৃতি এ কথাই প্রমাণ করে যে, বাইবেলে এমন অনেক অনুচ্ছেদ ও অধ্যায় আছে, যার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে মানুষের কল্পনা। কিন্তু তাই বলে যিশুর মিশন তাতে মিথ্যা হয়ে যায় নি। যিশুর মিশনের ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ আছে তার প্রকারে ও প্রক্রিয়ায়।

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

ভূমিকাঃ

কুরআন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক, কারণ থেকে ফলের যুক্তি ধারায় বিস্ময়কর; বিশেষত যখন দেখা যায় যে, ঐ সম্পর্ক হচ্ছে মিলের, অমিলের নয়। আজকাল অনেকেই মনে করেন যে, ধর্মীয় গ্রন্থের সঙ্গে বিজ্ঞানের ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণার মুকাবিলা একটি গোলকধাঁধা বিশেষ। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, বর্তমান যুগে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই বস্তুতন্ত্রের বেড়াজালে আটক হয়ে আছেন। ধর্মকে তারা কিংবদন্তি ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা হয় উদাসীন থাকেন, আর না হয় সরাসরি ঘৃণা পোষণ করেন। তাছাড়া, পাশ্চাত্যে যখন ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হয়, তখন লোকে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের কথাই উল্লেখ করে থাকে, ইসলামের কথা কেউ কখনও চিন্তাও করে না। আসলে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইসলাম সম্পর্কে এমন ব্যাপক ভুল ধারণা প্রচারিত হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা পাওয়া সেখানে সত্যিই কঠিন।

ইসলাম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন তুলনামূলক আলোচনায় যাবার আগে ইসলামের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, পাশ্চাত্যে এ ধর্মটি অতি অল্পই পরিচিত।

কখনও অজ্ঞানতার কারণে এবং কখনও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে নানাবিধ ভুল উক্তি ও মন্তব্য করা হয়ে থাকে। এ জাতীয় উক্তির মধ্যে তথ্য বিষয়ক উক্তিগুলিই সবচেয়ে মারাত্মক; কারণ, ধারণার ভ্রান্তি হয়ত ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত তথ্যের স্থলে কোন বানোয়াট তথ্য পেশ করা হলে তা ক্ষমার অযোগ্য হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের অনেক জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তি তাঁদের রচনায় এমন সরাসরি মিথ্যাও স্থান দিয়েছেন যে, তা পড়ে রীতিমত বিক্ষুব্ধ হতে হয়। এরূপ একটি উদাহরণ 'ইউনিভার্সালিস এনসাইক্লোপিডিয়া' ষষ্ঠ খণ্ড থেকে উধৃত করছি। 'গসপেল' শিরোনামের আলোচনায় লেখক বাইবেলের সঙ্গে কুরআনের তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন- "কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন করা হয়েছে, বাইবেলের ক্ষেত্রে ইভানজেলিস্টগণ তেমন কোন দাবী করেননি যে, ঈশ্বর অলৌকিকভাবে নবীর কাছে যে আত্মজীবনী বর্ণনা করেছেন, তাই তাঁরা পৌছে দিচ্ছেন মাত্র।" কিন্তু কুরআন তো কোন আত্মজীবনী নয়। লেখক যদি কুরআনের কোন নিকৃষ্টতম তরজমাও নেড়েচেড়ে দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন যে, কুরআন আসলে শিক্ষাদানের গ্রন্থ; পথ প্রদর্শনের গ্রন্থ। কিন্তু তিনি তা করেননি এবং না জেনে না শুনেই তিনি ঐ মিথ্যা উক্তি করেছেন। অথচ তিনি লিয়নের জেসুইট ফ্যাকালটি অব থিউলজির একজন জ্ঞানবান অধ্যাপক! এ ধরনের মিথ্যা উক্তির ফলেই কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই অবশ্য নতুন আশার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, বিভিন্ন ধর্ম এখন আর আগের মত অন্তর্মূখী নেই। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। রোমান ক্যাথলিকরা যে তাঁদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন, এ খবর শুনে সকলেই আশা করি আনন্দিত হবেন। তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূর করা এবং ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য চেষ্টা করছেন।

বিগত কয়েক বছরে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, এ গ্রন্থের ভূমিকায় আমি তা উল্লেখ করেছি, এবং ভ্যাটিক্যানের অফিস ফর নন-ক্রিশ্চিয়ান এফেয়ার্স প্রকাশিত 'ওরিয়েন্টশনস ফর এ ডায়ালগ বিটুইন ক্রিশ্চিয়ানস এন্ড মুসলিমস' নামক একখানি পুস্তিকার কথাও বলেছি। ইসলাম সম্পর্কে গৃহীত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণ আছে বিধায় এ পুস্তিকা একখানি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দলীল। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত উক্ত পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণে "ইসলাম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন এবং আমাদের বিদ্বেষ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখার" আহবান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে- "যে নজরে আমাদের খৃষ্টান ভাইয়েরা দেখে থাকেন, প্রথম পদক্ষেপে তা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এ প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্বেষ ও নিন্দাবাদে বিকৃত যে প্রাচীন ছবি আমরা অতীত কাল থেকে মিরাসী সূত্রে পেয়েছি, তা অপসারণ করতে হবে; এবং মুসলমানদের প্রতি অতীতে আমরা যে অবিচার করেছি, তা স্বীকার করে নিতে হবে। আরও স্বীকার করে নিতে হবে যে, খৃষ্টানী শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্যই এ অবিচারের জন্য দায়ী।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অতীতে এমন এক সময় ছিল, যখন যে কোন আকারে বা প্রকারে ইসলামের বিরোধীতা বা শত্রুতা করা হলে এবং এমন কি তা চার্চের ঘোষিত ও পরিচিত শত্রুদের দ্বারা করা হলেও ক্যাথলিক চার্চের উচ্চতম পর্যায়ের নেতারা তার প্রতি সানন্দে সমর্থন জানাতেন। উদাহরণ স্বরূপ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ধর্মযাজক (পনাটিক) হিসাবে পরিচিত পোপ চতুর্দশ বেনোডিক্টের কথা বলা যেতে পারে। ভলটেয়ার তাঁর রচিত "মুহাম্মদ বা ধর্মান্ধতা" (মুহাম্মদ অর ফ্যানাটিসিজিম, ফরাসি ভাষায় ম্যাহোমেট আওলে ফ্যানাটিসমে, ১৯৪১) নামক একখানি গ্রন্থ পোপের নামে উৎসর্গ করলে তিনি সেজন্য বিনা দ্বিধায় তাকে আশির্বাদ পাঠান অথচ গ্রন্থখানি ছিল অতিশয় নিকৃষ্টমানের, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে পরিপূর্ণ একখানি বিয়োগান্ত নাটক এবং কলম ধরতে সক্ষম ও দুরভিসন্ধি দ্বারা প্রণোদিত যে কোন চতুর ব্যক্তিই যে কোন বিষয়ে এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম। মঞ্চে নাটকটি তেমন সফল হয়নি, কিন্তু তথাপি খৃষ্টান দর্শকরা সানন্দে সমর্থন জানিয়েছে এবং একমাত্র সে কারণে নাটকটি শেষ পর্যন্ত ফরাসী বিয়োগান্ত নাটকের সংকলনের অন্তর্ভূক্ত হয়।

ভ্যাটিক্যানের ঐ পুস্তকটিতে মোট ১৫০ পৃষ্ঠার বিবরণ আছে এবং ইসলাম সম্পর্কে

খৃষ্টানদের প্রাচীন মতবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা হয়েছে।

"আমাদের নিকৃষ্টতম বিদ্বেষ ও সংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রয়াস' শিরোনামে লেখকরা খৃষ্টানদের লক্ষ্য করে বলেছেন- "এ ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সার্বিকভাবে পবিত্র করার জন্য সমর্পণ করতে হবে। বিশেষত আমরা সে সকল 'পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তের' কথা বলতে চাই, যা প্রায়শ এবং অতিশয় হালকাভাবে ইসলাম সম্পর্কে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমরা যাতে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলেও এরূপ কোন সহজ ও খেয়ালী ধারণা পোষণ না করি সে জন্য বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ নিষ্ঠাবান মুসলমানরা আমাদের এ জাতীয় ধারণাকে বিভ্রান্তিকর বলেই মনে করে।"

এ জাতীয় ধারণার একটি নমুনা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের 'গড' বুঝানোর জন্য খৃষ্টানরা হামেশা 'আল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, অর্থাৎ তারা যেন বলতে চান যে, মুসলমানরা যে গডে বিশ্বাস করেন, তিনি খৃষ্টান গড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক সত্তা। আরবী ভাষায় আল্লাহ শব্দের অর্থ ডিভিনিটি, আসমানী সত্তা। একক ও অনন্য গড অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার একমাত্র গড শব্দ দ্বারাই ঐ আরবী শব্দটির তাৎপর্য প্রকাশ করা যেতে পারে। মুসলমানরা যাঁকে আল্লাহ বলে থাকেন, তিনি মূসা ও যিশুর গড ছাড়া অপর কেউ নন।

ভ্যাটিক্যানে অখৃষ্টান বিষয়ক অফিস থেকে যে দলীল প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে এ মৌলিক বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে- "আল্লাহ আসলে গড নন, এরূপ ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অথচ পাশ্চাত্যের কোন কোন মহল তাই মনে করে থাকেন। খৃষ্টীয় পরিষদের দলীলসমূহে এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে যথাস্থানে প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। লুমেন জেনটিয়ামের (১৯৬২-৬৫ সালের দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলে প্রণীত একটি দলীলের নাম) একটি অভিমত উধৃত করে গড-এর উপর মুসলমানদের বিশ্বাসের উৎকৃষ্টতম নজীর ও ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। ঐ অভিমতে বলা হয়েছে, -"মুসলমানরা ইব্রাহীমের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং আমাদের সঙ্গে সেই একক করুণাময় গডের ইবাদত করেন, যিনি শেষ বিচারের দিনের একমাত্র বিচারক।"

সুতরাং বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় গড লেখার বদলে আল্লাহ লেখার বিরুদ্ধে মুসলমানরা যে কেন প্রতিবাদ করে থাকেন, তা সহজেই বোধগম্য। এ একই কারণে কুরআনের ফরাসী তরজমায় 'অবশেষে' আল্লাহ শব্দটির বদলে ডিউ (গড) **শব্দ ব্যবহার** করায় পন্ডিত মুসলমানরা ডি ম্যাসনের প্রশংসা করেছেন।

ভ্যাটিক্যানের ঐ দলীলে বলা হয়েছে- "গড বুঝানোর জন্য আরবী ভাষী খৃষ্টানদের একটি মাত্র শব্দ আছে, এবং তা হচ্ছে আল্লাহ।"

মুসলিম ও খৃষ্টানগণ এক ও একক গডের ইবাদত করে থাকেন।

ঐ দলীলে অতঃপর ইসলাম সম্পর্কিত অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদ বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

ইসলামে অদৃষ্টবাদ আছে, এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। দলীলে এ ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে এবং তাকে তার কাজের ভিত্তিতেই বিচার করা হবে। বল প্রয়োগের মারফত ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা ইসলামী নীতিতে বৈধ বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, দলীলে তারও বিরোধিতা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ নীতিতে বিশ্বাস করাও ইসলাম বিরোধী। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নিম্নবর্ণিত দুটি আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ আয়াত দুটি সম্পর্কে পাশ্চাত্যে অনেক বিভ্রান্তি আছেঃ

"ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই"- সূরা-বাকারা, আয়াত ২৫৬।

"(আল্লাহ) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।" সূরা- হজ্জ, আয়াত-৭৮।

ইসলাম ভীতির ধর্ম বলে যে ধারণা প্রচার করা হয়ে থাকে, তার প্রতিবাদ করে দলীলে বলা হয়েছে যে, ইসলাম আসলে প্রেমের ধর্ম। আল্লার ওপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিবেশীকে ভালবাসাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামে নৈতিকতা নেই বরং ধর্মান্ধতা আছে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের এ ধারণা সম্পর্কে ভ্যাটিক্যান দলীলে বলা হয়েছে যে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা- "খৃষ্টান ধর্ম যখন ইতিহাসে রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করেছে, তখন তা যতখানি গোঁড়ামিপূর্ণ ছিল, ইসলাম কখনও তার চেয়ে বেশী গোঁড়ামীপূর্ণ ছিল না। এ প্রসঙ্গে কুরআন থেকে উধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, পাশ্চাত্যে "জিহাদ" শব্দটির ভুল তরজমা করা হয়ে থাকে- "আরবী ভাষায় কথাটি হচ্ছে আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লার রাস্তায় প্রচেষ্টা চালানো। আর এ প্রচেষ্টা হচ্ছে ইসলাম প্রচারের জন্য, এবং ইসলামকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য। এ জিহাদ বাইবেলের 'খেরেম' নয়; ধ্বংসের জন্য পরিচালিত নয়, বরং নতুন নতুন দেশে আল্লার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অতীতে জিহাদের সময় বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত হয়েছে বটে, কিন্তু তা জিহাদের কারণে হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম অনুসারে। তাছাড়া ক্রুসেডের সময় কেবল মুসলমানরাই জঘন্য হত্যাকান্ড চালায়নি।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল-কুরআনের তরজমাকারীগণ, এমনকি এ ক্ষেত্রে যাঁরা বিখ্যাত তাঁরাও তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ অভ্যাস ও প্রবণতা বর্জন না করে তরজমায় এমন অনেক জিনিস বসিয়ে দিয়েছেন, যা মূল আরবী এবারতে নেই। মূল এবারত বদল না করেও অনেক সময় তার এমন শিরোনাম দেয়া যেতে পারে, যার ফলে ঐ এবারতের সাধারণ অর্থই বদল হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, আর ব্লাশেয়ারের বিখ্যাত তরজমার কথা বলা যেতে পারে (প্রকাশক মাইসোনেউব অ লারোজ, প্যারিস,

১৯৬৬)। তিনি ১১৫ পৃষ্ঠায় এমন একটি শিরোনাম (ধর্মযুদ্ধের কর্তব্য) বসিয়ে দিয়েছেন, যা কুরআনে নেই। এ শিরোনাম এমন একটি অনুচ্ছেদের মাথায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে, যেখানে অস্ত্র ধারণের আহবান অবশ্যই আছে, কিন্তু শিরোনামের ভাষায় যে চরিত্র আরোপ করা হয়েছে, সে চরিত্র কোথাও নেই। সুতরাং যিনি মূল আরবী না পড়ে কেবলমাত্র এ তরজমা পড়বেন, তিনি যদি ধরে নেন যে, মুসলমানরা সর্বদাই ধর্মযুদ্ধ করতে বাধ্য, তাহলে তাঁকে বোধহয় তেমন দোষ দেয়া যাবে না।

ভ্যাটিক্যানের ঐ দলীলে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অপনোদন করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম যা মুসলমানদের সর্বদা মধ্যযুগের গন্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তাদের অযোগ্য করে ফেলে। খৃষ্টান দেশসমূহের অনুরূপ পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করে দলীলে বলা হয়েছে- 'মুসলিম চিন্তাধারার ঐতিহ্যবাহী সম্প্রসারণের মধ্যে আমরা কিন্তু একটি প্রগতিশীল সমাজের বিবর্তন দেখতে পাই।"

আমি সুনিশ্চিত যে, ইসলামের প্রতি ভ্যাটিক্যানের এ সমর্থনে মুসলিম হোক, ইহুদী হোক, আর খৃষ্টান হোক, অনেক বিশ্বাসীই বিস্মিত হবেন। কারণ এ মনোভাবে যে বিশ্বস্ততা ও খোলা মনের পরিচয় আছে, ভ্যাটিক্যানে অতীতে কখনও তা দেখা যায়নি। অতীতের মনোভাব বরাবরই বিরুদ্ধবাদী ও বিদ্বেষমূলক ছিল। তবে ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের খুব কম সংখ্যক লোকই অবহিত আছে।

অবশ্য যাঁরা জানেন, তাঁরা পরবর্তী পদক্ষেপে আদৌ বিস্মিত হননি। যেমনঃ ভ্যাটিক্যানের অফিস ফর নন ক্রিশ্চিয়ান এফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট সরকারীভাবে সউদী আরব সফরে গিয়ে বাদশাহ ফয়সলের সংগে সাক্ষাত করেন এবং তারপর সউদী আলেমদের একটি প্রতিনিধিদল ভ্যাটিক্যান সফরে যান এবং খোদ পোপ ষষ্ঠ পল সরকারীভাবে তাঁদের সংবর্ধনা জানান। এ দুটি ঘটনাই ১৯৭৪ সালে ঘটে। এ পটভূমি মনে রাখলে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। স্ট্রাসবার্গের বিশপ হিজগ্রেস এলাশিংজার আলেমগণকে তাঁর ক্যাথাড্রেলে সংবর্ধনা জানান এবং সেখানেই তাঁদের নামায আদায় করতে অনুরোধ করেন। আলেমগণ এ অনুরোধ রক্ষা করেন এবং তাঁদের সম্মানে গির্জার প্রার্থনা বেদীখানি কিবলার দিকে কাবামুখী করে তাঁদের সামনে রেখে দেয়া হয়। এভাবে মুসলিম ও খৃষ্টান বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ একটি সংলাপে রাজি হয়েছেন। কারণ তাঁরা একই একক আল্লায় ঈমান রাখেন এবং পরস্পরের মতবিরোধের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। এ অবস্থায় উভয় পক্ষের অহির অন্যান্য সকল বিষয়ে একটির সংগে অপরটি তুলনা করে দেখাই স্বাভাবিক। এ তুলনার একটি প্রাসঙ্গিক কাজ হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞানের

আলোকে উভয় পক্ষের গ্রন্থের অর্থাৎ কুরআন ও বাইবেলের বিবরণের সত্যতা যাচাই করে দেখা।

ধর্মের সংগে বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তৌহিদবাদী কোন ধর্মের কোন নীতিতেই কখনও বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা হয়নি। তবে একথাও সত্য যে, কোন কোন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানীদের অনেক সময় বিপাকে ফেলেছেন। খৃষ্টান জগতে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ বহু শতাব্দী যাবত আসল অহীর খবর না নিয়ে শুধু গায়ের জোরেই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিরোধিতা করেছেন। বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আমরা সে সম্পর্কেও অবহিত আছি। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং গবেষণা বন্ধ করে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে যে আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করা হত এবং সেই ভয়ে অনেক বিজ্ঞানী যে পালিয়ে গোপন নির্বাসনে চলে যেতেন, এ খবর এখন আর কারও অজানা নেই। এ প্রসঙ্গে গ্যালিলিওর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কিত কপারনিকাসের আবিষ্কারকে সত্য বলে গ্রহণ করার অপরাধে চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গুরুদন্ড প্রদান করেন। স্পষ্টতই তাঁরা বাইবেলের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, কারণ বাইবেলের কোন শ্লোকই তাঁরা সরাসরিভাবে গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেননি।

(বাংলা অনুবাদকের মন্তব্য-ভ্যাটিক্যানের রোমান ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ৩৫০ বছর পরে, গ্যালিলিওকে খালাস করে দিয়ে বলেছেন- "যে বিচারকমন্ডলী গ্যালিলিওকে সাজা দেন, তারা ভুল করেছিলেন। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, কপারনিকাসের এ অভিমত লিখিতভাবে এবং জোরোশোরে সমর্থন করার অপরাধে ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬৩৩ সালে ৬৯ বছর বয়সে রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক দন্ডিত হন এবং পরবর্তী ৯ বছর তিনি গৃহবন্দীত্বের সাজা ভোগ করেন। ১৯৮০ সালে পোপ দ্বিতীয় জন পল ঐ বিচারের সাক্ষ্য প্রমাণ পুনরায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, ও ধর্মবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সম্প্রতি সরকারীভাবে ঐ খালাশের রায় প্রকাশিত হয়েছে [সাপ্তাহিক টাইম, ১২ মার্চ, ১৯৮৪]।

বিজ্ঞানী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে- "জ্ঞান আহরণের জন্য এমনকি চীন পর্যন্ত চলে যাও।" অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানের অন্বেষণ করা প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য কর্তব্য।

এ আলোচনায় একটু পরে আমরা আরও দেখতে পাব যে, খোদ কুরআনেই বিজ্ঞান চর্চার আহবান জানানো হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য ও ব্যাখ্যামূলক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংগে সম্পূর্ণ **সামঞ্জস্য**পূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইহুদী খৃষ্টানদের অহির গ্রন্থে এরূপ কোন বিষয়বস্তু বা দৃষ্টান্ত নেই।

অবশ্য ইসলামের ইতিহাসে কোন কোন বিশ্বাসী বিজ্ঞান সম্পর্কে পৃথক অর্থাৎ বিরূপ ধারণাও পোষণ করেছেন। একথা সত্য যে কোন কোন আমলে শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দানের দায়িত্ব অবহেলা করা হয়েছে। একইভাবে একথাও সত্য যে, অন্যান্য জায়গার মত মুসলিম বিশ্বেও কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও মনে রাখা প্রয়োজন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের গৌরবময় যুগে খৃষ্টান দুনিয়ায় যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল, তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ে বহুবিধ গবেষণা ও আবিষ্কারের কাজ চলছিল। সেখানে তখন সেই আমলের তমদ্দুন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য সম্পদগুলিও রক্ষিত ছিল। কর্ডোভায় খলিফার পাঠাগারে ৪ লক্ষ গ্রন্থ ছিল। আবু রুশদ সেখানে অধ্যাপনা করতেন এবং সেখানে গ্রীক, ভারতীয় ও পারস্যের বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও ছিল। এ কারণে সমগ্র ইউরোপের শিক্ষার্থী ও পন্ডিতগণ তখন কর্ডোভা যেতেন ঠিক যেমন আজ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য সকলে যুক্তরাষ্ট্রে যেয়ে থাকেন। আরব জাতি তখন তাদের বিজিত দেশ সমূহের সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক হিসেবে কাজ করত এবং তাদের এ বিদগ্ধ জনোচিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তাদের মারফতে আমরা অসংখ্য প্রাচীন পান্ডুলিপি হাতে পেয়েছি। তাছাড়া গণিতবিদ্যা (বীজগণিত আরবদেরই আবিষ্কার), জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা (দৃষ্টিবিদ্যা ও আলোক বিজ্ঞান), ভূতত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা (আবু আলী সিনা) প্রভৃতির জন্যও আমরা আরবদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা মধ্যযুগের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক চরিত্র ও মর্যাদা অর্জন করে। আজকের তুলনায় তখনকার মানুষ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় অনেক বেশী অভিষিক্ত ছিল; কিন্তু তা ইসলামী দুনিয়ায় তাদের একই সঙ্গে ঈমানদার ও বিজ্ঞানী হওয়ার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। বিজ্ঞান তখন ধর্মের দোসর ছিল এবং সেই অবস্থার পরিবর্তন কখনই সংগত হয়নি।

খৃষ্টান দুনিয়ার জন্য মধ্যযুগ ছিল একটি আবদ্ধতা এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার প্রতি অচল ভক্তির যুগ। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বেশ জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি যে মন্থর হয়ে গিয়েছিল, তা কিন্তু ইহুদী-খৃষ্টান অহির কারণে হয়নি; হয়েছিল ঐ অহির সেবক বলে দাবীদার লোকদের দ্বারা। রেনেসাঁর পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বিজ্ঞানীগণ তাঁদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কারণে তাঁদের সাবেক শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে শুরু করেন। প্রতিশোধ গ্রহণ এখনও চলছে এবং বর্তমানে পাশ্চাত্যে তা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক মহলে এখন কেউ আল্লার কথা বললে তাকে প্রায় সন্দেহের চোখেই দেখা হয়। এ মনোভাব মুসলিম সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত সকল তরুণকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ যেহেতু চরম মনোভাব পোষণ করে থাকেন, সেহেতু তাঁদের তরুণ অনুসারীগণ যে পৃথক কোন মনোভাব পোষণ করবেন, তেমন কিছু বোধহয় আশা করা যায় না। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী বিগত কয়েক বছর যাবত সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, কতিপয় মৌলিক উপাদান থেকে ঘটনাক্রমে জীবন্ত পদার্থের বা জীবের জন্ম হতে পারে। এ বিষয়ে তিনি একখানি বইও লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে ঐ মূল জীব থেকে সুগঠিত ও শৃংখলাবদ্ধ প্রাণী গঠিত হয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা জটিল জীব মানুষে পরিণত হয়ে থাকে।

জীবন সৃষ্টির এ আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নতুনত্ব চিন্তাশীল মানুষকে অতি অবশ্যই বিপরীত সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করতে পারে। জীবন সৃষ্টি ও সংরক্ষণের বিধি বিধান ও কলাকৌশল যতই অধ্যয়ন করা যায়, ততই তা জটিল বলে মনে হয় এবং জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ে, জ্ঞানী ততই প্রশংসামূখর হয়ে থাকেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, এ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ায় ঘটনাক্রমে কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি সুক্ষাতিসুক্ষ্ম তথ্য ও প্রক্রিয়া যতই আবিষ্কার করতে থাকেন, একজন সৃষ্টিকর্তা থাকার অনুকূলে তাঁর যুক্তিও তত জোরদার হয়ে থাকে। কিন্তু এমন মানুষও আছেন যারা বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অবনত মস্তক না হয়ে গর্বে অমান্যতায় উদ্ধত হয়ে থাকেন। আল্লার কথায় তাঁরা নাক সিটকান; এ ধারণাকে বাধা মনে করে তারা অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে ফেলে দেন, ঠিক যেমন বিনোদন মুহূর্তের কোন বিঘ্নকে তারা তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করে থাকেন। পাশ্চাত্য জগতে এখন যে বস্তুতান্ত্রিক সমাজের জয়জয়কার, এ হচ্ছে তার প্রতিচ্ছবি।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেকেই আজ এ বিকৃত ও দূষিত চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। তাদের মুকাবিলা ও সংশোধন করার জন্য কোন আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ইহুদী ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্ম প্রায় প্রকাশ্যেই স্বীকার করে থাকে যে, পাশ্চাত্যে বর্তমানে যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও নিরীশ্বরবাদের জোয়ার এসেছে, তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ দুটি ধর্মই ঐ জোয়ারের মুখে এখন সম্পূর্ণ অসহায় এবং তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা এক দশক থেকে আর এক দশকে **আরও** বেশী কমে যাচ্ছে। জোয়ার ক্রমে সর্বত্র সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। এখন একজন বস্তুবাদী নিরীশ্বরবাদীর কাছে সনাতন খৃষ্টান ধর্মের রূপ হচ্ছে এই যে, সংখাগরিষ্ঠ মানুষের উপর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কায়েম রাখার উদ্দেশ্যেই বিগত দু হাজার বছরে এ পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছে। ইহুদী-খৃষ্টধর্মের ভাষার সংগে তার নিজের ভাষার কোন মিল আছে বলেও তিনি মনে করেন না। কারণ ঐ ভাষায় যে বর্ণনা আছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের মুকাবিলায় তাতে এত বেশী অসম্ভাব্যতা, স্ববিরোধিতা ও সামঞ্জস্যহীনতা রয়েছে যে, তিনি তাকে আদৌ

কোন আমল দেওয়ারই উপযুক্ত বলে মনে করেন না; অথচ অধিকাংশ ধর্মবিদ ঐ বর্ণনাকেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে সামগ্রিকভাবে মেনে নেয়ার কথা বলে থাকেন।

কোন বস্তুবাদী-নিরীশ্বরবাদীর কাছে ইসলামের কথা বলা হলে তিনি সবজান্তার হাসি হেসে থাকেন। অথচ ইসলাম সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা তিনি আদৌ পোষণ করেন না। যে কোন ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবির মত ইসলাম সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পোষণ করেন, তা অসত্য ও বিভ্রান্তিকর।

এ অবস্থার জন্য অবশ্য সংগত কারণও আছে। ক্যাথলিকদের উচ্চতর পর্যায়ে সম্প্রতি যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তার কথা বাদ দিলে পাশ্চাত্যে সাধারণভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদই প্রচারিত হয়ে থাকে। সেখানে ইসলাম সম্পর্কে যাঁরাই গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই অবহিত আছেন যে, ইসলামের ইতিহাস, নীতিমালা ও লক্ষ্য কতখানি বিকৃতভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। তাছাড়া ইউরোপীয় ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে যে সকল বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে, কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, তা সাধারণ পাঠকের কাছে তেমন সহজবোধ্যও নয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বুঝা যাবে যে, কুরআনের বিষয়বস্তু সঠিকভাবে এবং বোধগম্য আকারে তাদের কাছে তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কুরআনের কোন কোন আয়াত, বিশেষত বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত আয়াত এমন দুর্বলভাবে তরজমা এবং এমন আনাড়িভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীগণ দৃশ্যত সঙ্গতভাবেই তার সমালোচনা করে থাকেন। অথচ কুরআন ঐ সমালোচনার আদৌ হকদার নয়। এ বিষয়টির প্রতি এখন থেকে বিশেষভাবে নজর দেয়া প্রয়োজন। কারণ, যে তরজমার ভুল বা ব্যাখ্যার বিভ্রান্তি (একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক প্রায়শ গভীর) দু-এক শতাব্দী আগে হয়ত কাউকে বিস্মিত করতে পারত না, এখন তা আধুনিক বিজ্ঞানীদের সরাসরি বৈরী করে তোলে। তরজমার দুর্বলতার কারণে বিষয়বস্তু যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়ে তাহলে কোন বৈজ্ঞানিকই তা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে রাজি হবেন না। মানুষের জন্ম সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ ধরনের ভুলের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ তুলে ধরা হবে।

কিন্তু তরজমায় এ ধরনের ভুল থাকে কেন? একটি কারণ সম্ভবত এই যে, আধুনিক তরজমাকারীগণ বিচার-বিবেচনা না করেই প্রাচীন ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে থাকেন। একটি আরবী শব্দের যেখানে একাধিক অর্থ আছে, প্রাচীন ভাষ্যকারগণ হয়ত তার মধ্য থেকে একটি বাছাই করে নিয়েছেন এবং তার ফলেই তাঁদের ব্যাখ্যা হয়ত অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কিন্তু এজন্য তাঁদের খুব দোষও বোধহয় দেয়া যায় না। কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যে শব্দের **অর্থ এখন** হয়ত খুবই সহজবোধ্য হয়েছে, প্রাচীন কালে তা তেমন ছিল না। সুতরাং তরজমা ও ব্যাখ্যা এখন সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অতীতে কখনও এ সংশোধন করা সম্ভব

ছিল না। কারণ যে জ্ঞান ও তথ্য এখন আমরা হাতের কাছে পেয়েছি তখন তা আবিষ্কারই হয়নি। তরজমা ও ব্যাখ্যার এ প্রসঙ্গ কিন্তু একমাত্র কুরআনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাইবেলের ক্ষেত্রে তার কোনই প্রাসঙ্গিকতা নেই।

কুরআনের এ বৈজ্ঞানিক বিবেচনার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট আমাকে প্রথমে খুবই বিস্মিত করেছিল। আগে কখনও আমি চিন্তাই করতে পারিনি যে, প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী আগে সংকলিত এ এবারতে এত বিবিধ বিষয়ের বিবরণ থাকতে পারে এবং তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে অমন সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। প্রথমে ইসলামে আমার আদৌ কখনও বিশ্বাস ছিল না। তবে আমি খোলা মন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআনের এবারত পরীক্ষা করতে শুরু করি। আমার উপরে যদি কোন প্রভাব ক্রিয়াশীল থেকে থাকে, তা ছিল আমার যৌবনে পাওয়া শিক্ষার প্রভাব। লোকে 'মুসলিম' বলত না, বলত 'মুহামেডান'। অর্থাৎ বুঝানো হত যে, এ ধর্ম একজন মানুষের দ্বারা প্রবর্তিত হওয়ার কারণে গড-এর প্রসঙ্গে তার আদৌ কোন মূল্য থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যের অনেকের মত আমার নিজেরও তখন ইসলাম সম্পর্কে এ মিথ্যা ধারণা থেকে থাকতে পারে। এ মিথ্যা ধারণা পাশ্চাত্যে এখন এমন ব্যাপকভাবে প্রসারিত যে, বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কাউকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ভাবে কথা বলতে দেখলে আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাই। সুতরাং আমি স্বীকার করছি যে, পাশ্চাত্যে প্রচলিত ধারণা থেকে পৃথক ধারণা পাওয়ার আগে পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।

পাশ্চাত্যের ধারণা যে মিথ্যা, তা আমি উপলব্ধি করি কতপিয় ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। ঐ ধারণায় যে ভুল থাকতে পারে, এরূপ একটি আভাস প্রথমে আমি সউদী আরবে পাই।

মরহুম বাদশাহ ফয়সলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণের পরিমাণ খুবই বেশী এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীরতম শ্রদ্ধার সঙ্গে সালাম জানাই। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শুনার যে বিরল সম্মান তিনি আমাকে দিয়েছিলেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে কুরআন ব্যাখ্যার কতিপয় সমস্যা সম্পর্কে আমি যে তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেই স্মৃতি এখনও আমি সযত্নে লালন করে থাকি। তাঁর নিজের কাছ থেকে এবং তাঁর সহচরদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের বিরল সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

ইসলাম সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা ও পাশ্চাত্যের ধারণার মধ্যকার বিরাট ব্যবধান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আমি আরবী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করি। কারণ, আরবী আমার মাতৃভাষা নয়, অথচ যে ধর্মটি অমনভাবে ভুল বুঝা হয়ে থাকে তার মূল গ্রন্থখানির ভাষা হচ্ছে আরবী। আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল এই যে, আমি মূল ভাষায় কুরআন পড়ব এবং বিভিন্ন ভাষ্যকার লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে প্রত্যেকটি বাক্যের বিশ্লেষণ করব। আমার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল এই যে, কুরআনে বিভিন্ন

প্রাকৃতিক ঘটনার যে বিবরণ আছে, তা আমি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখব। কারণ ঐ বিবরণে এমন অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে, যা আরবী ভাষায় পড়লে প্রথম পাঠেই নির্ভুল ও নিখুঁত বলে বুঝা যায় এবং আমার কাছে সেই প্রথমেই আধুনিক তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। আমার তখন আরও মনে হয় যে, সেই মুহাম্মদের (সঃ) আমলের কোন মানুষের পক্ষে তো এসব তথ্য জানতে পারা আদৌ সম্ভব ছিল না! পরে আমি কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য বিষয়ে মুসলিম লেখকেদের লেখা কয়েকখানি বই পড়েছি এবং যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। কিন্তু পাশ্চাত্যে এ বিষয়ে কোন গবেষণা হয়েছে বলে আমি এখনও জানতে পারিনি।

কুরআনের এবারতের প্রথম পাঠকের কাছে যে জিনিসটি প্রথমেই ধরা পড়ে, তা হচ্ছে এই যে, এ গ্রন্থে বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে। সৃষ্টিতত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, পৃথিবী সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা, প্রাণীজগত, বৃক্ষজগত, মানব-প্রজনন প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ে আমি বাইবেলে বহু ভুল তথ্য পেয়েছি, কিন্তু কুরআনে একটি ভুলও খুঁজে পাইনি। সুতরাং আমি থেমে গিয়েছি এবং প্রশ্ন করেছি- কুরআন যদি কোন মানুষেরই লেখা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে সেই সপ্তম শতাব্দীতে এমন সব তথ্য লিপিবদ্ধ করা কিভাবে সম্ভব হল যা আমরা আজ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দেখতে পাচ্ছি? এবং কুরআনের যে এবারত এখন আমাদের হাতে আছে, তা যে ঠিক সেই আমলের, সে সম্পর্কে সন্দেহের আদৌ কোন অবকাশ নেই (পরে একটি অধ্যায়ে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করব)। তাহলে এ বিষয়ে মানুষের পক্ষে কি ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হতে পারে? আমি মনে করি, এর কোন ব্যাখ্যা নেই, ব্যাখ্যা হতেও পারে না।

আমাদের এ বিংশ শতাব্দীতেও যে জ্ঞান কমপক্ষে হাজার বছরের আগাম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, কোন কোন বিষয়ে সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ফ্রান্সের রাজা ডাগোবার্টের রাজত্বকালের (৬২৯-৬৩৯) সমসাময়িক আরব উপদ্বীপের একজন বাসিন্দার ছিল, মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় এর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

কুরআন নাজিল হয় হিজরী সাল শুরু হওয়ার (৬২২ ঈসায়ী) আগে-পিছে মোটামুটি বিশ বছর যাবত। একথা এখন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ঐ সময়ের আগে পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী যাবত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি এবং কুরআন নাজিল হওয়া সমাপ্ত হওয়ার পরই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসহ ইসলামী সভ্যতার তৎপরতার যুগ শুরু হয়। এ খবর যাঁরা রাখেন না, তাঁরা অনেক অসম্ভব ও হাস্যকর কথা বলে থাকেন। আমি নিজে এরূপ একটি কথা কয়েকবার শুনেছি। কথাটি এরূপ- কুরআনে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির কোন আশ্চর্যজনক বিবরণ যদি থেকেই থাকে, তাহলে তার কারণ হচ্ছে এই যে, আরব বিজ্ঞানীগণ খুবই পারদর্শী ও অগ্রগামী ছিলেন এবং মুহাম্মদ (সঃ)

তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্রও ধারণা আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, ঐ মন্তব্য শুধু হাস্যকরই নয়, কল্পনা-বিলাসও বটে। কারণ, তাঁরা জানেন যে, আরব বিশ্বে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল মুহাম্মদের (সঃ) পরে। তাছাড়া ঐ জাতীয় মন্তব্য আরও একটি কারণে অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন। কেননা কুরআনে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের ইশারা আছে বা নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট বিবরণ আছে, তা এ আধুনিক যুগের অনুসন্ধানের ফলেই সমর্থিত হয়েছে।

এ কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত কুরআনের ভাষ্যকারগণ, এমন কি ইসলামী সংস্কৃতির সেই গৌরবময় যুগের ভাষ্যকারগণও কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় অবশ্যম্ভাবীভাবে ভুল করেছেন। স্পষ্টতই প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা তখন তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেক পরে এবং আমাদের যুগের প্রায় কাছাকাছি সময়েই ঐ আয়াতগুলির সঠিক তরজমা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের আয়াত সঠিকভাবে বুঝতে পারার জন্য কেবলমাত্র ভাষাজ্ঞানই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কেও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আসলে কুরআন বুঝতে হলে বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন এবং এদিক থেকে বরং বলা যেতে পারে যে, বিশ্বকোষের মত জ্ঞানভান্ডার হাতের কাছে রাখা দরকার। এ আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার সময় বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষার প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব যে, কোন কোন আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য বিবিধ প্রকারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্য অপরিহার্য হয়ে পড়ছে।

কিন্তু বিশ্বজগতের নিয়ামক ও বিধায়ক নিয়ম-বিধান ব্যাখ্যা করা কুরআনের লক্ষ্য নয়। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সম্পূর্ণত ধর্মীয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিবরণই মানুষকে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে। এ বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পক্ষে দর্শনযোগ্য ঘটনা এবং বোধগম্য বিধানের প্রসঙ্গ এসেছে। কারণ, আল্লাহ মানুষ ও প্রকৃতি সম্বলিত বিশ্বজগতের একমাত্র নিয়ামক ও বিধায়ক। এ বক্তব্যের একটি অংশ সম্ভবত সহজেই বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু অপর অংশটি উপলব্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য। এ কারণে আগের দিনে কোন কোন আয়াত থেকে মানুষের পক্ষে কেবলমাত্র দৃশ্যমান অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব ছিল এবং তার ফলে তাকে ভুল সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হত। কারণ, সঠিক অর্থ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, তা তখনও আবিষ্কার হয়নি বিধায় তা তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর জন্য যে সকল আয়াত পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন, তার সংখ্যা অনেকের কাছে কম বলে মনে হয়েছে। আমার আগে যাঁরা এ দিকে নজর দিয়েছেন, তাঁরা সম্ভবত সেরূপই মনে করেছেন। আমি নিজে অবশ্য ঐ সকল মুসলিম লেখকদের চেয়ে কিছু কম সংখ্যক আয়াত বেছে নিয়েছি। তবে আমি এমন কিছু আয়াত বাছাই করেছি, যেগুলিকে আগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে

করা হয়নি। অন্তত আমার নিজের তাই মনে হয়েছে। পূর্ববর্তী লেখকদের নির্বাচিত কোন আয়াত আমি যদি ভুলক্রমে বাছাই না করে থাকি, তাহলে আশা করি তাঁরা কিছু মনে করবেন না। কোন কোন গ্রন্থে আমি কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখেছি বটে, কিন্তু আমার কাছে তা কেমন যেন নির্ভুল বলে মনে হয়নি। আমি খোলা মন ও পরিচ্ছন্ন বিবেক নিয়ে ঐ আয়াতগুলির আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

একইভাবে আমি কুরআনে এমন বিষয়ের প্রসঙ্গ তালাশ করেছি, যা মানুষের কাছে বোধগম্য বটে, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। আমার মনে হয় আমি এমন একটি প্রসঙ্গ কুরআনে পেয়েছি যেখানে জ্যোতির্মন্ডলে আমাদের এ পৃথিবীর মত আরও গ্রহের উপস্থিতির কথা আছে। অনেক বিজ্ঞানীই এরূপ সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সঠিকভাবে কিছু বলার মত কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এখনও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে বটে, তথাপি বিষয়টির উল্লেখ করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করছি।

এ বইখানি যদি তিরিশ বছর আগে লেখা হত, তাহলে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী করা আর একটি তথ্যের উল্লেখ করার প্রয়োজন হত। সেটি হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক-মানুষের মহাশূন্য বিজয় সম্পর্কে। তখন দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রের প্রাথমিক পরীক্ষার পর মানুষ মোটামুটি অনুমান করতে পেরেছিল যে, পৃথিবী থেকে সশরীরে গিয়ে মহাশূন্যে অনুসন্ধান চালানোর মত উপায়-উপকরণ একদিন হয়ত তার হাতে আসবে। তখন তার একথাও জানা ছিল যে, মানুষ যে একদিন মহাশূন্য জয় করবে, কুরআনের একটি আয়াতে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্মগ্রন্থ ও বিজ্ঞানের মধ্যকার বর্তমান মুকাবিলায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সত্যের ক্ষেত্রে বাইবেল ও কুরআন এ উভয় গ্রন্থের বিবরণই পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সত্যটি সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং সন্দেহের আদৌ কোন অবকাশ থাকলে চলবে না। ধর্মগন্থের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য বিজ্ঞানের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁরা মনে করেন যে, ধর্মীয় বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য বিজ্ঞানের পক্ষে কোন সঙ্গত ও বৈধ ধারণা গঠন করা সম্ভব নয় এবং এ কথা বাইবেল ও কুরআন এ উভয় গ্রন্থের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের মুকাবিলায় বাইবেলের বিবরণ টিকে থাকতে পারছে না, অথচ কুরআনের বিবরণ হুবহু মিলে যাচ্ছে। তাঁরা বলেন যে, বিজ্ঞান তো ক্রমে বদলে যাচ্ছে। আজ যা সত্য বলে গৃহীত হচ্ছে কিছুদিন পরে তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। তা হয়ত ঠিক, এ বিষয়েও কথা আছে।

থিওরি বদলায়, কিন্তু সত্য বদলায় না। ধর্মগ্রন্থের মুকাবিলায় আমরা সত্যের কথা বলছি, থিওরির কথা নয়। থিওরি তো অনুমান মাত্র, কিন্তু সত্য তো পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সিদ্ধান্ত। যে ঘটনা বা দৃশ্য সহজে বোধগম্য নয়, তা বোধগম্য করাই থিওরির

লক্ষ্য। সুতরাং ঐ ঘটনা বা দৃশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পরে আগের থিওরি সংশোধিত বা বাতিল হয়ে আর একটি নতুন থিওরি আসতে পারে। কিন্তু সত্য যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার আর পরিবর্তন ঘটে না। তার সংজ্ঞা নির্ণয় আগের চেয়ে সহজ হয়ে যায়। এখন এ সত্য প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এ সত্যের আর পরিবর্তন হবে না, তবে ভবিষ্যতে হয়ত ঐ কক্ষপথগুলি আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত হতে পারে।

একজন মুসলিম পদার্থবিদ কুরআনের একটি আয়াতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, ঐ আয়াতে অবস্তুর (এন্টি-ম্যাটার) ধারণার ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কিন্তু আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। কারণ থিওরি মাত্রই পরিবর্তনশীল এবং অবস্তু বিষয়ক থিওরিটি এখনও বিতর্কিত বিষয়। তবে কুরআনে যে আয়াতে পানি থেকে জীবন সৃষ্টির বর্ণনা আছে, তার প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ঐ বর্ণনা হয়ত আমরা কখনই হাতে কলমে প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু তার অনুকূলে অনেক যুক্তিই আছে। মানব-ভ্রূণের মত দৃশ্যমান বিষয়ের ক্ষেত্রে অবশ্য কুরআনে তার ক্রমবিকাশের যে বিভিন্ন পর্যায় বর্ণিত আছে, তার সঙ্গে আধুনিক ভ্রূণবিদ্যায় প্রাপ্ত তথ্য মিলিয়ে দেখলে সম্পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যই ধরা পড়বে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের এ মুকাবিলা আরও দু প্রকারের তুলনার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথমে তুলনা করা হয়েছে বিজ্ঞানের সঙ্গে বাইবেলে প্রদত্ত তথ্যের মুকাবিলা করে এবং দ্বিতীয় তুলনা করা হয়েছে অহির গ্রন্থ কুরআনের তথ্যের সঙ্গে মুহম্মদের (সঃ) কাজ ও কথার বিবরণ হাদীসের তথ্যের মুকাবিলা করে।

এ আলোচনার শেষভাগে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বাইবেল ও কুরআনের বর্ণনার মধ্যে তুলনা করে তার ফলাফল দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা ও সমালোচনায় বর্ণনা দুটির অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, তাও দেখানো হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিশ্বসৃষ্টি এবং মহাপ্লাবনের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে বাইবেলের বর্ণনার অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছে। একই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে কুরআনের বর্ণনার যে পরিপূর্ণ সঙ্গতি দেখতে পাওয়া গেছে, তাও তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান যুগে কোন গ্রন্থের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য এবং কোন গ্রন্থের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, তা আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, পাশ্চাত্যে ইহুদী, খৃষ্টান ও নিরীশ্বরবাদীগণ কোন রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই একযোগে বলে থাকেন যে, মুহাম্মদ বাইবেলের অনুকরণে নিজেই কুরআন লিখেছিলেন অথবা কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা আরও বলে থাকেন যে, কুরআনে ধর্মীয় ইতিহাসের যে সকল কাহিনী আছে, তা বাইবেলের কাহিনীগুলিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। একথা বলা চরম

নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। যিশু তাঁর ধর্ম প্রচারের সময় ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে প্রেরণা নিয়ে তাঁর সমকালীন লোকদের প্রতারিত করেছিলেন বললে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক; যদিও আমরা আগেই দেখেছি যে, মথির গসপেল সম্পূর্ণতই ওল্ড টেস্টামেন্টের ধারাবাহিকতায় লিখিত হয়েছে। কিন্তু সেই কারণে যিশুর আল্লার নবী হওয়ার মর্যাদা থেকে **বঞ্চিত করার কথা** কোন ধর্মবিদ কি কল্পনা করতে পারেন? অথচ পাশ্চাত্যে ঠিক এ ভাবেই মুহাম্মদের (সঃ) বিচার করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, 'তিনি বাইবেল নকল করা ছাড়া আর কিছুই করেননি।' এ মন্তব্যকে বড় জোর একটি হাতুড়ে রায় বলা যেতে পারে। কারণ এ মন্তব্য যাঁরা করে থাকেন, তাঁরা তলিয়ে দেখেন না যে, বাইবেল ও কুরআনে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বর্ণনা আছে; সুতরাং নকল করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাঁরা অবশ্য এ পার্থক্যের বিষয়ে আলোচনা করতে চান না এবং ধরে নিয়ে থাকেন যে, দু গ্রন্থে একই প্রকারের বর্ণনা আছে। ফলে বিজ্ঞানের সঙ্গে মুকাবিলার কোন প্রয়োজন নেই। বিশ্বসৃষ্টি ও মহাপ্লাবন বিষয়ে আলোচনার সময় এ বিষয়ে আমরা আরও আলোকপাত করব।

হাদীসের সঙ্গে মুহাম্মদের (সঃ) যে সম্পর্ক, গসপেলের সঙ্গে যিশুর সম্পর্কও ঠিক সেই প্রকারের। উভয়ই পয়গম্বরের কথা ও কাজের বিবরণ মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই লেখকগণ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। হাদীসের ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক প্রতক্ষদর্শী লেখকও ছিলেন। তবে মুহাম্মদের (সঃ) জীবনকালের অনেক পরে যাঁরা হাদীস সংকলন করেছেন, তাঁরাও অতিশয় নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। হাদীস বা গসপেল অহির গ্রন্থ নয়। আল্লার কালাম নয়, পয়গম্বরের বাণী মাত্র। ব্যাপকভাবে পঠিত এ সকল গ্রন্থে এমন কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বিশেষত রোগের প্রতিকার হিসাবে ভ্রান্ত। ধর্মীয় কোন সমস্যার বিষয় আমরা বিবেচনা থেকে বাদ দিয়েছি। কারণ হাদীসের পটভূমিকায় ঐ সমস্যা নিয়ে আমরা এ গ্রন্থে আলোচনা করিনি। অনেক হাদীসের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহ আছে এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ নিজেরাই সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে কোন হাদীসের বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হয়ে থাকলে তা কেবলমাত্র কুরআনের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যই করা হয়েছে। কারণ, কুরআনে এমন কোন বৈজ্ঞানিক বিবরণ নেই, যা বিশেষজ্ঞদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসের সঙ্গে তার পার্থক্য, আমরা দেখতে পাব, বেশ চমকে ওঠার মত।

যাঁরা মুহাম্মদকে (স) কুরআনের লেখক বলে দাবী করে থাকেন, এ যুক্তির মুকাবিলায় তাঁদের কোন কথাই আর গ্রহণযোগ্য থাকতে পারে না। একজন নিরক্ষর মানুষ সাহিত্যের গুণগত মানের বিচারে সমগ্র আরব সাহিত্য জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক হতে পারেন কিভাবে? আর সেই আমলে তিনি এমন সব বৈজ্ঞানিক সত্য কেমন করে ঘোষণা করলেন, যে সত্য তখন অপর কোন মানুষের পক্ষে উদ্ভাবন

করা আদৌ সম্ভব ছিল না? এবং আদৌ কোন ভুল না করে?

এ গ্রন্থের বিভিন্ন ধারণা-প্রবাহ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গড়ে তোলা হয়েছে। এবং তার ফলে এ সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হয়েছে যে, সপ্তম শতাব্দীর একজন মানুষ কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ে এমন সব বিবরণ দিয়েছেন যা তাঁর নিজের আমলের নয় এবং সেই বিবরণের সত্যতাও কয়েক শতাব্দী পরে জানা গেছে, এ অবস্থা কল্পনাও করা যেতে পারে না। এ কারণে অন্তত আমি মনে করি যে, কুরআনের কোন মানবিক ব্যাখ্যা হতে পারে না।

কুরআনের আসলত্ব, কিভাবে তা লেখা হয়

কুরআনের আসল হওয়া সম্পর্কে কোন মতবিরোধ না থাকায় বিভিন্ন অহির গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট একক স্থান আছে। এ বৈশিষ্ট নিউ টেস্টামেন্টেও নেই, ওল্ড টেস্টামেন্টেও নেই। এ দু'খানি গ্রন্থ যে কিভাবে রদবদল হতে হতে বর্তমান আকারে এসে দাঁড়িয়েছে, প্রথম দুটি অধ্যায়ে আমরা তার বিবরণ দিয়েছি। কুরআনের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি; কারণ কুরআন মুহাম্মদের (সঃ) আমলেই লিখে ফেলা হয়েছিল। কিভাবে লেখা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রক্রিয়া কি ছিল, একটু পরেই তা আমরা বর্ণনা করব।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআনের সঙ্গে বাইবেলের যে পার্থক্য আছে, তা কোন মতেই মূলত এ দুটি গ্রন্থের নাযিল হওয়ার তারিখের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কিছু লোক এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন বটে, কিন্তু ইহুদী-খৃষ্ট গ্রন্থ এবং কুরআন যখন লেখা হয়েছিল, তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁরা বিবেচনায় আনেন না; এবং নবীর উপরে কুরআন নাযিল হওয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতিও তাঁরা বিবেচনা করেন না। তাঁরা বলে থাকেন যে, পনের শত বছরের পুরোনো গ্রন্থের তুলনায় সপ্তম শতাব্দীর একখানি গ্রন্থের বিনা রদবদলে আমাদের সময় পর্যন্ত চলে আসার সম্ভাবনাই বেশী। সে কথা ঠিক, কিন্তু কারণ হিসেবে এটা যথেষ্ট নয়। ইহুদী-খৃষ্ট গ্রন্থে যে রদবদল হয়েছে, তার অজুহাত হিসেবেই এ কথা বলা হয়ে থাকে; কিন্তু মানুষের দ্বারা কুরআনের এবারতের রদবদল হওয়ার যে আদৌ কোন আশংকা ছিল না সে সত্যের স্বীকৃতি এ কথায় নেই।

ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু বহু লেখক একই কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং কতিপয় গ্রন্থ যেহেতু খৃষ্টপূর্ব আমল থেকে বহুবার সংশোধিত হয়েছে, সেহেতু ভুল ও স্ববিরোধিতার ঠিক অতগুলি কারণ ঘটেছে। আর নিউ টেস্টামেন্ট অর্থাৎ গসপেলের ক্ষেত্রে কেউই দাবী করতে পারেন না যে, এ গ্রন্থে যিশুর বাণী বা তাঁর কাজের বিবরণ সঠিক ও বাস্তব সম্মতভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে,

বিভিন্ন সময়ে এবারতের যে সকল পাঠ একটির পর একটি প্রস্তুত করা হয়েছে তার কোন একটিও আসল ছিল না এবং ঐ সকল পাঠের লেখকগণের একজনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না।

এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কুরআন হচ্ছে লিখিত অহির গ্রন্থ, আর হাদীস হচ্ছে মুহাম্মদের (সঃ) কথা ও কাজের বিবরণের সংকলন। নবীর ইন্তেকালের পরই তাঁর কয়েকজন সঙ্গী ঐ বিবরণ লিখতে শুরু করেন। কিছু বিবরণ আরও পরেও লেখা হয়েছে।[১] শ্রুতি বা স্মৃতির ক্ষেত্রে মানুষ মাত্রেরই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণে এ জাতীয় সকল রচনা কঠোর সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে হাদীস যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে বাইবেলের বিবরণের মত বিভিন্ন হাদীসের আসল হওয়ার ব্যাপারেও কমবেশী হওয়ার অবকাশ আছে। তবুও উল্লেখযোগ্য যে, বাইবেলের কোন বিবরণই যিশুর আমলে লেখা হয়নি; অনেক পরে লেখা হয়েছে। হাদীসও মুহাম্মদের (সঃ) জীবিত কালে সংকলিত হয়নি; তবে তার অব্যবহিত পরই সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে।

কুরআনের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কোন অহি নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী ও তাঁর সঙ্গীগণ তা মুখস্থ করে ফেলতেন এবং তাঁর অনুসারী ও নিযুক্ত লেখকগণ তা লিখে ফেলতেন। সুতরাং কুরআনের শুরুই হয়েছে দুটি বৈশিষ্ট দিয়ে- মুখস্থ করা ও লিখে ফেলা এবং এ দুটিই হচ্ছে আসল হওয়ার প্রমাণ। বাইবেলের ক্ষেত্রে তেমন কোন বৈশিষ্টও নেই, আসল হওয়ার প্রমাণও নেই। কুরআন মুখস্থ করা ও লিখে ফেলার ঐ প্রক্রিয়া মুহাম্মদের (সঃ) ইন্তেকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেই আমলে যখন অনেকেই লেখাপড়া জানত না, অর্থাৎ লিখতে পারত না, কিন্তু সকলেই মুখস্থ করতে ও আবৃত্তি করতে পারত তখন একটি বিরল সুবিধা ছিল এই যে, অহি লিখিত আকারে সংকলনের সময় একাধিক মানুষের আবৃত্তির সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা সম্ভব ছিল।

কুরআনের অহি জিবরাইল ফেরেশতার মারফত মুহাম্মদের (সঃ) উপর নাযিল হয়েছিল। এ নাযিল হওয়া বিশ বছরেরও অধিক কাল যাবত চালু ছিল। প্রথম নাযিল হয়েছিল ৯৬ নম্বর সূরার (আল-আলাক) কয়েকটি আয়াত, তারপর তিন বছর **যাবৎ** আর কোন **অহি** নাযিল হয়নি। তিন বছর পর আবার অহি নাযিল হতে থাকে এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দে নবীর **ই**ন্তেকালের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর যাবত চালু থাকে। এ বিশ বছরের প্রথম দশ বছর ছিল হিজরতের (৬২২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদের (সঃ) মক্কা থেকে মদীনা গমন) আগের এবং পরের দশ বছর ছিল তার পরের।

প্রথম অহি ছিল নিম্নরূপ (সূরা ৯৬, আল-আলাক, আয়াত ১-৫)ঃ

---

১. অবশ্যি কিছু বিবরণ নবীর জীবদ্দশাই তিনি নিজে ও তাঁর সাহাবাগণও লিখেঝেন।

"পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন-
সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষের রক্তপিন্ড হইতে।
পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক
মহা মহিমান্বিত,
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন-
শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না।"

এ অহিতে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি যে লিখতেও জানতেন না, পড়তেও জানতেন না, বিশেষত সেই পটভূমিকায় আমরা পরে এ অহির ব্যাখা করব।

প্রফেসর হামিদুল্লাহ তাঁর কুরআনের ফরাসী তরজমার ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, এ প্রথম অহির একটি বিষয় হচ্ছে "মানুষের জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে কলমের প্রশংসা" এবং "এ জন্যই নবী লিখিত আকারে কুরআন সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন।"

খোদ কুরআনের এবারত থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুহাম্মদের (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্বেই সেই সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া অহি লিখে ফেলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কুরআন যে সত্যিই আসল তা আমরা এখনই দেখতে পারব। কারণ প্রথম দিকের অহি লিখিত হয়ে যাওয়ার কথা পরবর্তী অহিতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি যে মুহাম্মদ (সঃ) ও তার সঙ্গীগণ অহির এবারত মুখস্থ, অর্থাৎ স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুতরাং পরবর্তী অহিতে যখন পূর্ববর্তী অহি লিখিত হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া খুবই সহজ ছিল। যাঁরা কুরআন লিখে রাখার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করলেই ঐ প্রমাণ পাওয়া যেত।

হিজরতের আগেই যে ঐ সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া অহি লিখে ফেলা হয়েছিল, ঐ সময়ের চারটি সূরাতে তার উল্লেখ আছে।

- সূরা আবাসা (৮০ ঃ ১১-১৬)ঃ "এ প্রকার আচরণ অনুচিত; ইহা উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে, উহা আছে মহান, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থে, মহান, পূত চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।"

আল্লামা ইউসুফ আলী তাঁর ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত কুরআনের তরজমার ভাষ্যে বলেছেন যে, এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন বিয়াল্লিশ বা পয়তাল্লিশটি সূরা (মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে) লেখা হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানগণ তা মক্কায় সংরক্ষণ করতেন।

- সূরা বুরুজ (৮৫ ঃ ২১-২২)ঃ "বস্তুতঃ ইহা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"

- সূরা ওয়াকিয়া (৫৬ ঃ ৭৭-৮০)ঃ "নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন, যাহা আছে

সুরক্ষিত গ্রন্থে, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিবে না। ইহা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।"

-সূরা ফুরকান (২৫ ঃ ৫)ঃ "উহারা বলে, 'এগুলি তো সেকালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে; এগুলি সকাল সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।"

এখানে নবীর দুশমনদের অভিযোগের উল্লেখ আছে। তারা তাঁকে ভন্ড বলে মনে করত। তারা এ গুজব ছড়াত যে, তাঁর কাছে প্রাচীন উপকথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে, এবং তিনি তা লিখিয়ে নেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লিখিত দলিল যে প্রস্তুত করা হত, এ কথা মুহাম্মদের (সঃ) দুশমনেরাও উল্লেখ করেছে।

হিজরতের পরে নাযিল হওয়া একটি সূরায় আসমানী উপদেশমালা লিখিত পৃষ্ঠাসমূহের উল্লেখ সর্বশেষ বারের মত করা হয়েছে।

- সূরা বাইয়িনা (৯৮ ঃ ২-৩)ঃ "আল্লাহর নিকট হইতে এক রসূল, যে আবৃত্তি করে গ্রন্থ- যাহাতে আছে সরল বিধান।"

সুতরাং খোদ কুরআনেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, নবীর আমলেই কুরআন লিখে ফেলা হয়েছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কাতিব বা লেখক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যায়েদ বিন সাবিতের নামই সর্বাধিক বিখ্যাত।

প্রফেসর হামিদুল্লাহ তার কুরআনের ফরাসী তরজমার (১৯৭১) ভূমিকায় নবীর ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়ে কুরআনের এবারত লিখিত হওয়ার সময় যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সকল বিশেষজ্ঞই একমত হয়ে বলেছেন যে, যখনই কোন অহি নাযিল হত, তখনই নবী মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর লেখাপড়া জানা সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজনকে ডেকে নিয়ে তা লিখিয়ে নিতেন এবং এ নতুন অহী পূর্বে নাযিল হওয়া অহির পরম্পরায় কোন জায়গায় বসাতে হবে তা বলে দিতেন। ...লেখা হয়ে যাওয়ার পর লেখককে তিনি তা পড়ে শুনাতে বলতেন এবং লেখায় কোন ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করে দিতেন। ...অপর একটি বিবরণে জানা যায় যে, প্রতি বছর রমযান মাসে নবী ঐ সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া সমুদয় অহি তেলাওয়াত করে জিবরাইল ফেরশতাকে শুনাতেন... তাঁর ইন্তিকালের আগের রমযানে জিবরাইল তাঁকে দিয়ে সমগ্র কুরআন দুবার পড়িয়ে নিয়েছিলেন ...একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রতিদিন পাঁচ বারের নামাযে কুরআন পাঠ করা ছাড়াও সেই মুহাম্মদের (সঃ) আমল থেকেই মুসলমানগণ রমযান মাসে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সমগ্র কুরআন পাঠ করতে অভ্যস্ত। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে, অহির এবারতের চূড়ান্ত সংকলনের সময় মুহাম্মদের (সঃ) কাতেব যায়েদ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যত্র অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।"

প্রথমবার কুরআন বিভিন্ন জিনিসের উপর লেখা হয়। চামড়া, কাঠের তক্তি, উটের

কাঁধের হাড়, পাথর প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের কুরআন মুখস্থ করতে বলতেন এবং তাঁরা সেই মত কাজ করতেন। ফলে তখন অনেকেই সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে হাফেজ নামে পরিচিত হন এবং বিভিন্ন দেশে কুরআনের বাণী প্রচার করেন। এভাবে লিখিত আকারে ও মুখস্থ করে দুভাবে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারটি কালক্রমে খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নবী মুহাম্মদের (সঃ) ইন্তেকালের (৬৩২ খৃষ্টাব্দ) কিছুদিন পরই ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর নবীর সাবেক প্রধান কাতেব যায়েদ ইবনে সাবিতকে এক জেলদ কুরআন নকল করে দিতে বলেন। উমরের (ভবিষ্যত দ্বিতীয় খলীফা) তত্ত্বাবধানে যায়েদ মদীনায় তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে থাকা বিভিন্ন জিনিসের উপরে লেখা কুরআনের এবারত একত্রিত করেন এবং হাফেজদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও তাঁদের মুখস্থ থাকা বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে একখানি পূর্ণাঙ্গ কপি প্রস্তুত করেন। এভাবে একখানি নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সংকলন প্রস্তুত হয়।

বিশেষজ্ঞদের সূত্রে জানা যায় যে, খলীফা উমর (আবু বকরের পর ৬৩৪ সালে খলীফা হন) পরে সমগ্র কুরআনের একটি এককখন্ড প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি এ খন্ডটি তাঁর কন্যা ও নবীর বিধবা স্ত্রী হাফসাকে দিয়ে যান।

তৃতীয় খলীফা উসমান ৬৪৪ থেকে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি সংকলনটি আরও উন্নত ও সংহত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন আবু বকরের আমলে প্রস্তুত করা ও তখন হাফসার হেফাজতে থাকা সংকলনটির ভিত্তিতে কাজ শুরু করেন। তাঁরা হাফেজদের মুখস্থ থাকা বিবরণ শোনেন এবং তাঁদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। এভাবে প্রত্যেকটি এবারতের আসল হওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালান। এ ব্যাপারে কঠোরতম সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং সামান্যতম সন্দেহজনক ক্ষেত্রেও সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য না মিলে যাওয়া পর্যন্ত কোন এবারত আসল ও নির্ভুল বলে গ্রহণ করা হয়নি। একথা সর্বজনবিদিত যে, কুরআনের কতিপয় আয়াতে নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে অপর কয়েকটি আয়াত সংশোধন করা হয়েছে। মুহাম্মদের (সঃ) নবুওতের কর্মধারা বিশ বছরের অধিক কাল যাবত বিস্তৃত ছিল, এ কথা মনে রাখলে এ অবস্থার একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নবী মুহাম্মদ (সঃ) রমযান মাসে সমগ্র কুরআন আবৃত্তি করার সময় যে ক্রমিকতা অনুসরণ করতেন, কমিশনও ঠিক সেই ক্রমিকতা অনুসরণ করে সূরাগুলি সেইভাবে সাজিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করেন।

প্রথম তিনজন খলীফা, বিশেষত উসমানের আমলে কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল, সে সম্পর্কে অনেকের মনেই হয়ত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ। নবীর ইন্তেকালের পরবর্তী প্রথম কয়েক দশকে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং এ প্রসার যে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘটে

তাদের মাতৃভাষা আরবী ছিল না। সুতরাং অন্য ভাষায় তরজমা হওয়ার পূর্বে মূল ভাষার এবারত যাতে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল থাকে তার নিশ্চয়তা বিধান করার প্রয়োজন ছিল। এটাই ছিল উসমান কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

খলীফা উসমান ঐভাবে সংকলিত কুরআনের কপি ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করেন এবং এ কারণেই প্রফেসর হামিদুল্লাহ বলেছেন, উসমানী সংকলনের ঐ কুরআন এখনও তাসখন্দ ও ইস্তাম্বুলের প্রাচীন সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে যে সকল প্রাচীনতম কুরআনের সন্ধান পাওয়া যায়, নকল করার দু-একটি ছোটখাট ভুল ছাড়া তা সব একই প্রকারের। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত কুরআনের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। (প্যারিসের বাইব্লিওথেক ন্যাশনাল পাঠাগারে প্রাচীন কুরআনের যে অংশ বিশেষ সংরক্ষিত আছে, তা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর, অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর আমলের বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন)। যা হোক আসল কথা এই যে, প্রাচীন কুরআনের যতগুলি কপির সন্ধান এযাবত পাওয়া গেছে, তার সবগুলিই একই প্রকারের। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত সামান্য বিভিন্নতা আছে, কিন্তু তার এবারতের সাধারণ অর্থ আদৌ বদল হয় না। কোন প্রসঙ্গে যদি একাধিক প্রকারের ব্যাখ্যার সুযোগ আছে বলে দেখা যায়, তাহলে তার কারণ সম্ভবত এ হতে পারে যে, কুরআনের রচনা পদ্ধতি বর্তমান কালের রচনা পদ্ধতির তুলনায় অনেক সহজ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উচ্চারণের গতি নির্দেশক চিহ্ন (জের, জবর, পেশ প্রভৃতি) না থাকার ফলে কোন ক্রিয়াপদ সকর্মক হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার অকর্মক হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে; কোন লিঙ্গ পুংলিঙ্গ হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বাক্যের প্রসঙ্গেই যেহেতু অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায় সেহেতু এ অসুবিধা আসলে কোন অসুবিধাই নয়।

কুরআনের ১১৪টি সূরা দৈর্ঘ্য অনুসারে বড় সূরার পরে ছোট সূরা সাজানো আছে; কিন্তু এ নিয়মের আবার ব্যতিক্রমও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অহি নাযিল হওয়ার ক্রমিকতা বজায় থাকলেও সর্বত্র তা নেই। একই বিষয়ের অনেক বর্ণনা এবারতের বিভিন্ন স্থানে এসেছে; ফলে পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, একই অনুচ্ছেদে এমন একটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যা অপর একটি অনুচ্ছেদে অসম্পূর্ণ অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত অনেক বিষয়ের মত আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ করা নেই।

আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিঃ বাইবেলের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে ওল্ড টেস্টামেন্টে একটিমাত্র জায়গায় যেমন একটি দীর্ঘ একক বর্ণনা আছে, কুরআনে তেমন কোন একক বর্ণনা নেই। একটিমাত্র ধারাবাহিক বর্ণনার বদলে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে, যেখানে সৃষ্টির কতিপয় দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির ক্রমবিকাশের পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য দেয়া হয়েছে। এ তথ্য কখনও বিস্তারিত কখনও সংক্ষিপ্ত। ঐ ঘটনাবলী কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে বহুসংখ্যক সূরা থেকে আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত করা প্রয়োজন।

কেবলমাত্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কেই যে এ অবস্থা বিদ্যমান তা কিন্তু নয়। একই বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও প্রসঙ্গ বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই কুরআনে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবী বা আকাশমন্ডল সম্পর্কিত নানা বিষয়, কিংবা মানবজাতি সম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে এবং এ বিষয়গুলি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ আগ্রহী বা কৌতুহলী হতে পারেন। এ সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিশ্রম করে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি একত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে।

অনেক ইউরোপীয় ভাষ্যকারই মনে করেন যে, সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা একই প্রকারের এবং এ কারণে তাঁরা এ দুটি বর্ণনা পাশাপাশি উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু আমি মনে করি যে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বর্ণনা দুটির মধ্যে স্পষ্টপতই অনেক পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ গুরুত্বহীন নয়, এমন অনেক বিষয়ে কুরআনে বিবরণ আছে, কিন্তু বাইবেলে তার কোন সমকক্ষ নেই। আবার বাইবেলেও এমন বিবরণ আছে, কুরআনে যার কোন সমকক্ষ নেই।

দু এবারতের দৃশ্যত সাদৃশ্যের ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। এ সাদৃশ্যের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্টিকার্য ছয়টি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়েছে বলা আছে। বাইবেলে ছয় দিনের কথা বলা হয়েছে, কুরআনেও ছয় দিনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে বিষয়টি অমন সহজ নয়, বেশ জটিল; সুতরাং একটু পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে।

সৃষ্টির ছয় মেয়াদ

বাইবেলের বর্ণনা মুতাবিক সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হয় এবং সপ্তম দিন সাব্বাথ, অর্থাৎ বিশ্রামের দিন ছিল। এ সাত দিন সপ্তাহের সাতটি দিনের অনুরূপ। বাইবেলের এ

বর্ণনায় কোন অস্পষ্টতা নেই। এখানে উল্লিখিত বর্ণনা বাইবেলের স্যাকারডোটাল সংস্করণে আছে এবং এ সংস্করণ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ইয়াভিষ্ট সংস্করণের বর্ণনা এখন সংক্ষেপ করে মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যে আনা হয়েছে। ফলে এ প্রসঙ্গে তা আদৌ বিবেচনার যোগ্য নয়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পুরোহিতগণ এ বর্ণনা অনুসরণ করায় সাধারণ মানুষ সাব্বাথ পালনে উৎসাহিত হয়। ঈশ্বর যেমন ছয়দিন পরিশ্রমের পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে ইহুদীগণও সাব্বাথ দিবসে (হিব্রু সাব্বাথ শব্দের অর্থ বিশ্রাম) বিশ্রাম গ্রহণ করবে বলে আশা করা হত।

বাইবেলে যে ভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তাতে দুনিয়ার অধিবাসী একজন মানুষের কাছে দুটি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময় বলতে যা বুঝায়, 'দিন' বলতে তাই বুঝানো হয়েছে। এ অর্থে দিন তাহলে পৃথিবীর নিজ অক্ষরেখার চারদিকে এক বার ঘুরে আসার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি, সূর্য সৃষ্টি হয়নি এবং পৃথিবীর নিজের বা সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হওয়ার কোন সুযোগই সৃষ্টি হয়নি, তখন ঐ 'দিন' এল কোথা থেকে? দিনের হিসাবই বা পাওয়া গেল কেমন করে? সুতরাং যুক্তি ও সঙ্গতির মুকাবিলায় বাইবেলের বর্ণনা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ বইয়ের গোড়ার দিকেই এ অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআনের অধিকাংশ তরজমা মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বাইবেলের মত কুরআনেও ছয় দিনে সৃষ্টি সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। তরজমাকারীগণ যে সংশ্লিষ্ট আরবী শব্দটির অতি সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন, এজন্য তাঁদের বোধহয় তেমন দোষ দেয়া যায় না। কুরআনের ৭ নম্বর সূরার (আরাফ) ৫৪ নম্বর আয়াত সাধারণত এভাবে তরজমা করা হয়ে থাকেঃ

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছ'দিনে সৃষ্টি করেন।"

কুরআনের অতি অল্প সংখ্যক তরজমা ও ভাষ্যেই এ কথা পাওয়া যায় যে, 'দিন' বলতে আসলে 'মেয়াদ' বুঝতে হবে। আবার এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে তৎকালে বহুল প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত এড়ানোর জন্যই কুরআনের এবারতে 'দিনের' কথা বলা হয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ বাতিল না করেও আমরা বোধহয় খোদ কুরআনেই সমস্যাটির সমাধান অনুসন্ধান করতে পারি এবং আরও সাধারণভাব তৎকালে প্রচলিত ভাষায় শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি। বহু তরজমাকারী যে শব্দটির তরজমা করেছেন এবং এখনও করছেন 'দিন' বলে, আরবী ভাষায় সেই শব্দটি হচ্ছে 'য়্যাওম', বহুবচনে 'আইয়াম।'

শব্দটির প্রচলিত সাধারণ অর্থ 'দিন'। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ অর্থে একদিনের সূর্যাস্ত থেকে পরদিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় না বুঝিয়ে একদিনের সূর্যোদয়

থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ই বেশী বুঝিয়ে থাকে। বহুবচনের আইয়াম শব্দটি কেবলমাত্র 'দিনগুলি'ই বুঝায় না, 'সুদীর্ঘ সময়'ও বুঝিয়ে থাকে। অনির্দিষ্ট সময় বুঝায় বটে, কিন্তু সর্বদাই দীর্ঘ বুঝায়। শব্দটির অর্থে যে 'সময়ের মেয়াদ' এ তাৎপর্য আছে, কুরআনের অন্যত্র তার নজীর পাওয়া যায়। ৩২ সূরার (সিজদা) ৫ আয়াত দেখুনঃ

"...যে দিনের (য়্যাওম) দৈর্ঘ্য হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান।"

উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক পূর্ববর্তী আয়াতেই ছয় মেয়াদে সৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার উল্লেখ আছে।

আবার ৭০ সূরার (মাআরিজ) ৪ আয়াত দেখুনঃ

"... এমন একদিনে (য়্যাওম) যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।" 'দিন' বলতে যা বুঝায় 'য়্যাওম' বলতে যে তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সময়ের মেয়াদ বুঝায়, আদি ভাষ্যকারগণ তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; কিন্তু বিশ্বমন্ডল সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমরা এখন যা কিছু জানি, সেই জ্ঞান তাঁদের ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পৃথিবীর পরিক্রমণের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে দিন বলতে যা বুঝায়, ষোড়শ শতাব্দীতে আবুস সুউদের সেই জ্ঞান থাকা সম্ভব ছিল না; কিন্তু তবু তিনি মনে করেছিলেন যে, সৃষ্টিকার্যের সময়টি বিভিন্ন মেয়াদে বিভক্ত ছিল, কিন্তু দিন বলতে যা বুঝায়, ঐ মেয়াদ তা ছিল না। বরং সৃষ্টির মেয়াদ বিভিন্ন 'ঘটনায়' (আরবী ভাষায় নাওবা) বিভক্ত ছিল।

আধুনিক ভাষ্যকারগণও এ একই অভিমত পোষণ করে থাকেন। সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কিত প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যায় ইউসুফ আলী তাঁর ভাষ্যে (১৯৩৪) বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, য়্যাওম শব্দটির তাৎপর্য 'দিন' বলে ব্যাখ্যা করা সঠিক নয়, প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে 'অতি দীর্ঘ সময়, অথবা যুগ যুগ, এমনকি শত-সহস্রাব্দ কাল।'

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টি কার্যের জন্য কুরআনে ছয়টি সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছে বলা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বমন্ডল সৃষ্টি ও গঠনের জটিল প্রক্রিয়ায় যে ছয়টি পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে তা সাব্যস্ত করা সম্ভব না হলেও এ সত্য অতি অবশ্যই সাব্যস্ত হয়েছে যে, ঐ প্রক্রিয়ায় অতিশয় দীর্ঘ একাধিক মেয়াদের সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং ঐ মেয়াদকে 'দিন' বলতে আমরা যা বুঝি সে অর্থে অনুমান করা হাস্যকর।

কুরআনের একটি অন্যতম দীর্ঘ অনুচ্ছেদে সৃষ্টিকার্য বিষয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে পৃথিবী বিষয়ক কতিপয় ঘটনার পাশাপাশি আসমান বিষয়ক একটি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। ৪১ সূরার (হামিম আস্‌সিজদা) ৯-১২ আয়াতে বলা হয়েছেঃ (আল্লাহ রসূলকে বলেছেন)

"বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দু দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাও? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক!"

"তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যাহারা ইহার অনুসন্ধান করে। অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যাহা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ! অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত আছি।'

অতঃপর তিনি আকাশ মন্ডলকে দু দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তাহার কর্তব্য ব্যক্ত করিলেন এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলেন সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যাস্ত।"

এ চারটি আয়াতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত জ্যোতির্মন্ডলের প্রাথমিক বাষ্পীয় প্রকৃতি এবং আকাশমন্ডলের সংখ্যা সাত হওয়ার প্রতীকী সংজ্ঞা বিশেষ অনুসন্ধানের দাবী রাখে। আমরা এ সংখ্যার অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য জানতে পারব। আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে আল্লার কথোপকথনও প্রতীকধর্মী। এখানে অবশ্য আকাশমন্ডল ও পৃথিবী গঠিত হওয়ার পর আল্লার হুকুমের কাছে তাদের নতি স্বীকার করার ব্যাপারটিই প্রকাশ করা হয়েছে।

সমালোচকগণ অবশ্য এখানে সৃষ্টির ছয় মেয়াদের সঙ্গে একটি বিরোধিতা দেখতে পেয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, পৃথিবী সৃষ্টির দু মেয়াদ, বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য বিতরণের চার মেয়াদ, এবং আকাশমন্ডল সৃষ্টির দুই মেয়াদ, মোট আট মেয়াদ হয়ে যায়। সুতরাং আগে যে ছয় মেয়াদের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে একটি স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়।

কিন্তু এ এবারত মানুষকে আল্লার সার্বভৌমত্ব অনুধাবনের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং এবারতটি আসলে দুভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে পৃথিবী এবং দ্বিতীয় ভাগে আকাশমন্ডলের কথা বলা হয়েছে। এ দুটি ভাগ আরবী 'ছুম্মা' শব্দ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। শব্দটির অর্থ 'আরও' হতে পারে, তদতিরিক্ত হতে পারে, এবং 'তারপর'ও হতে পারে। সুতরাং বর্ণিত ঘটনাবলী অথবা মানুষের অনুধাবনের 'ক্রমিকতা'র দিকনির্দেশকও হতে পারে। আবার একইভাবে ক্রমিকতার কোন ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই নিছক ঘটনাবলীর বর্ণনাও হতে পারে। সে যাই হোক না কেন, আকাশমন্ডল সৃষ্টির দুটি মেয়াদের সঙ্গে অতি সহজেই একীভূত হয়ে থাকতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির প্রক্রিয়া কুরআনে কিভাবে পেশ করা হয়েছে, তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব এবং আমরা পরীক্ষা ও তুলনা করে আরও দেখতে পাব যে, ঐ প্রক্রিয়া আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রতি যুগ্মভাবে প্রযোজ্য এবং এ প্রক্রিয়াই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ঐ চারটি আয়াতে বর্ণিত ঘটনাবলীর একই সময়ে একই সঙ্গে ঘটার ধারণা যে কতখানি যুক্তিসঙ্গত, আমরা তখন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারব।

সুতরাং কুরআনের অন্যত্র ছয় মেয়াদে বিশ্বসৃষ্টির যে বিবরণ আছে, তার সঙ্গে এখানে উধৃত বিবরণের আদৌ কোন বিরোধ নেই।

কুরআনে দুনিয়া ও আকাশমন্ডল সৃষ্টির কোন ক্রমিকতা দেয়া নেই

উপরে উধৃত কুরআনের দুটি সূরায় সৃষ্টির প্রসঙ্গ আছে। সূরা আরাফের ৫৪ আয়াতে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে সূরা হামিম আস-সিজদার ৯-১২ আয়াতে পৃথিবী ও আকাশমন্ডল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর কোনটির পর কোনটি সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে কুরআনে কোন ক্রমিকতা দেয়া হয়নি।

যে কয়টি সূরায় প্রথমে পৃথিবীর উল্লেখ আছে, তার সংখ্যা খুবই কম, মাত্র দুটি। সূরা বাকারার ২৯ আয়াত, এবং সূরা ত্বাহার ৪ আয়াতে বলা হয়েছে "তিনি, যিনি পৃথিবী ও উচ্চ আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছেন।" পক্ষান্তরে যে সকল সূরায় আকাশমন্ডলের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী, মোট নয়টি। সূরা আরাফের ৫৪ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩ আয়াত, সূরা হুদের ৭ আয়াত, সূরা ফুরকানের ৫৯ আয়াত, সূরা আস-সিজদার ৪ আয়াত, সূরা কাফের ৩৮ আয়াত, সূরা হাদিদের ৪ আয়াত, সূরা আন-নাযিয়াতের ২৭-৩৩ আয়াত, এবং সূরা আস-শামসের ৫-১০ আয়াত।

প্রকৃতপক্ষে সূরা নাযিয়াত ছাড়া অন্যত্র কোথাও সুনির্দিষ্ট কোন ক্রমিকতা দেয়া হয়নি। অন্যত্র 'ওয়া' অর্থাৎ 'এবং' শব্দ দ্বারা দুটি বিষয়ের সংযোগ সাধন করা হয়েছে; অথবা 'ছুম্মা' অর্থাৎ 'তদুপরি বা আরও' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে শুধু সংযোগও বুঝা যেতে পারে, আবার ক্রমিকতাও বুঝা যেতে পারে।

আমার মনে হয় কুরআনের মাত্র একটি সূরায় সৃষ্টিকার্যের বিভিন্ন ঘটনার একটি নির্দিষ্ট ক্রমিকতা বর্ণিত হয়েছে। সূরা আন-নাযিয়াতের ২৭-৩৩ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"তোমাদের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন; তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

তিনি রাত্রিকে করেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসে প্রকাশ করেন সূর্যালোক; অতঃপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন; তিনি উহা হইতে উহার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন; এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য।"

মানুষের জন্য দুনিয়ায় আল্লার নিয়ামতের এ বিবরণ আরব উপত্যকার কৃষক ও বেদুইনদের উপযোগী ভাষায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার আগে আকাশমন্ডলের সৃষ্টি

বিষয়ে চিন্তা করতে আহবান জানানো হয়েছে। রাত্রি ও দিনের বিবর্তন সম্পন্ন করার পর আল্লাহ যে পর্যায়ে পৃথিবী বিস্তৃত ও উর্বর করলেন তা সময়ের ক্রমিকতায় খুবই সঠিক স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং এখানে দু শ্রেণীর ঘটনাবলীর কথা বলা হয়েছে, একটি আকাশমন্ডল বিষয়ক এবং অপরটি দুনিয়া বিষয়ক, যার স্থান সময়ের ক্রমিকতায় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে যেভাবে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, বিস্তৃত হওয়ার আগে নিশ্চয়ই দুনিয়ার অস্তিত্ব ছিল; সুতরাং আল্লাহ যখন আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেন তখন পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল। তাছাড়া আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বিস্তৃতি ও পারস্পরিক সংযুক্তি থেকেও তাদের সহ-অবস্থিতির একটি ধারণা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কুরআনের আয়াতে পৃথিবী আগে সৃষ্টি হওয়ার অথবা আকাশমন্ডল আগে সৃষ্টি হওয়ার উল্লেখের মধ্যে কোন বিশেষ তাৎপর্য অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত না হয়ে থাকলে শব্দের অবস্থানের কারণে সৃষ্টির ক্রমিকতা প্রভাবিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

জ্যোর্তিমন্ডল গঠনের মৌলিক প্রক্রিয়া এবং তার ফলে গ্রহ উপগ্রহের গঠন

জ্যোর্তিমন্ডল সৃষ্টির মৌলিক প্রক্রিয়া বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ কুরআনের দুটি আয়াতে দেয়া হয়েছে।

সূরা আম্বিয়া, ৩০ আয়াতঃ "সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়াছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না?"

সূরা হামিম আস-সিজদা ১১ আয়াতঃ "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত আছি।"

কুরআনে উল্লেখিত অন্যান্য জৈবিক সমস্যার সঙ্গে পানি থেকে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। বর্তমানে নিম্নবর্ণিত দুটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজনঃ

(ক) ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম কণা সম্বলিত ধূম্রপুঞ্জের উপস্থিতি সম্পর্কিত বিবরণ; আরবী 'দুখান' শব্দে ঐরূপ বস্তুই বুঝায়। ধুম্র সাধারণত একটি বাষ্পীয় উপবস্তুর দ্বারা গঠিত হয়। তার সঙ্গে সুক্ষ্ম কণাসমূহ ঝুলন্ত অবস্থায় মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। বেশী বা কম তাপমাত্রায় এ কণাগুলি কঠিন এমনকি তরল অবস্থায়ও থাকিতে পারে।

(খ) যে একক ধুম্ররাশির উপাদান সমূহ প্রথমে একত্রিত (আরবী রাত্ক) করা হয়েছিল, তা পৃথক (আরবী ফাত্ক) করার প্রক্রিয়ার উল্লেখ। উল্লেখযোগ্য যে, আরবী 'ফাত্ক' শব্দ দ্বারা চূর্ণ করা, বিচ্ছিন্ন করা ও পৃথক করা বুঝায় এবং 'রাত্ক' শব্দ দ্বারা কোন একক বস্তু প্রস্তুত করার জন্য একাধিক উপাদান একীভূত বা দ্রবীভূত করা বুঝায়।

কুরআনের অন্যান্য আয়াতে গ্রহ-উপগ্রহের প্রসঙ্গে একটি মূল বস্তুকে কতিপয় ভাগে ভাগ করার ধারণা পাওয়া যায়। কুরআনের শুরুতেই উদ্বোধনী স্মরণিকা 'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে'-এর পরেই প্রথম সূরার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে- "প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।"

এ 'বিশ্বজগত' শব্দটি কুরআনে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে আকাশমন্ডলও বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের কারণেই নয়, প্রতীকধর্মী ৭ সংখ্যার কারণেও বটে।

বিভিন্ন সংখ্যাগত পরিমাণ বুঝানোর জন্য এ সংখ্যাটি (৭) কুরআনে ২৪ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এটা প্রায়শ 'বহু' অর্থ বহন করে; কেন করে তা আমরা জানি না। অনির্দিষ্ট বহুবচনের সংখ্যা বুঝানোর জন্য গ্রীক ও রোমানগণ ৭ সংখ্যা ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়। কুরআনে ৭ সংখ্যা দিয়ে খোদ আকাশমন্ডলই (সামাওয়াত) বুঝানো হয়। এমনকি এ সংখ্যাটিই আকাশমন্ডল বুঝায়। আকাশমন্ডলের ৭টি পথের কথা একবার উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৯)।

"আমি তো তোমাদিগের উর্ধে সৃষ্টি করিয়াছি সাত রাস্তা এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অনবধান নহি।" (সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৭)।

"যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না; আবার তাকাইয়া দেখ কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কিনা?" (সূরা মূলক, আয়াত ৩)।

"তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে?" (সূরা নূহ, আয়াত ১৫-১৬)।

(উল্লেখযোগ্য যে, বাইবেলে চন্দ্র ও সূর্য উভয়কেই 'আলোক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে চন্দ্রকে বলা হয়েছে আলো (নূর) এবং সূর্যকে এ আয়াতে বলা হয়েছে আলো প্রদানকারী প্রদীপ (সিজার)। পরে আমরা দেখতে পাব সূর্য সম্পর্কে অন্যান্য বিশেষণও প্রয়োগ করা হয়েছে)।

"আমি তোমাদিগের উর্ধদেশে সুস্থিত সপ্ত-আকাশ নির্মাণ করিয়াছি, এবং প্রোজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করিয়াছি।" (সূরা নাবা, আয়াত ১২-১৩)।

এখানে প্রোজ্জ্বল দীপ বলতে সূর্য বুঝায়। কুরআনের ভাষ্যকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, ৭ সংখ্যা দ্বারা বহুবচন ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। কুরআন ছাড়াও মুহাম্মদের (সঃ) আমলের অন্যান্য এবারতেও ৭ সংখ্যা দ্বারা বহুবচন বুঝানো হয়েছে বলে দেখা যায়। তাছাড়া তাঁর আমলের পরের প্রথম শতাব্দী থেকে লিখিত হাদীসেও ঐ একই অর্থ পাওয়া যায়।

সুতরাং আকাশও অনেক আছে এবং পৃথিবীও অনেক আছে। কুরআনের পাঠক সেহেতু বিস্মিত হতে পারেন যে, আমাদের এ পৃথিবীর মত আরও পৃথিবী হয়ত থাকতে পারে। আমাদের আমল পর্যন্ত এ সত্য অবশ্য এখনও মানুষের দ্বারা প্রমাণিত হয়নি, তবে ৬৫ সূরার (তালাক) ১২ আয়াতে নিম্নরূপ আগাম খবর আছেঃ

"আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তাকাশ এবং পৃথিবীও অনুরূপ ভাবে, আকাশ ও পৃথিবীর সর্বস্তরে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ; ফলে, তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত কিছু তাঁহার জ্ঞানগোচর।"

যেহেতু আমরা আগেই দেখেছি যে, ৭ সংখ্যা দ্বারা অনির্দিষ্ট বহুবচন বা বহু সংখ্যা বুঝায়, সেহেতু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে, কুরআনের বর্ণনায় আমাদের এ পৃথিবীর মত আরও অনেক পৃথিবী বিশ্বজগতে আছে বলে আভাস পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর পাঠক আর একটি বিষয় দেখে অবাক হবেন যে, কুরআনে তিন শ্রেণীর সৃষ্টবস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে- (১) আকাশমন্ডলের বস্তু, (২) পৃথিবীর বস্তু, এবং (৩) আকশমন্ডল ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানের বস্তু।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি লক্ষণীয়ঃ

"যাহা আছে আকাশমন্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দুয়ের অন্তবর্তীস্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারই।" (সূরা তা'হা, আয়াত ৬)।

"তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন।" (সূরা ফুরকান, আয়াত ৯)।

"আল্লাহ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অর্ন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে।" (সূরা সিজদা, আয়াত ৪)।

"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে; ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নাই।" (সূরা কা'ফ, আয়াত ৩৮)।

[সৃষ্টিকার্য যে আল্লাহকে ক্লান্ত করেনি এ কথা বাইবেলের একটি বর্ণনার জবাব বলে গণ্য হতে পারে। ঐ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ছয় দিন কাজ করার পর সপ্তম দিনে আল্লাহ বিশ্রাম গ্রহণ করেন।]

উপরোক্ত আয়াতগুলি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলিতে 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর

অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু' বিষয়ের উল্লেখ আছ- সূরা ২১ (আম্বিয়া) আয়াত ১৬; সূরা ৪৪ (দুখান) আয়াত ৭ ও ৩৮; সূরা ৭৮ (নাবা আয়াত ৩৭; সূরা ১৫ (হিজর) আয়াত ৮৫; সূরা ৪৬ (আহকাফ) আয়াত ৩; এবং সূরা ৪৩ (জুখরুফ) আয়াত ৮৫।

আকাশমন্ডলীর বাইরে এবং পৃথিবীর বাইরে সৃষ্টবস্তুর কল্পনা করা খুবই কঠিন। এ আয়াতগুলির অর্থ উপলব্ধি করার জন্য সহজ থেকে জটিলের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে সৌরমন্ডল বহির্ভূত বস্তু সম্পর্কে মানুষ যা নির্ণয় করতে পেরেছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং তারপর বিশ্বজগতের গঠনপ্রণালী বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান যে ধারণায় উপনীত হয়েছে তাও জানা প্রয়োজন। পরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যাওয়ার আগে সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনে যে খবর আছে, সেদিকে আর একবার নজর দেয়া যেতে পারে। উপরে লিখিত আয়াতগুলি থেকে এ খবর পাওয়া যায়ঃ

১। সৃষ্টির জন্য সাধারণভাবে ছয়টি মেয়াদ আছে।

২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে পরস্পরের সংযোগ সাধন।

৩। একটি প্রাথমিক ধুম্ররাশি খন্ডিত হওয়ার পর তার মধ্য থেকে বিশ্বজগত সৃষ্টি।

৪। আকাশ ও পৃথিবী বহুসংখ্যক হওয়া।

৫। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অন্তবর্তী স্থানে সৃষ্টবস্তু থাকা।

বিশ্বজগতের গঠন বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের কতিপয় তথ্যঃ

সৌরমন্ডল

সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী ও গ্রহমন্ডলী এমন একটি সুশৃংখল বিরাট ব্যাপার যে, মানুষের পরিমাপে তা অতিকায় মনে হয়। অথচ পৃথিবী সূর্য থেকে মোটামুটিভাবে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। মানুষের হিসাবে এ দূরত্ব নিঃসন্দেহে খুবই বেশী, কিন্তু সূর্য থেকে দূরতম স্থানে অবস্থিত গ্রহের (প্লুটো) দূরত্বের তুলনায় অনেক কম। সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব ৩৬৭ কোটি ২০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় ৪০ গুণ বেশী। এ দূরত্ব দ্বিগুণ করা হলে সৌরজগতের সর্বাধিক বৃহৎ আকারের একটি আন্দাজ পাওয়া যায়। সূর্যের আলো প্লুটো গ্রহে পৌঁছতে প্রায় ৬ ঘন্টা সময় লাগে, অথচ ঐ আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। সুতরাং আমাদের জানা সৌরমন্ডলের প্রান্তদেশে অবস্থিত তারকারাজির আলোক আমাদের কাছে পৌঁছতে কোটি কোটি বছর সময় লেগে যায়।

তারকারাজি

আমাদের এ পৃথিবী সূর্যের একটি উপগ্রহ মাত্র। সূর্য এবং তার চারদিকে ঘূর্ণায়মান বিভিন্ন গ্রহ আকারে প্রকারে কোটি কোটি তারকার রাজ্যে খুবই ক্ষুদ্র। গরম কালের রাতে সমগ্র মহাশূন্য তারকায় পরিপূর্ণ বলে মনে হয় এবং এ তারকারাজি 'ছায়াপথ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এ ছায়াপথ বিরাটাকার ও অতিকায়। সৌরজগতে আলোর গতি যদি ঘন্টা হিসাবেও ধরা হয়, তাহলে সমগ্র তারকা রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ঘন তারকাগুচ্ছের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলো পৌছাতে প্রায় ৯০ হাজার বছর সময় লেগে যাবে।

আমাদের পৃথিবী যে তারকা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তা অবিশ্বাস্যভাবে অতিকায় বটে, কিন্তু তবু আকাশমন্ডলের তা একটি অতিশয় ক্ষুদ্র অংশমাত্র। তাছাড়া আমাদের তারকা রাজ্যের বাইরেও ছায়াপথের মত বহু তারকাপুঞ্জ আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যুক্তরাষ্ট্রে মাউন্ট উইলসনের মত সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী টেলিস্কোপ নির্মিত হওয়ার পর মাত্র পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী সময় আগে ঐ সকল তারকাপুঞ্জ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। এগুলি বিপুল সংখ্যক এবং এত বেশী বেশী দূরত্বে অবিস্থত যে, ঐ দূরত্ব পরিমাপের জন্য 'আলোকবর্ষ' নামে একটি বিশেষ হিসাব নির্ধারণ করতে হয়েছে। প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল গতিতে ৩২৬ বছর চললে যে দূরত্ব পাওয়া যায়, তাকে এক আলোকবর্ষ বলা হয়।

তারকা, তারকাপুঞ্জ ও গ্রহ ব্যবস্থার গঠন ও বিকাশ

তারকারাজ্য বর্তমানে যে স্থান দখল করে আছে, সেখানে আদিতে কি ছিল? আধুনিক বিজ্ঞানে এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। বিশ্বজগতের বিকাশের ধারায় কিছুটা মেয়াদের কথা হয়ত বলা যেতে পারে। কিন্তু ঐ মেয়াদ আমাদের বর্তমান আমলের কতদিন আগে ছিল তা বলার কোন উপায় নেই।

আধুনিক বিজ্ঞান থেকে প্রাচীনতম যে খবর পাওয়া সম্ভব, তা হচ্ছে এই যে, বিশ্বজগত একটি বাষ্পরাশি থেকে গঠিত হয়েছে। প্রধানত হাইড্রোজেন এবং কিছু পরিমাণ হেলিয়াম দ্বারা গঠিত ঐ বাষ্পরাশি ধীরে ধীরে ঘুরছিল। পরে তা অতিকায় বহু খন্ডে খন্ডিত হয়ে যায়। পদার্থবিদগণ অনুমান করেছেন যে, এক একটি খন্ডের আকার সূর্যের বর্তমান আকারের একগুণ থেকে এক হাজার কোটি গুণ পর্যন্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, সূর্যের বর্তমান আয়াতন পৃথিবীর আয়তনের ৩ লক্ষ গুণ। ঐ খন্ডগুলি থেকেই তারকাপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর খন্ডগুলি পুনরায় খন্ডিত হয়ে এক একটি তারকার সৃষ্টি হয়। খন্ডগুলি

ক্রমাগত দ্রুততর বেগে ঘুরছিল। এক সময় শীতল হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং চাপ, মাধ্যাকর্ষণ চুম্বক ও বিকিরণ শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সংকুচিত হওয়ার ফলে এবং ঘূর্ণন শক্তি তাপশক্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে তারকাগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর তাপ ও অনুশক্তির ক্রিয়া শুরু হওয়ায় হালকা অণূর সমন্বয়ে ভারী অণূ গঠিত হয়। এভাবে বিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে হাইড্রোজেন থেকে হেলিয়াম পরে কার্বন ও অক্সিজেন এবং শেষ পর্যন্ত ধাতু ও ধাতুমূল গঠিত হয়। এরূপে তারকাদের একটি নিজস্ব জন্ম-প্রক্রিয়া পাওয়া যায় এবং আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিবর্তনের বর্তমান পর্যায় অনুসারে তাদের শ্রেনীবিভাগ করা হয়ে থাকে। তারকাদের আবার মৃত্যুও হয়ে থাকে। বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর অনেক তারকার আভ্যন্তরিক বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে দেখা গেছে এবং তার ফলে তারা প্রকৃতপক্ষে 'লাশ' হয়ে গেছে।

আদি বাষ্পরাশি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন গ্রহ এবং বিশেষত পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। বিগত পঁচিশ বছরেরও বেশী সময় যাবত একটি ব্যাপারে আর আদৌ কোন দ্বিমত পোষণ করা হয়নি যে, সূর্য বাষ্পরাশির একটি একক খন্ডের অভ্যন্তরে ঘনত্ব লাভ করে এবং অন্যান্য গ্রহ তার চতুর্দিকের খন্ড খন্ড বাষ্পরাশির মধ্যে ঘনত্ব লাভ করে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উপর খুবই জোর দেয়া প্রয়োজন এবং তা আলোচ্য বিষয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সূর্যের মত জ্যোতিষ্ক অথবা পৃথিবীর মত অজ্যোতিষ্কের গঠন প্রক্রিয়ায় কোন কালানুক্রম বা আগে পিছের কোন ব্যাপার নেই। উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে একটি সমতা ও সমসাময়িকতা আছে।

এ সকল ঘটনা কখন ঘটেছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানে কিছু খবর দেয়ার চেষ্টা আছে। আমাদের তারকা রাজ্যের বয়স দশ হাজার কোটি বছর অনুমান করে নিয়ে বলা হয়ে থাকে যে তার পাঁচ হাজার কোটি বছর পরে সৌরমন্ডল গঠিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের রশ্মিবিদ্যার পরীক্ষামতে পৃথিবী ও সূর্যের গঠন সাড়ে চার হাজার কোটি বছর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জ্যোর্তিমন্ডলের সাধারণ গঠন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে জ্যোতির্পদার্থবিদগণ যথেষ্ট উচ্চতর জ্ঞান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই- একটি ঘূর্ণায়মান বাষ্পরাশি ঘন ও সংকুচিত হয়েছে এবং তা খন্ড খন্ড হয়ে সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহ গঠিত হয়ে তাদের নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে আকাশের এ পৃথিবীও ছিল। চাঁদের ব্যাপারে এখন এ সম্ভাবনা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে, ঘূর্ণায়মান অবস্থা ধীরগতি হয়ে আসার সময় চাঁদ ক্রমে ক্রমে পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আদি বাষ্পরাশি এবং তা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত অসংখ্য তারকারাজির সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ যে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন, তার ফলে একাধিক বিশ্ব থাকার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে আমাদের এ পৃথিবীর মত আরও পৃথিবী আছে, তেমন কিছু কিন্তু নিশ্চিত বা প্রমাণিত হয়নি।

বহু বিশ্বের ধারণা

তবুও জ্যোর্তিপদার্থবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, পৃথিবীর মত আরও গ্রহ থাকা খুবই সম্ভব। তবে জ্যোতির্মন্ডলের সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে মনে করা হয় যে, সেখানে পৃথিবীর অনুরূপ পরিবেশ বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং অন্য পৃথিবীর অনুসন্ধান করতে হলে তা সৌরমন্ডলের বাইরেই করতে হবে এবং নিম্নলিখিত কারণে সেখানে অন্য পৃথিবী থাকা খুবই সম্ভব বলে মনে করা হয়।

বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, আমাদের তারকা রাজ্যের দশ হাজার কোটি তারকার মধ্যে অন্তত অর্ধেকের ক্ষেত্রে সূর্যের মত উপগ্রহ ব্যবস্থা আছে। ঐ পাঁচ হাজার কোটি তারকা সত্য সত্যই সূর্যের মত আস্তে আস্তে ঘুরে থাকে এবং এ বৈশিষ্ট থেকে এ আভাস পাওয়া যায় যে, তাদের প্রত্যেকেরই একাধিক নিজস্ব উপগ্রহ আছে। তারকাগুলি পৃথিবী থেকে এত বেশী দূরে অবস্থিত যে, তাদের উপগ্রহগুলি দেখতে পাওয়া যায় না। তবে তারকাগুলির পরিক্রমণ পথ কিছুটা বক্র ও ডেউয়ের আকারের হওয়ায় উপগ্রহ থাকা খুবই সম্ভব বলে মনে করা হয়। বার্ণাড তারকার অন্ততপক্ষে এমন একটি সঙ্গী উপগ্রহ আছে, যা জুপিটারের চেয়ে অনেক বড় এবং এমন কি দুটি উপগ্রহও থাকতে পারে। এ সম্পর্কে পি গুয়েরিন লিখেছেনঃ "সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে এ ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, উপগ্রহ-ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বজগতেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র সৌরমন্ডলে ও পৃথিবীতেই এ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে তা নয়।" এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই "প্রাণ লালনকারী গ্রহের মতই বিশ্বজগতের সর্বত্র প্রাণ ছড়িয়ে আছে। বিশেষত যে সকল স্থানে প্রাণের বিকাশের উপযোগী বস্তুগত ও রাসায়নিক পরিবেশ বিদ্যমান আছে।"

আন্ততারকা পদার্থ

আমরা আগেই দেখেছি যে, আদি বাষ্প ঘনীভূত ও খন্ড-বিখন্ড হয়ে তারকা, গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারপরও যে বাষ্প 'অবশিষ্ট' ছিল, তা এখন বিভিন্ন তারকার মধ্যবর্তী স্থান দখল করে আছে। এ বাষ্পের কিছুটা কণা আবার ধুম্র জাতীয় পদার্থ এবং যথেষ্ট উজ্জ্বল। ফলে তার উপরে তারকার আলোক প্রতিফলিত হয়। কিছু বাষ্প আবার কালো এবং অপেক্ষাকৃত কম ঘন এবং তা জ্যোতির্বিদদের জরীপ কাজে বাধা সৃষ্টি করে থাকে বলে জানা যায়। এ পদার্থ বিভিন্ন তারকারাজির মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে বহাল আছে। বিভিন্ন তারকারাজির মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব আছে, তার কথা বিবেচনা করলে মনে হয় যে, এ পদার্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন হলেও তার মোট পরিমাণ সমগ্র তারকারাজির পরিমাণের চেয়ে সম্ভবত অনেক বেশি। এ. বইকট এ পদার্থের

পরিস্থিতির উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে, একমাত্র এ 'পদার্থের কারণে' বিশ্বজগতের ক্রমবিকাশের ধারণা যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

এখন আমরা এ আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে দুনিয়া জাহানের সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের ধারণা বিবেচনা করে দেখতে পারি।

কুরআনের তথ্যের মুকাবিলায়

যে পাঁচটি ক্ষেত্রে কুরআনে সৃষ্টি বিষয়ে যে তথ্য দেয়া আছে, আমরা তা পরীক্ষা করে দেখব।

১। কুরআনের বক্তব্য মুতাবেক আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির ছয় মেয়াদে যে সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা হচ্ছে জ্যোতির্মন্ডল ও পৃথিবীর গঠন এবং মানুষের বাসযোগ্য (খাদ্যসহ) হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর ক্রমবিকাশ। পৃথিবীর ক্ষেত্রে কুরআনে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা ঘটতে চার মেয়াদ সময় লেগেছে। এ চার মেয়াদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের ভূতাত্ত্বিক চার মেয়াদের মিল আছে। আর আমরা জানি, মানুষের বসতি শুরু হয়েছে শেষ মেয়াদে। অবশ্য বিজ্ঞানের এ মেয়াদ বিভক্তি নিছক অনুমান মাত্র। সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারেন না।

লক্ষণীয় যে, আল কুরআনের সূরা হামিম-আস-সিজদায় (৯-১২ আয়াত) জ্যোতির্মন্ডল ও পৃথিবীর গঠন দু পর্যায়ে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন সূর্য ও তার উপজাত পৃথিবীকে যদি আমরা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করি (একমাত্র এ উদাহরণই আমাদের বোধগম্য), তাহলে দেখা যায়, বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে, আদি বাষ্প ঘনীভূত ও পরে পৃথক হয়ে সুর্য পৃথিবীর গঠিত হয়েছে। আল কুরআনে ঠিক এ কথাই বলা আছে। স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, 'ধুম্র' সমন্বিত ও পরে পৃথক হয়ে সূর্য ও পৃথিবী গঠিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তথ্যগত দিক থেকে কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

২। আধুনিক বিজ্ঞানে একটি তারকা (যেমন সূর্য) ও তার উপগ্রহের (যেমন পৃথিবী) গঠনের দুটি পর্যায়ের মধ্যে সংযোগের কথা বলা হয়েছে। কুরআনের যে আয়াত আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে এ সংযোগের কথাই সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। আল কুরআনে বিশ্বজগত সৃষ্টির আদি পর্যায়ে যে 'ধুম্রের' অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, তা স্পষ্টতই আধুনিক বিজ্ঞানের 'আদি বাষ্প'।

৪। কুরআনে আকাশের সংখ্যা একাধিক বলে যে উল্লেখ আছে, আধুনিক বিজ্ঞান তা নির্দ্বিধায় সমর্থন করে। তারকারাজি ও তাদের সংখ্যা বহু হওয়া সম্পর্কে জ্যোতির্পদার্থবিদগণ যে অভিমত দিয়েছেন, তাতেই ঐ সমর্থন আছে। পক্ষান্তরে

আমাদের এ পৃথিবীর মত (অন্তত কোন কোন দিক থেকে) আরও অনেক পৃথিবী আছে বলে কুরআন থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায়; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এখনও এ ধারণার সত্যতা নিরূপন করতে পারেনি। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, একাধিক পৃথিবী থাকা খুবই সম্ভব।

৫। কুরআনে 'আকাশমন্ডল' ও 'পৃথিবীর' মধ্যবর্তী স্থানে একটি 'মধ্যবর্তী সৃষ্টি'র উল্লেখ আছে। আধুনিক বিজ্ঞানে সংগঠিত জ্যোতির্মন্ডলের বাইরে 'অজ্ঞাত পদার্থের সেতু'র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

অবশ্য কুরআনের বর্ণনায় যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তার সবগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের তথ্য ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে আদৌ কোন বিরোধ নেই। কুরআনের এ তথ্যের উপর জোর দেয়া এ কারণে বিশেষ প্রয়োজন যে, ঐ একই বিষয়ে বর্তমান কালের ওল্ড টেস্টামেন্টে যে সকল তথ্য আছে, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। একই বিষয়ে বাইবেলের স্যাকারডোটাল সংস্করণে যে বিবরণ আছে, তা ব্যাবিলনে নির্বাসনের সময় পাদ্রিগণ নিজেরাই লিখেছিলেন এবং তাঁদের ধর্মীয় মতবাদের উপরে বৈধতার আবরণ দেয়াই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইয়াহভিস্ট সংস্করণে যে বর্ণনা আছে তা এতই সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক বিবেচনার আদৌ উপযুক্ত নয়। কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার এ বিরাট পার্থক্যের উপর আর একবার বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ ইসলামের সে আদিকাল থেকেই মুহাম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে এ ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে যে, তিনি বাইবেলের বর্ণনা নকল করে কুরআন লিখেছেন। অন্তত বিশ্বজগত সৃষ্টির বর্ণনার ব্যাপারে এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অসত্য ও ভিত্তিহীন। চৌদ্দশত বছর আগের একজন মানুষ কেমন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল তথ্য বাদ দিয়ে তৎকালীন বিবরণ সংশোধন করলেন? এবং নিজের প্রচেষ্টায় কিভাবে এমন সব তথ্য ও বর্ণনা যোগ করে দিলেন, যার সত্যতা কেবলমাত্র বর্তমান কালের বিজ্ঞানের পক্ষে নিরূপণ ও সাব্যস্ত করা সম্ভব হল? সুতরাং বাইবেল নকল বা সংশোধন করার অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন। সৃষ্টি বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা বাইবেলের বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

কতিপয় আপত্তির জবাব

তবে অন্যান্য বিষয়ে, বিশেষত ধর্মীয় ইতিহাসের বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন ও বাইবেলের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে সে সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের অনেক তথ্য ও শিক্ষা মিলে যাওয়া সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ উত্থাপন করেন না। অথচ

সেইভাবে মিলে যাওয়ার কারণেই পাশ্চাত্যে মুহাম্মদকে (সঃ) প্রতারক (নাউযুবিল্লাহ) বলে অভিহিত করা হয় এবং বলা হয় যে, বাইবেল থেকে নকল করা সত্ত্বেও সেই নকলকে তিনি অহি বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি খৃষ্টান পাদ্রিদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে সেই একই জিনিস অহি বলে চালিয়ে দিয়েছেন বলে যে অভিযোগ করা হয়, তাও ঐ একই ভাবে ভিত্তিহীন। যাঁরা এ অভিযোগ করে থাকেন, তাঁদের আমি আর ব্লাশেয়ার রচিত 'দি প্রবলেম অব মুহাম্মদ (ল্য প্রবলেমে দ্য মাহোমেট, প্রেসেস ইউনিভার্সিটেয়ারিস দ্য ফ্রান্স, প্যারিস, ১৯৫২) বইখানি আর একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এ সকল অভিযোগকে তিনি 'আজগুবি উপকথা' বলে অভিহিত করেছেন।

বাইবেলের অনেক পূর্ববর্তী বিশ্বাসের সঙ্গেও কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার মিল আছে বলে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে।

ধর্মগ্রন্থে সাধারণত সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক প্রবাদের সমর্থন অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পলিনেশিয়ানদের মধ্যে এ মর্মে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, আদি পানি অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং আলো আবির্ভূত হওয়ার পর তা পৃথক হয়ে যায়। এভাবে আকাশ ও পৃথিবী গঠিত হয়। এ প্রবাদটিকে বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাই বলে ঐ প্রবাদ নকল করে বাইবেলের বিবরণ লেখা হয়েছে বলে অভিযোগ করার কোন যুক্তি নেই।

একইভাবে বিশ্বজগতের আদি উপাদানের প্রাথমিক বিভক্তি সম্পর্কে কুরআনে যে ধারণা আছে এবং যে ধারণা আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থন করে, সে ধারণা বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন প্রবাদে পাওয়া যায় বলে সেই প্রবাদ থেকে নকল করে কুরআনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে বলাও একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ। তবুও এ প্রবাদ ও পৌরাণিক কিচ্ছাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। ঐগুলিতে প্রায়শ এমন একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়, যা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয় এবং আজগুবি বর্ণনা বাদ দিলে আমরা এখন যা সত্য বলে জানি (বা জানি বলে মনে করি), তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেও দেখা যায়। এ ধারণাটি হচ্ছে আদিতে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর একত্রিত থাকা এবং পরে পৃথক হয়ে যাওয়া। কিন্তু জাপানে যখন ঐ ধারণার সঙ্গে ডিম, তার মধ্যে একটি বীজ এবং চতুর্দিকে বিশৃংখলা থাকার কথা যোগ করা হয়, তখন সমগ্র ব্যাপারটিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। অন্যান্য দেশে ডিমের বদলে একটি চারাগাছ যোগ করা হয়। চারাটি আস্তে আস্তে বড় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আকাশমন্ডল আলাদা হয়ে পৃথিবী থেকে উপরে উঠে যায়। এ ক্ষেত্রেও ঐ কাল্পনিক বিস্তারিত বিবরণটিই প্রবাদটির বৈশিষ্ট। তবুও মূল ধারণাটি কিন্তু সর্বত্রই পাওয়া যায়।

মানুষের কল্পনা যে কিভাবে অলংকার ও আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে, এবং কুরআনের

বর্ণনার সঙ্গে যে মৌলিক পার্থক্য আছে, তা দেখানোর জন্যই এখানে প্রবাদগুলির উল্লেখ করা হল। কুরআনের বর্ণনায় কোন আজগুবি বিবরণ নেই, ভাষা ও শব্দপ্রয়োগ সংযত এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এরূপ সঠিক বিবরণ চৌদ্দ শতাব্দীর আগে কিভাবে কুরআনে এল, সে সম্পর্কে কোন মানবিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

কুরআনের জ্যোতির্বিদ্যা

আল কুরআনে আকাশমন্ডলী সম্পর্কে বহুবিদ চিন্তা ও ধারণার দিকনির্দেশ আছে। সৃষ্টি সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা আগেই দেখেছি যে, কুরআনে একাধিক আকাশ ও একাধিক পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে, এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি 'মধ্যবর্তী সৃষ্টির' কথা বলা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ 'মধ্যবর্তী সৃষ্টির' প্রমাণ পেয়েছে। আকাশমন্ডলে অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে যে কি আছে, সে সম্পর্কে সৃষ্টি বিষয়ক আয়াতে একটি মোটামুটি ধারণা দেয়া হয়েছে।

সৃষ্টি বিষয়ক সুনির্দিষ্ট আয়াত ছাড়াও কুরআনে আরও প্রায় চল্লিশটি এমন আয়াত আছে যেখানে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক তথ্য আছে। জ্যোতির্মন্ডলের সৃষ্টি বস্তু সম্পর্কে চিন্তা ও ধারণার দিকনির্দেশ আছে। কয়েকটি আয়াতে অবশ্য তারকা ও গ্রহমন্ডলীর সংগঠক হিসাবে স্রষ্টার মাহাত্ম অনুধাবনের আহবান ছাড়া আর কিছু নেই। যাহোক, আমরা জানি যে, তারকা ও গ্রহমন্ডলী একটি নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে আছে এবং এ অবস্থান যে স্থায়ী ও সুদৃঢ় তা নিউটন তাঁর 'গ্রহের পারস্পরিক' আকর্ষণ নীতিতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা প্রথমেই যে আয়াতগুলি উধৃত করব, সেখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য তেমন কোন তথ্য নেই, তবুও আল্লার সর্বশক্তিমানতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এ উধৃতি প্রয়োজন। তদুপরি বিশ্বমন্ডলের সংগঠন বিষয়ে দেড় হাজার বছর আগে কুরআনে যে বাস্তব সম্মত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা অনুধাবনের জন্যও এ উধৃতি প্রয়োজন।

অহির ক্ষেত্রে এ সকল তথ্য ও প্রসঙ্গ একটি সম্পূর্ণ ব্যাপার। কারণ এ বিশ্ব সংগঠন বিষয়টি ওল্ড টেস্টামেন্টেও নেই, বাইবেলেও নেই। কিছু কিছু ধারণার উল্লেখ অবশ্য আছে কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ ভুল ও কল্পনা মাত্র, তা আমরা সৃষ্টি বিষয়ক বাইবেলের বর্ণনার আলোচনাকালে দেখতে পেয়েছি। কুরআনে অবশ্য এ বিষয়টি গভীর ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা বর্ণিত হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যা বর্ণিত হয়নি তাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় জ্যোতির্মন্ডলের সংগঠন সম্পর্কে যে সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল, কুরআনে তার কোন উল্লেখ নেই।

পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সকল মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল বলে সাব্যস্ত করেছেন। পরে এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ পেশ করা হবে।

ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নেতিবাচক হলেও তার উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন। কারণ, কুরআনে প্রদত্ত তথ্যের মানবিক ব্যাখ্যা- অন্য কোন ব্যাখ্যা নয়- সেরেফ মানবিক ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যাঁরা আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়ান, তাঁদের অনেককে আমি বলতে শুনেছিঃ "কুরআনে যদি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিস্ময়কর বর্ণনা থেকে থাকে, তাহলে তার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবগণ ঐ বিষয়ে খুবই জ্ঞানবান ছিল।" কিন্তু তাঁরা খেয়াল করে দেখেন না যে, মুসলিম দেশ সমূহে সাধারণভাবে বিজ্ঞানচর্চা হয়েছে কুরআন নাযিল হওয়ার পরে এবং সে আমলের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও কোন মানুষের পক্ষে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি লিখে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। পরে আমরা তথ্য ও উদাহরণ দিয়ে এ মন্তব্যের সততা সাব্যস্ত করব।

আকাশ সম্পর্কে চিন্তা ও ধারণার সাধারণ দিকনির্দেশ

"উহারা কি উহাদিগের উর্ধস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না আমি কি ভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটল নাই?" -সূরা ৫০ (কাফ) আয়াত ৬ঃ সাধারণ বিষয় মানুষ।

"তিনি আকাশমন্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা ইহা দেখিতেছ..." সূরা ১৩ (রা'দ) আয়াত ২।

"আল্লাহই উর্ধদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন...।"

আকাশমন্ডলী স্তম্ভের উপর স্থাপিত আছে এবং তার ফলে তা পড়ে গিয়ে পৃথিবী বিধ্বস্ত করছে না বলে যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, এ দুটি আয়াতে তা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।

"তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত..."- সূরা ৫৫ (রহমান) আয়াত ৭।

"তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত।" -সূরা ২২ (হজ্জ) আয়াত ৬৫।

একথা এখন সর্বজনবিদিত যে, জ্যোতির্মন্ডলের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের পারস্পরিক বিপুল দূরত্ব এবং তাদের আকার ও আয়তনের ভিত্তিতে তাদের ভারসাম্য নির্ণীত ও রক্ষিত হয়ে থাকে। দূরত্ব যত বেশী হয়, পারস্পরিক আকর্ষণের শক্তিও তত কম হয়। দূরত্ব কম হলে আকর্ষণের শক্তি বেশী হয়। চাঁদ পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত বলে আকর্ষণ শক্তির নিয়মে তা পৃথিবীর সমুদ্রের পানির উপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং এ

ঘটনাটি জোয়ার ভাটা নামে পরিচিত। দুটি গ্রহ যদি পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়ে, তাহলে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংঘর্ষ যে হয় না তার কারণ এই যে, সকল গ্রহ উপগ্রহ একটি নিয়মের অধীন হয়ে আছে। আল্লাহই যে তাদের নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, কুরআনের বহু স্থানে তার উল্লেখ আছে।

আল্লাহ নবীকে বলেছেনঃ "জিজ্ঞাসা কর কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?"- সূরা ২৩ (মুমিনূন) আয়াত ৮৬।

সপ্তাকাশ বলতে যে কেবলমাত্র ৭টি আকাশ বুঝায় না, বরং অনির্দিষ্ট বহু সংখ্যক আকাশ বুঝায় তা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি।

"তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তো ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।" -সূরা ৪৫ (জাসিয়া) আয়াত ১৩।

"সূর্য ও চন্দ্র অবতরণ করে নির্ধারিত কক্ষপথে।" -সূরা ২৫ (রহমান) আয়াত ৫।

"তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্যে চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"- সূরা ৬ (আনআম) আয়াত ৯৬।

"তিনি তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।" -সূরা ১৪ (ইব্রাহীম) আয়াত ৩৩।

এখানে একটি আয়াত অপর আয়াতের সম্পুরক। গ্রহ-উপগ্রহের একই নিয়মের অধীন করার ফলেই তারা নির্ধারিত কক্ষপথে নিয়মিত পরিক্রমণ করে। এ অর্থ প্রকাশের জন্য আরবী 'দাইব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার মূল অর্থ হচ্ছে 'কোন কিছুর জন্য নিষ্ঠা ও আগ্রহ সহকারে কাজ করা।' কিন্তু এখানে শব্দটি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে 'নির্ধারিত আচরণের ভিত্তিতে অপরিবর্তনীয় আকারে নিষ্ঠার সঙ্গে কোন কিছু করে যাওয়া।'

সূরা ৩৬ (ইয়াসীন) আয়াত ৩৯ঃ আল্লাহ বলছেনঃ "এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনজিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বাঁকা খর্জুর শাখার আকার ধারন করে।"

খেজুর শাখা শুকিয়ে সংকুচিত হয়ে বাঁকা চাঁদের আকারই ধারণ করে। পরে বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা হবে।

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ১২ঃ "তিনিই তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।"

স্থল ও নৌপথে মানুষের ভ্রমণ এবং সময়ের হিসেব রাখার সহায়ক রূপে জ্যোতির্মন্ডলের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেই বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের সহজ ভাষা যারা বুঝতে পারে, তাদের লক্ষ্য

করেই কুরআনের বাণীতে বলা হয়েছে, এ কথা মনে রাখলে এ মন্তব্যটির অর্থ অনুধাবন করা সহজতর হবে। এ কারণেই নিচের আয়াতটিতে আরও সহজ কথা এসেছে।

সূরা ৬ (আনআম) আয়াত ৯৭ঃ "তিনিই তোমাদিগের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।"

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ১৬ঃ "এবং তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহ এবং উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।"

সূরা ১০ (ইউনুস) আয়াত ৫ঃ "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মনজিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পার। আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাইবেলে সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে 'আলোক' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং একটিকে 'বেশী' ও অপরটিকে 'কম' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনে ঐ মাত্রার পার্থক্য নয়, মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরে 'তেজস্কর' ও 'জ্যোর্তিময়' বলা হয়েছে। এ পার্থক্য হয়ত নিছক শব্দগত পার্থক্য বলেও পরিগণিত হতে পারে, কিন্তু বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে দুটি যে একই আলোক নয়, তা আর কিভাবে বুঝানো যেত?

জ্যোতিষ্ক মন্ডলের প্রকৃতিঃ সূর্য ও চন্দ্র

সূর্য একটি তেজস্কর আভা (দিইয়া) এবং চন্দ্র একটি আলোক (নূর)। এ অনুবাদই অধিক নির্ভুল মনে হয়। অনেকে অন্যভাবে যে অনুবাদ করে থাকেন, সেখানে দুটি শব্দ প্রায় একই অর্থ বহন করে থাকে। 'দিইয়া' শব্দটি স্ব ধাতু থেকে এসেছে। কাজী মিরস্কি রচিত আরবী-ফরাসী অভিধানে তার অর্থ বলা হয়েছে 'উজ্জ্বল হওয়া' 'আলোকিত হওয়া' (আগুনের মত)। অবশ্য 'আলোক' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে অর্থের দিক থেকে সূর্য ও চন্দ্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য তেমন বড় হয়ে ধরা পড়ে না। তবে এ পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য আমরা মূল কুরআনেরই সাহায্য নিতে পারি।

সূরা **২৫ (ফুরকান)** আয়াত ৬১ঃ "কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।"

সূরা ৭১ (নূহ) আয়াত ১৫-১৬ঃ "তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী, এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ রূপে?"

সূরা ৭৮ (নাবা) আয়াত ১২-১৩ঃ "আমি তোমাদিগের উর্ধদেশে সুস্থিত সপ্ত

আকাশ নির্মাণ করিয়াছি, এবং প্রোজ্জ্বল দীপ সৃষ্টি করিয়াছি।"

প্রোজ্জ্বল দীপ বলতে স্পষ্টতই সূর্য বুঝানো হয়েছে। আর চন্দ্রকে বলা হয়েছে এমন একটি জ্যোতিষ্ক যে আলো দেয় (মুনির)। মুনির শব্দটি এসেছে 'নূর ধাতু থেকে। তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যে আলো (নূর) চন্দ্রের (মুনির) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সূর্যকে অবশ্য প্রদীপ (সিরাজ) বা প্রোজ্জ্বল (ওয়াহহাজ) দীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

মুহাম্মদের (সঃ) আমলের যে কোন মানুষের পক্ষে এ পার্থক্য উপলব্ধি করা খুবই সহজ ছিল। কারণ মরুভূমির বাসিন্দাদের কাছে সূর্যের তেজস্কর প্রোজ্জ্বল রূপ এবং চন্দ্রের শীতল আলোক খুবই পরিচিত ছিল। সুতরাং কুরআনে এ দুটি জ্যোতিষ্ক বুঝানোর জন্য যে তুলনা ব্যবহার করা হয়েছে তা খুবই স্বাভাবিক হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, এ তুলনায় এমন কিছু ব্যবহার করা হয়নি, যা তৎকালে ছিল কিন্তু এখন নেই। ফলে ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে এতদিন পরে আমাদেরও কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

আমরা জানি যে, সূর্য এমন একটি নক্ষত্র যা আন্তরিকভাবে জ্বলন্ত হওয়ার ফলে তাপ ও আলো বিকিরণ করে থাকে। পক্ষান্তরে চন্দ্র নিজস্ব কোন আলো দেয় না, বরং একটি অসাড় বস্তু হিসেবে (অন্তত বাইরের আবরণের দিক থেকে) সূর্য থেকে পাওয়া আলো প্রতিফলন করে মাত্র।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের মারফত আমরা এখন সূর্য ও চন্দ্র সম্পর্কে যা জানি, কুরআনে তার বিপরীত কোন কথা নেই।

নক্ষত্র মন্ডল

সূর্যের মত নক্ষত্রও আসমানী জ্যোতিষ্ক। এ জ্যোতিষ্কে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে থাকে, তার মধ্যে সহজে যা দেখা যায় তা হচ্ছে আলো সৃষ্টি। অর্থাৎ নক্ষত্র নিজের আলো নিজেই উৎপাদন করে থাকে।

নক্ষত্র শব্দটি কুরআনে তের বার এসেছে। আরবী 'নজম', বহুবচনে 'নুজুম', এ শব্দটি যে মূলধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ হচ্ছে আসা, আবির্ভূত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া। ঐ শব্দে কেবল একটি দৃশ্যমান আসমানী জ্যোতিষ্কের তাৎপর্য এসেছে, কিন্তু জ্যোতিষ্কটি নিজেই আলোক উৎপন্ন করে, না অপরের আলোক প্রতিফলন করে, সে সম্পর্কে কোন আভাস আসেনি। তবে জ্যোতিষ্কটি যে তারকা, এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য কুরআনে একটি গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সূরা ৮৬ (তারিক) আয়াত ১-৩ঃ "শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার; রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহার সম্বন্ধে তুমি কি জান? উহা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।"

আল কুরআনে সন্ধ্যা-নক্ষত্রের গুণবাচক শব্দ হিসাবে 'সাকিব' ব্যবহার করা

হয়েছে। শব্দটির অর্থ 'যাহা কোন কিছু ভেদ করে।' এখানে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করার অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্কাপাত বুঝানোর জন্যও সূরা সাফফাতে (সূরা ৩৭, আয়াত ১০) ঐ একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, নক্ষত্রে অগ্নিকান্ডের ফলে উল্কাপাত হয়ে থাকে।

গ্রহমন্ডল

বর্তমান যুগে বিভিন্ন গ্রহ যেমন নির্দিষ্ট নামে সনাক্ত করা হয়ে থাকে কুরআনে ঠিক সেইভাবে সনাক্ত করা হয়েছে কিনা বলা কঠিন।

গ্রহের নিজস্ব কোন আলো নেই তারা সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়ে থাকে। পৃথিবী এ রকম একটি আবর্তনশীল গ্রহ। গ্রহ হয়ত অন্যত্রও থাকতে পারে, কিন্তু যে সকল গ্রহের কথা এ যাবত জানা গিয়েছে তার সবগুলিই সৌরজগতে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে পৃথিবী ছাড়াও পাঁচটি গ্রহের অস্তিত্ব মানুষের জানা ছিল। এ পাঁচটি গ্রহ হচ্ছে মার্কারি (বুধ), ভেনাস (শুক্র), মার্স (মঙ্গল), জুপিটার (বৃহস্পতি), এবং স্যাটার্ন (শনি)। সাম্প্রতিককালে আরও তিনটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে- ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। কুরআনে 'কাওকাব' (বহুবচনে কাওয়াকিব) শব্দ দ্বারা গ্রহমন্ডল বুঝানো হয়েছে, তবে গ্রহের সংখ্যা বলা হয়নি। ইউসুফের স্বপ্নে (সূরা ১২-ইউসুফ) এগারটি গ্রহের উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ বর্ণনা সংজ্ঞা হিসাবে কাল্পনিক।

'কাওকাব' শব্দের অর্থের একটি উত্তম সংজ্ঞা মনে হয় কুরআনের একটি বিখ্যাত আয়াতে দেয়া হয়েছে। এ সংজ্ঞার গভীরতর তাৎপর্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি খুবই প্রকট এবং এ বিষয়ে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্কও আছে। তথাপি ঐ আয়াতে ঐ শব্দের বিষয়ে যে উপমামূলক বর্ণনা আছে তাতে মনে হয় সম্ভবত একটি 'গ্রহের' কথাই বলা হয়েছে।

সূরা ২৪ (নূর) আয়াত ৩৫ঃ "আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা কুলুঙ্গি যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের-আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ।" এখানে বিষয়টি হচ্ছে আলোক প্রক্ষেপণ করা, এমন একটি বস্তুর উপরে যা (কাঁচ) ঐ আলোক প্রতিফলন করে এবং নিজেও উজ্জ্বল হয়; ঠিক যেমন সূর্যের আলোকে চন্দ্র আলোকিত হয়। কুরআনে 'কাওয়াব' শব্দটির এ একটি মাত্র ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা পাওয়া যায়।

অন্যান্য আয়াতেও শব্দটি আছে। কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটি আয়াতে শব্দটি দ্বারা যে কোন আসমানী জ্যোতিষ্ক বুঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন। যেমন সূরা ৬ (আনআম) আয়াত ৭৬; এবং সূরা ৮২ (ইনফিতার) আয়াত ১-২।

তবে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিবেচনা করলে মনে হয় একটি আয়াতে অন্তত

যে আসমানী বস্তুর কথা বলা হয়েছে তা আমাদের জানা গ্রহের দিকেই বিশেষভাবে ইঙ্গিত করে।

সূরা ৩৭ (সাফফাত) আয়াত ৬ঃ "আমি তোমাদিগের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি।"

কুরআানের 'তোমাদিগের নিকটবর্তী আকাশ' বলতে কি সৌরজগত বুঝায়? একথা এখন সুবিদিত যে, আমাদের নিকটবর্তী আসমানী বস্তু নিচয়ের মধ্যে গ্রহ ছাড়া আর কোন স্থায়ী বস্তু নেই, এবং সৌরজগতে সূর্যই একমাত্র নক্ষত্র যার নিজস্ব নাম আছে। সুতরাং গ্রহের কথা যদি না বলা হয়ে থাকে তাহলে আর যে কিসের কথা বলা হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং আয়াতটির যে তরজমা পেশ করা হয়েছে তা সঠিক বলেই মনে হয় এবং আমরা এখন গ্রহ বলতে যা বুঝাই কুরআনে সম্ভবত তার কথাই বলা হয়েছে।

নিম্নতম আকাশ

কুরআনে কয়েকবারই নিম্নতম আকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ্কমন্ডলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে নিম্নতম আকাশেই ঐ গুলি অবস্থিত। আমরা আগেই দেখেছি যে, বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের মধ্যে গ্রহকেই প্রথম স্থান দিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে যে সকল বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে সেই সকল বস্তুর ধারণার সঙ্গে আল কুরআনে যখন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রাকৃতিক বিবরণ সংযুক্ত করা হয়, তখন তার অর্থ আমরা ঠিক পরিষ্কারভাবে ধরতে পারি না।

যেমন, একটু আগে উধৃত করা আয়াতটির (সূরা ৩৭ সাফফাত, আয়াত ৬ঃ "আমি তোমাদিগের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি") অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু ঐ একই সুরার ঠিক পরবর্তী আয়াতে (আয়াত ৭) বলা হয়েছে- "ও ইহাকে রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হইতে।" রক্ষা করার কথা সূরা আম্বিয়া (সূরা ২১ আয়াত ৩২) "এবং আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ" এবং সূরা হামিম-আস-সিজদাতেও (সূরা ৪১ আয়াত ১২) "এবং তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলেন সুরক্ষিত" উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা একটি সম্পূর্ণ পৃথক তাৎপর্যের সম্মুখীন হই।

তাছাড়া সূরা মুলকের (সূরা ৬৭) ৫ আয়াতে বলা হয়েছে- "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানরে প্রতি নিক্ষেপের উপকরণও এবং উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জলন্ত অগ্নির শাস্তি।" এখানে নিকটবর্তী আকাশে 'শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ' বলতে কি বুঝা যেতে পারে? ঐ প্রদীপমালাই কি নিক্ষেপের উপকরণ? (আমরা অবশ্য জানি যে, কোন উল্কা

যখন বায়ুর ওপরের স্তরে এসে পৌছায়, তখন তারকা নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত একটি আলোকোজ্জল ঘটনা ঘটে)।

কিন্তু এ সকল বিষয় সম্ভবত আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধি বহির্ভূত। তথাপি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার স্বার্থেই এখানে এগুলির উল্লেখ করা হল। বিষয়গুলি এখন পর্যন্ত মানুষের বোধগম্যতার পরিধির বাইরে রয়েছে এবং এ যাবত যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার সাহায্যেও কোন বোধগম্য ব্যাখা পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

জ্যোতির্মন্ডলের সংগঠন

এ বিষয়ে কুরআনে যে সকল তথ্য আছে তা প্রধানত সৌরজগত সম্পর্কিত। অবশ্য সৌরজগত বহির্ভূত বিষয়বস্তু সম্পর্কেও অনেক উল্লেখ আছে এবং ঐ সকল বিষয়বস্তু অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ সম্পর্কে কুরআনে দুটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আছে।

সূরা ২১ (আম্বিয়া) আয়াত ৩৩ঃ "আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"

সূরা ৩৬ (ইয়াসিন) আয়াত ৪০ঃ "সূর্য নাগাল পায় না চন্দ্রের; রজনী অতিক্রম করে না দিবসে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।"

এখানে একটি জরুরী তথ্য দেয়া হয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের নিজস্ব কক্ষপথ আছে। তাছাড়া আরও জানা যাচ্ছে যে, ঐ দুটি জ্যোতিষ্ক তাদের নিজস্ব গতিতে চলে। আয়াত দুটি থেকে একটি নেতিবাচক তথ্যও জানা যাচ্ছে। বলা হয়েছে যে, সূর্য একটি কক্ষপথে চলে, কিন্তু পৃথিবীর প্রসঙ্গে এ কক্ষপথ যে কি তা বলা হয়নি। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মনে করা হত যে, সূর্য ঘোরে এবং পৃথিবী স্থির হয়ে থাকে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর টলেমির আমল থেকে খৃষ্টপরবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর কপারনিকাসের আমল পর্যন্ত এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। মুহাম্মদের (সঃ) আমলেও লোকে এ ধারণাই পোষণ করত, কিন্তু তবুও কুরআনের কোথাও তার কোন উল্লেখ নেই।

চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ

আরবী 'ফালাক' শব্দটি এখানে 'কক্ষপথ' বলে তরজমা করা হয়েছে। কুরআনের অনেক ফরাসী অনুবাদক শব্দটির 'গোলক' অর্থ আরোপ করেছেন। প্রাথমিক তাৎপর্য অবশ্য ঐ রকমই দাঁড়ায়। হামিদুল্লাহ কিন্তু 'কক্ষপথ' বলেই তরজমা করেছেন।

আগের যুগে যাঁরা কুরআনের তরজমা করেছেন, তাঁরা শব্দটি নিয়ে বেশ বিভ্রান্ত

হয়েছেন। কারণ তাঁরা চন্দ্র ও সূর্যের ভ্রমণপথ গোলাকার হওয়ার ধারণা করতে পারেননি। ফলে তাঁরা ঐ পথের এমন একটি আকার অনুমান করেছেন যা সম্ভবত মোটামুটি সঠিক কিম্বা সম্পূর্ণ বেঠিক। সি হামজা বোবেকার তাঁর কুরআনের তরজমায় শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- "লৌহদন্ডের মত ধুরা বিশেষ, যার চারদিকে চাকা ঘোরে, জ্যোতির্মন্ডলের গোলক, কক্ষপথ, রাশিচক্রের চিহ্ন, গতি, ঢেউ।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি কুরআনের দশম শতাব্দীর বিখ্যাত ভাষ্যকার তাবাবীর এ মন্তব্যটিও উধৃত করেছেন- "আমরা যখন জানি না তখন নীরব থাকাই উচিত।" সুতরাং মানুষ কক্ষপথের এ ধারণাটি উপলব্ধি করতে যে কতখানি অক্ষম ছিল তা বেশ বুঝা যাচ্ছে। স্পষ্টতই ধারণাটি যদি মুহাম্মদের (সঃ) আমলে জ্ঞাত বা পরিচিত থাকত, তাহলে কুরআনের ঐ আয়াত দুটির মর্ম উপলব্ধি করা তখন অত কঠিন হত না। সুতরাং কুরআনে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা এসেছিল এবং তার সঠিক তাৎপর্য কয়েক শতাব্দী পরে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

চন্দ্রের কক্ষপথ

চন্দ্র যে পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এবং উনত্রিশ দিনে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এ ধারণা এখন ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। তবে তার কক্ষপথ একেবারে গোলাকার নয়, আধুনিক জ্যোর্তিবিজ্ঞানে কিছুটা বাঁকা বলা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবী থেকে চন্দ্রের যে দূরত্ব (২, ৪০,০০০ মাইল) তা হচ্ছে গড় দূরত্ব।

সময়ের হিসাব করার জন্য চন্দ্রের গতি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর কুরআনে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি (সূরা ১০ ইউনুস, ৫ আয়াত, ইতিপূর্বে উধৃত)।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ভ্রমণের ভিত্তিতে বর্তমান সময়ের যে হিসাব প্রচলিত আছে, তার তুলনায় এ পদ্ধতিকে অচল, অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক বলে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাপারটি একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

চৌদ্দ শো বছর আগে আরবে যখন কুরআন নাযিল হয় তখন সেখানকার বাসিন্দারা চন্দ্রের গতিবিধির ভিত্তিতে সময় গণনা করতে অভ্যস্ত ছিল। তদুপরি কুরআন যেহেতু প্রাথমিক ভাবে তাদের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছিল, সেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর যে সকল চিহ্ন ও নিশানা তাদের বোধগম্য ছিল সেই ভাষাতে কথা বলে তাদের অভ্যাসকে বিপর্যস্ত না করাই সঙ্গত হয়েছিল। তাছাড়া তাদের চন্দ্র ভিত্তিক সময় গণনাও নিখুঁত ও কর্মোপযোগী ছিল। একথা এখন সর্বজনবিদিত যে মরুভূমির লোকেরা আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে খুবই পারদর্শী ছিল; তারকার অবস্থান দেখে তারা জাহাজ চালাত এবং চাঁদের আকার দেখে সময় গণনা করত। সে আমলে এ প্রক্রিয়াই তাদের জন্য

সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য ছিল।

বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া অনেকেই জানেন না যে জুলিয়ান (সৌর) ও চান্দ্র ক্যালেন্ডারের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে- ২৩৫ চান্দ্রমাসে জুলিয়ান মতে ৩৬৫$\frac{1}{4}$ দিনের বছরের ঠিক ১৯ বছর হয়। কিন্তু আমরা যে ৩৬৫ দিনে বছরের হিসাব করি তাও সঠিক হয় না, কারণ প্রত্যেক চার বছর অন্তর তা আবার সংশোধন করতে হয় (অতিবর্ষ)। চান্দ্র ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে এ গরমিল দেখা দেয় ১৯ বছর পর পর (জুলিয়ান বা সৌর ক্যালেন্ডারের ১৯ বছর স্মরণ করুন)। এটাই মেটোনিক চক্র, গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেটোনের নাম অনুসারে এ নামকরণ করা হয় এবং তিনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সৌর ও চান্দ্র হিসাবের মধ্যকার এ সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আবিষ্কার করেন।

সূর্যের কক্ষপথ

সূর্যের কক্ষপথের ধারণা করা আরও কঠিন। কারণ আমরা সমগ্র সৌরজগত সূর্যের চারদিকে বিন্যস্ত অবস্থায় দেখতেই অভ্যস্ত। কুরআনের আয়াতটি বুঝতে হলে আমাদের জ্যোতির্মন্ডলে সূর্যের অবস্থানটি বিবেচনা করতে হবে এবং সেজন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাহায্য নেয়া প্রয়োজন।

আমাদের জ্যোতির্মন্ডলে অসংখ্য তারকা আছে। সমগ্র জ্যোতির্মন্ডলটির আকার একখানি **থালার** মত, তার কেন্দ্রস্থলে তারকারাজির অবস্থান খুবই ঘন এবং কিনারের দিকে **পাতলা**। এ থালায় সূর্যের অবস্থান কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে। জ্যোতিষ্কগুলি তাদের নিজস্ব কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে। ফলে সূর্যও ঐ একই কেন্দ্রের চারদিকের কক্ষপথে ঘোরে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। ১৯১৭ সালে শোপলি নামক একজন বিজ্ঞানী সূর্য থেকে জ্যোর্তিমন্ডলের কেন্দ্রের দূরত্ব ১০ কিলোপারসেক অর্থাৎ ২ সংখ্যার পরে ১৭টি শূন্য বসালে যত হয় তত মাইল বলে নির্ণয় করেন। নিজ কেন্দ্রের চারদিকে একবার ঘুরতে জ্যোতির্মন্ডল ও সূর্যের প্রায় ২৫ কোটি বছর সময় লেগে যায় এবং এ ভ্রমণে সূর্যের গতি থাকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৫০ মাইল।

চৌদ্দ শতাব্দী আগে কুরআনে সূর্যের কক্ষপথের গতিবিধি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে সেই জিনিস। এ প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব এবং বিস্তারিত প্রণালী হাতে কলমে দেখিয়ে প্রমাণ করে দেয়ার সাফল্য অর্জন করা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এবং এ সাফল্যও অনেক সাফল্যের মধ্যে একটি মাত্র।

মহাশূন্যে চন্দ্র ও সূর্যের নিজস্ব শক্তিতে চলার প্রসঙ্গ

বিদ্বান লোকেরা কুরআনের যে সকল তরজমা করেছেন, সেখানে এ ধারণাটি নেই। যেহেতু তাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানেন না, সেহেতু তাঁরা সংশ্লিষ্ট আরবী শব্দটির একাধিক অর্থের একটি অর্থ- 'সাঁতার দেওয়া'- গ্রহণ করে তরজমা করেছেন। সকল ফরাসী তরজমায় এ অবস্থা হয়েছে, এবং অন্যদিক থেকে খুবই প্রশংসনীয় আল্লামা ইউসুফ আলীর ইংরাজী তরজমাতেও (প্রকাশক- শেখ মুহাম্মদ আশরাফ, লাহোর পাকিস্তান) তাই ঘটেছে। (বাংলা অনুবাদকের টিকা- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কুরআনের বাংলা তরজমার ক্ষেত্রেও বুকাইলি সাহেবের এ মন্তব্য প্রযোজ্য)।

আরবী ক্রিয়াপদ 'সাবাহা' (উধৃত আয়াত দুটিতে 'ইয়াসবাহুন') শব্দটি যে তাৎপর্য বহন করে তা হচ্ছে স্বকীয় শক্তিতে চলা। শব্দটির সকল প্রকার অর্থ থেকেই এ ধারণা পাওয়া যায় যে, গতির চালিকা শক্তিটি সংশ্লিষ্ট গতিশীল বস্তুর নিজস্ব দেহ থেকেই আসছে। গতি অর্থাৎ চলার ব্যাপারটি যদি পানিতে ঘটে তাহলে সেটা 'সাঁতার দেয়া'; আর যদি মাটিতে ঘটে তাহলে সেটা 'হাঁটা', অর্থাৎ পায়ের শক্তিতে চলা। কিন্তু গতির ব্যাপারটি যদি মহাশূন্যে ঘটে তাহলে বোধহয় শব্দটির মূল অর্থ অর্থাৎ স্বীয় শক্তিতে চলা প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সুতরাং তরজমায় যে ভুল হয়েছে তা বোধহয় বলা যাবে না। কারণ প্রথমত চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার সময় নিজের চারদিকেও ঘুরে থাকে, অর্থাৎ গড়পড়তা সাড়ে ২৯ দিন। ফলে চাঁদের একই দিক সর্বদা আমাদের দিকে থাকে এবং দ্বিতীয়ত সূর্যের নিজের চারদিকে একবার ঘুরতে প্রায় ২৫ দিন সময় লাগে। এ গতিতে বিষুবরেখা ও মেরু অঞ্চলে কিছু পার্থক্য ঘটে থাকে (তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমরা এখন যাব না), তবে সামগ্রিক ভাবে এ গতির শক্তি সূর্যের নিজস্ব দেহ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনে ব্যবহৃত শব্দটির অর্থগত তাৎপর্যে চাঁদ ও সূর্যের নিজস্ব শক্তিজাত গতির কথাই বলা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যে এ সত্যই সমর্থিত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর একজন মানুষ, তা তৎকালে তিনি যতই জ্ঞানবান হয়ে থাকুন না কেন, এ ধারণাটি যে কেমন করে পেলেন তা বোধহয় ব্যাখ্যা করার কোনই উপায় নেই। তাছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে মুহাম্মদকে (সঃ) নিশ্চয়ই জ্ঞানবান বলা যায় না।

এ যুক্তি কেউ কেউ কবুল করেন না। তাঁরা বলেন প্রাচীনকালে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যা এখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করেননি, করেছিলেন দার্শনিক তথ্যের উপর। এ প্রসংগে পিথাগোরাসপন্থীদের নজির উল্লেখ করে বলা হয় যে, পৃথিবী যে নিজের চারদিকে ঘোরে এবং গ্রহসকল যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে এ তত্ত্ব

তাঁরা সেই খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই জোরেশোরে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তী কালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে প্রতিভাবান চিন্তাবিদ মুহম্মদও (সঃ) হয়ত এমন কিছু কল্পনা করেছিলেন যা বহু শতাব্দী পরে সত্য বলে সাব্যস্ত হযেছে। এ যুক্তি দেখাতে গিয়ে তাঁরা কিন্তু উল্লেখ করতে ভুলে যান যে, ঐ দার্শনিক যুক্তিবাদীগণ মারাত্মক মারাত্মক ভুলও করেছিলেন। নজির হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পিথাগোরাসপন্থীগণ এ কথাও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সূর্য মহাশূন্যে স্থির হয়ে আছে, সূর্যই বিশ্বজগতের কেন্দ্রবিন্দু এবং জ্যোতির্মন্ডলও সূর্যকেন্দ্রিক। প্রাচীন কালের দার্শনিকদের রচনায় বিশ্বজগত সম্পর্কে সত্য ও অসত্য ধারণার মিশ্রণ দেখতে পাওয়া একটি অতিশয় সাধারণ ব্যাপার। এ প্রতিভাধরগণ তাঁদের যুগের তুলনায় অনেক আগাম ধ্যান-ধারণা দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও আমাদের দিয়ে গেছেন। সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচারে এখানেই তাঁদের সঙ্গে কুরআনের পার্থক্য। কুরআনে বিশ্বজগত সম্পর্কে বহু প্রসঙ্গ ও বিবরণ আছে এবং তার প্রত্যেকটিই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং একটিও বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়নি।

দিনরাত্রির ক্রমিকতা

পৃথিবীকে যখন বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থল বলে ধরা হত এবং মনে করা হত যে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তখন দিন-রাত্রির ক্রমিকতার কথা বলতে গিয়ে সূর্যের গতিবিধির আদৌ কোন উল্লেখ করা হয়নি কেন? কুরআনে ঠিক এ প্রসঙ্গটি নেই, তবে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

সূরা ৭ (আরাফ) আয়াত ৫৪ঃ "তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদিগের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে..."

সূরা ৩৬ (ইয়াসিন) আয়াত ৩৭ঃ "উহাদিগের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারণ করি ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।"

সূরা ৩১ (লুকমান) আয়াত ২৯ঃ "তুমি কি দেখনা আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন?"

সূরা ৩৯ (যুমার) আয়াত ৫ঃ "তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা।"

উধৃত প্রথম আয়াতটির কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় আয়াতে একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেই দিন ও রাত্রির একটি অপরটিতে পরিণত হওয়া সম্পর্কে কৌতুহল ব্যঞ্জক তথ্য দেয়া হয়েছে।

আরবী ভাষার ক্রিয়াপদ 'কাওয়ারা' তরজমা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে বোধহয়

'জড়ানো' বা 'পেঁচানো' শব্দ ব্যবহার করা। ফরাসী তরজমায় আর ব্লাশিয়ার তাই করেছেন। ক্রিয়াপদটির মূল অর্থ হচ্ছে মাথায় পাগড়ি 'জড়ানো' এবং এ ধারণাটি শব্দটির সকল তাৎপর্যেই প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু মহাশূন্যে আসলে কি ঘটে থাকে? মার্কিন নভোচারীগণ পৃথিবী থেকে বহু দূরে চাঁদে অবস্থান কালে তাঁদের নভোযান থেকে ঘটনাটি দেখেছেন এবং তার ছবিও তুলেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে সূর্য সর্বদাই (গ্রহণের সময় ছাড়া) পৃথিবীর উপরিভাগের অর্ধেক আলোকিত করে রাখে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অন্ধকার থাকে। পৃথিবী নিজ কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে এবং আলোকের অবস্থা একই থেকে যায়। ফলে ভূগোলকের আলোকিত অর্ধাংশ যেমন চব্বিশ ঘন্টায় একবার ঘোরে, অন্ধকার অর্ধাংশও তেমনি ঐ সময়ে একবার ঘোরে। দিন ও রাত্রির এ স্থায়ী পরিবর্তনের কথা কুরআনে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এখন পৃথিবীর আবর্তন এবং সূর্যের (আনুপাতিক) স্থিরতা সম্পর্কে অবহিত আছি বলে বিষয়টি ধারণা করা ও বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে সহজ হয়েছে। এ চিরন্তন জড়ানোর প্রক্রিয়া এবং ভূগোলকের এক অর্ধাংশের অপর অর্ধাংশের অবস্থানে প্রবেশ করার ব্যাপারটি কুরআনে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার ধারণাটি তখন পরিচিত ছিল; কিন্তু স্পষ্টই তা সঠিক নয়।

দিনরাত্রির ক্রমিকতার এ ধারণা ছাড়াও একাধিক পূর্ব ও একাধিক পশ্চিমের ধারণাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষয়টি সাধারণ পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল বলে নিছক বর্ণনামূলক। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

সূরা ৭০ (মাআরিজ) আয়াত ৪০ঃ "উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের অধিপতি।"

সূরা ৫৫ (রহমান) আয়াত ১৭ঃ "তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।"

সূরা ৪৩ (জুখরুফ) আয়াত ৩৮ঃ "এখানে 'দুই পূর্বের মধ্যবর্তী দূরত্ব' উল্লেখিত হয়েছে, এবং এ কথায় দুটি স্থানের মধ্যবর্তী বিপুল দূরত্বের ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে।"

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উদয় ও অস্ত সর্বদা ঠিক একই স্থানে হয় না। মওসুম অনুসারে স্থানের পরিবর্তন হয়ে থাকে। পূর্বাচলের দু দিকের যে সর্বশেষ দুই স্থানে সূর্য উদিত হয় তাকে দুই পূর্ব বলা যায়। একইভাবে পশ্চিমের অস্ত যাওয়ার ঐ দুই স্থানকে দুই পশ্চিম বলা যায়। মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায়। এ ব্যাপারটি এতই সাধারণ যে তা খালি চোখেই দেখা যায় এবং তার সত্যতা প্রমাণের জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

আকাশমন্ডলীর ক্রমবিকাশ

বিশ্বজগত সৃষ্টির আধুনিক ধারণার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক কুয়াশা

থেকে ক্রমে ক্রমে জ্যোতিষ্কমন্ডলী, তারকা, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সৌরজগতে এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বজগতে এ বিবর্তন ও ক্রমবিকাশ এখনও চলছে।

যাঁরা এ ধারণার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা কুরআনের কয়েকটি আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে আগ্রহী হতে পারেন। এ সকল আয়াতে আল্লার সার্বভৌমত্বের বহিপ্রকাশের উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে- "(আল্লাহ) সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে"

এ বাক্যটি সূরা রাদের ২ আয়াত, সূরা লুকমানের ২৯ আয়াত, সূরা ফাতিরের ১৩ আয়াত এবং সূরা যুমারের ৫ আয়াতে আছে।

এছাড়া সূরা লুকমানের ৩৮ আয়াতে একটি গন্তব্য স্থানের ধারণার সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্থানের ধারণা সংযুক্ত আছে- "সূর্য আবর্তন করে তার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে। ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট।"

'নির্দিষ্ট গন্ডি' আরবী 'মুসতাকার' শব্দের বাংলা তরজমা। এ শব্দের সঙ্গে যে একটি সুনির্দিষ্ট স্থানের ধারণা সংযুক্ত আছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

এখন আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে এ সকল বিবরণের তুলনা করলে কি দেখতে পাওয়া যায়?

কুরআনে সূর্যের আবর্তনের একটি সীমানা এবং একটি গন্তব্যস্থলের উল্লেখ আছে। চাঁদেরও একটি নির্দিষ্ট গন্ডির কথা বলা আছে। এ বিবরণের অর্থ উপলব্ধি করতে হলে সাধারণভাবে তারকামন্ডলী এবং বিশেষত সূর্যের আবর্তন সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি চাঁদ সহ যে সকল জ্যোতিষ্ক সূর্যের গতি অনুসরণ করে থাকে তাদের আবর্তন পথ সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন।

জ্যোর্তিপদার্থবিদদের মতে সূর্যের বয়স প্রায় ৪৫ হাজার কোটি বছর। অন্যান্য তারকার ন্যায় সূর্যের ক্রমবিকাশেরও একটি পর্যায় নির্ণয় করা সম্ভব। বর্তমানে সূর্য প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। হাইড্রোজেন অণুর হেলিয়াম অণুতে পরিবর্তিত হওয়া এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট। এ পর্যায়টি আরও ৫৫ হাজার কোটি বছর যাবত বহাল থাকবে। কারণ, এ জাতীয় তারকার মেয়াদ মোট ১০০ হাজার কোটি বছর বলে ধরা হয়ে থাকে। এ জাতীয় অন্যান্য তারকার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, প্রথম পর্যায়ের পর একটি দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। তখন হাইড্রোজেনের হেলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়া শেষ হয়ে যায়, তারকার বাইরের আবরণ সম্প্রসারিত হয়ে যায় এবং সূর্যের তাপের পরিমাণ কমে আসে। শেষ পর্যায়ে আলো যথেষ্ট কমে যায় এবং তার ঘনত্ব অনেক বেড়ে যায়। এ অবস্থা 'হোয়াইট ডুয়ার্ফ', জাতীয় তারকার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

উপরে যে বছরের আনুমানিক হিসাব দেয়া হয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে সময়ের মেয়াদ

সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া, কিন্তু আসলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ক্রমবিকাশের ব্যাপারটির উপর আলোকপাত করা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এখন অনুমান করা সম্ভব যে ৩০ থেকে ৫০ হাজার কোটি বছর পরে সৌরজগতে বর্তমানে যে অবস্থা আছে তা আর থাকবে না। অন্যান্য যে সকল তারকার ক্ষেত্রে শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাদের বিকীরণ প্রক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ঠিক তাদের পরিণামের মতই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব যে, সূর্যও একদিন শেষ হয়ে যাবে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, সূরা লুকমানের ৩৮ আয়াতে সূর্যের একটি নিজস্ব গন্তব্য স্থানের দিকে অতিক্রম করার কথা আছে।

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় ঐ স্থানটি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এবং তার সৌরশীর্ষ (সোলার এপেক্স) নামও দেয়া হয়েছে। সৌরমন্ডল প্রকৃতই মহাশূন্যে ক্রমবিকশিত হয়ে হারকিউলেস তারকারাজির এমন একটি স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যার অবস্থান এখন সঠিকভাবে নির্ণয় হয়ে গেছে এবং তার গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১২ মাইল বলে নির্ণয় করা হয়েছে।

উপরে উধৃত কুরআনের আয়াতের প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এ তথ্যগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, দেখা যাচ্ছে যে কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে।

বিশ্বজগতের সম্প্রসারণ

আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাধিক বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে এই যে, বিশ্বজগত ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ধারণা এখন প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত, তবে কিভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে।

প্রথমে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ব থেকে এ ধারণার জন্ম হয় এবং পরে পদার্থবিদ্যার তারকারাজির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার সমর্থন পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি তারকামন্ডলী ক্রমে ক্রমে নিজ কেন্দ্রের দিকে সরে যায় বলে অপর তারকামন্ডলী থেকে তার দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশ্বজগতের আকারও সম্ভবত এভাবে ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে এবং তারকামন্ডলী থেকে আমাদের দূরত্ব যত বেড়ে যাবে বিশ্বজগতের আকারও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। এ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ্কমন্ডলী যে গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তা আলোর গতির চেয়ে বেশি দ্রুত।

এ আধুনিক ধারণার সঙ্গে সূরা জারিয়াতের ৪৭ আয়াতের তুলনা করা যেতে পারে। আল্লাহ বলছেনঃ "আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতা বলে এবং অবশ্যই আমি উহা প্রসারিত করিতেছি।"

'আকাশ' আরবী 'সামা' শব্দের তরজমা এবং এ শব্দে পৃথিবীর উর্ধলোকে অবস্থিত

জগত বুঝানো হয়েছে।

আরবী ক্রিয়াপদ 'আওসা'র বহুবচনের বর্তমান কালের রূপ 'মুসিউনা'। আওসা শব্দের অর্থ বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা, সম্প্রসারণ করা, ব্যাপক করা, বৃহৎ করা। মুসিউনার অর্থ 'আমরা উহা প্রসারিত করিতেছি।'

কোন কোন অনুবাদক এ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারায় এমন অনুবাদ করেছেন যা আমার কাছে ভুল মনে হয়েছে; যেমন ফরাসী তরজমায় আর. ব্লাশিয়ার বলেছেন- "আমরা উদারভাবে দান করি" কোন কোন অনুবাদক আবার অর্থটি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও সাহস করে প্রকাশ করতে পারেননি। হামিদুল্লাহ আকাশ ও মহাশূন্য সম্প্রসারণের কথা বলেছেন বটে তবে একটি জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্নও বসিয়ে দিয়েছেন। অনেক অনুবাদক অবশ্য সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য অবহিত হওয়ার পর তাঁদের ভাষ্যে এখানে প্রদত্ত অর্থই প্রয়োগ করেছেন। কায়রোর সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক এফেয়ার্স সম্পাদিত 'মুনতাখাব' নামক ভাষ্যগ্রন্থে এ অর্থই দেয়া হয়েছে। সেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় বিশ্বজগতের সম্প্রসারিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মহাশূন্য বিজয়

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে কুরআনের তিনটি আয়াতের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। একটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে মানুষ এক্ষেত্রে কি সাফল্য অর্জন করতে পারে এবং পারবে। অপর দুটি আয়াতে মক্কার অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা যদি আকাশে উঠতে পারত তাহলে সেখানকার দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ত। এখানে এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা ঐ অবিশ্বাসীদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না।

প্রথমত আয়াতটি হচ্ছে সূরা রহমানের ৩৩ আয়াত- "হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম করিও, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে।"

এ তরজমার কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত "যদি" শব্দটি দ্বারা প্রস্তাবনার সফলতা কোন সম্ভব বা অসম্ভব অবস্থার উপর নির্ভর করে বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় ঐ অবস্থার ক্ষেত্রে এমন একটি ব্যঞ্জনা আনা সম্ভব যা অনেক বেশী সুস্পষ্ট। সম্ভাব্যতা প্রকাশের জন্য 'ইযা', সম্পাদনযোগ্য কাজের জন্য 'ইন' এবং সম্পাদনের অযোগ্য কাজের জন্য 'লাও' শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে 'ইন' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় কাজটি সম্পাদনযোগ্য বলে বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করা প্রকৃতপক্ষেই সম্ভব। কোন কোন ভাষ্যকার যে নিছক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শব্দ প্রয়োগের ঐ বৈশিষ্ট থেকেই তা ভুল প্রমাণিত হয়ে

যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ জিন ও মানুষকে সম্বোধন করেছেন, কোন কাল্পনিক প্রাণীকে নয়।

তৃতীয়ত ক্রিয়াপদ 'নাফাজা' ও তার পরে আছে সম্বন্ধযুক্ত পদ 'মিন' এবং তার তরজমা করা হয়েছে 'অতিক্রম করা'। কাজী মিরস্কির অভিধান অনুসারে পদটির অর্থ হচ্ছে 'কোন বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা' (যেমন তীর কোন বস্তুর একদিক দিয়ে ঢুকে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়)। সুতরাং গভীর অনুপ্রবেশ এবং অনুপ্রবিষ্ট এলাকার বাইরে যাওয়া বুঝা যাচ্ছে।

চতুর্থত মানুষের ঐ কাজের জন্য যে শক্তির (সুলতান) প্রয়োজন হবে তা সর্বশক্তিমানের কাছ থেকেই আসবে বলে মনে হয়। কারণ ঠিক পরের আয়াতেই আল্লার রহমত উপলব্ধি করার আহবান জানানো হয়েছে।

সুতরাং মানুষ যে একদিন মহাশূন্য জয় করবে এ আয়াতে তার সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে। লক্ষণীয় যে, আয়াতে শুধু আকাশ জয় নয়, পৃথিবী অতিক্রম অর্থাৎ পাতাল জয়েরও আভাস আছে।

অপর দুটি আয়াত হচ্ছে সূরা হিজরের ১৪ ও ১৫ আয়াত। প্রসঙ্গ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ এখানে মক্কার অবিশ্বাসীদের কথা বলেছেন- "যদি উহাদিগের জন্য আকাশের এক দুয়ার খুলিয়া দিই এবং উহারা দিনের বেলা উহাতে আরোহণ করে, তবুও উহারা বলিবে, 'আমাদিগের দৃষ্টি মোহাবিষ্ট হইয়াছে; নতুবা আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।"

ঐ কথায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। এমন দৃশ্য মানুষ যা কখনও কল্পনাও করেনি।

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বাক্যটি 'যদি' আরবী 'লাও', দিয়ে শুরু করা হয়েছে। অর্থাৎ বাক্যের প্রস্তাবনা এমন শর্তের অধীন করা হয়েছে যা পূরণ করা আয়াতে উল্লেখিত লোকদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

মহাশূন্য বিজয় সম্পর্কিত আয়াতে আমরা দেখেছি, আল্লার দেয়া বুদ্ধিমত্তা ও আবিষ্কার ক্ষমতার বলে মানুষ একদিন মহাশূন্য জয় করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে এমন একটি দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে যা মক্কার অবিশ্বাসী লোকেরা কখনই দেখতে পাবে না। কিন্তু এ দৃশ্য অন্যদের পক্ষে দেখা সম্ভব এবং দেখার পর তাদের (নভোচারী মানুষ) মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হবে এ আয়াতে তার বর্ণনা আছে- তাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হবে, মাতাল অবস্থায় যেমন হয়, যাদুগ্রস্ত অবস্থায় যেমন হয়।

১৯৬১ সালে প্রথমবার নভোযানে মহাশূন্যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসার পর থেকে নভোচারীগণ এ যাবত ঠিক ঐ অভিজ্ঞতাই লাভ করেছেন এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁরা ঠিক ঐ কথাই বলেছেন। একথা এখন সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপর থেকে দেখলে আকাশ আর নীল রঙ্গের দেখা যায় না। কারণ, বায়ুমন্ডল সূর্যের আলো শুষে নেয়ার কারণে তার নীচে থেকে দেখলে আকাশের রং নীল

দেখা যায়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের পরে উঠে মানুষ আকাশকে কালো দেখতে পায় এবং বায়ুমন্ডল সূর্যের আলো শুষে নেয়ার ঐ একই কারণে পৃথিবীকে নীল রঙ্গে আবৃত্ত অবস্থায় দেখতে পায়। চাঁদের কোন বায়ুমন্ডল না থাকায় ঐ অবস্থায় কালো আকাশের পটভূমিতে চাঁদকে তার নিজস্ব রঙ্গেই দেখা যায়। নভোচারী মানুষের চোখে এ দৃশ্য সর্ম্পূণ অভিনব, অভূতপূর্ব, এবং ঐ দৃশ্যের ছবি এখন বর্তমান কালের মানুষের কাছে খুবই পরিচিত।

এক্ষেত্রেও আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে কুরআনের বর্ণনা মিলিয়ে দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত ও হতবাক হয়ে যেতে হয়। কুরআনের ঐ বর্ণনা সুতরাং কোন মতেই চৌদ্দশো বছর আগের একজন মানুষের বর্ণনা হতে পারে না।

পৃথিবী

এ গ্রন্থে এ পর্যন্ত আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের মত পৃথিবী সম্পর্কিত আয়াতগুলিও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এ সকল আয়াতকে শ্রেণীবদ্ধ করা দূরূহ এবং আমি এখানে যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি তা একান্তভাবেই আমার নিজস্ব পদ্ধতি।

সঠিকভাবে অর্থ উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে এমন সব আয়াত বেছে নেয়া যেতে পারে যেগুলিতে একই সংগে একাধিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এ আয়াতগুলির একটি সাধারণ প্রয়োগ যোগ্যতা আছে এবং বর্ণিত উদাহরণের ভিত্তিতে আল্লার মহানুভবতা অনুধাবনের জন্য মানুষের প্রতি আহবান আছে।

অন্যান্য আয়াতে আরও সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অবতারণা আছে, যেমন- পানির বিবর্তনচক্র ও সমুদ্র, পৃথিবীর উপরিভাগের প্রকৃতি এবং পৃথিবীর আবহাওয়া।

সাধারণ বিবরণের আয়াত

এ শ্রেণীর আয়াতে সাধারণত সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার করুণা ও মহানুভবতা উপলব্ধির যৌক্তিকতা থাকলেও মাঝে-মধ্যে এমন বর্ণনা আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কৌতুহলোদ্দীপক। বিশেষত কুরআন নাযিলের সময় তৎকালীন মানুষের মধ্যে যে সকল ধারণা-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, এ সকল আয়াতে তার কোন উল্লেখ না থাকাটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে এ সকল ধারণা-বিশ্বাস ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে ঐ সকল আয়াতে এমন সব সহজ ধারণা প্রকাশিত হয়েছে যা আরবদের কাছে সহজবোধ্য ছিল। কারণ ভৌগলিক কারণে কুরআন প্রথমত তাদের প্রতিই নির্দেশিত হয়েছিল। তারা ছিল মক্কা ও মদীনার বাসিন্দা এবং আরব উপদ্বীপের

বেদুঈন। কিন্তু তা ছাড়াও ঐ সকল আয়াতে সাধারণ প্রকৃতির এমন সব ধারণা আছে যা থেকে যে কোন স্থান ও সময়ের অধিক অগ্রসর মানুষ গভীরতর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং এটাই কুরআনের বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক হওয়ার আলামত।

আগেই বলেছি আয়াতগুলির কোন শ্রেণীবিভাগ নেই। সুতরাং এখানে আমরা সুরার নম্বরের ক্রমিকতা অনুসরণ করছি।

সূরা ২ (বাকারা), আয়াত ২২ঃ "(আল্লাহ) তিনিই যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্বারা তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।"

সূরা ২ (বাকারা), আয়াত ১৬৪ঃ "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযান সমূহে আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাদের এবং তাহার যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

সূরা ১৩ (রাদ) আয়াত ৩ঃ "তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করিয়াছেন দু প্রকারের। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। উহাতে অবশই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"

সূরা ১৫ (হিজর), আয়াত ১৯-২১ঃ "পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি এবং উহাতে পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি; আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি সুপরিমিতভাবে এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের জন্য আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ তাহাদিগের জন্যও। আমার নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি উহা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।"

সূরা ২০ (তাহা), আয়াত ৫৩-৫৪ঃ "(তিনিই আল্লাহ) যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা এবং উহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তোমরা আহার কর ও তোমাদিগের পশু চরাও; অবশ্যই উহাতে নিদর্শন আছে বিবেক সম্পন্নদিগের জন্য।"

সূরা ২৭ (নমল), আয়াত ৬১ঃ "(তিনিই আল্লাহ) যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং উহার মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী-নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দু দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়; আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তবুও উহাদিগের অনেকেই উহা জানে না।"

এখানে পৃথিবীর উপরিভাগের স্তরের সাধারণ দৃঢ়তার কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি যে পৃথিবী গঠিত হওয়ার প্রথম পর্যায়ে ঐ স্তর শীতল হওয়ার আগে দৃঢ় ছিল না। এখনও অবশ্য স্তরের সর্বত্র সমান দৃঢ় নয়; কারণ এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে ঘনঘন ভূমিকম্প হয়। দু দরিয়ার মাঝখানের অন্তরায় প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বড় বড় নদীর পানি খাড়ির মুখে সমুদ্রের পানির সঙ্গে মিশে যায় না।

সূরা ৬৭ (মূলক), আয়াত ১৫ঃ "তিনি তোমাদিগের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থানের পর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।"

সূরা ৭৯ (নাযিয়াত), আয়াত ৩০-৩৩ঃ "অতপর (আল্লাহ) পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন; তিনি উহা হইতে উহার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন; এ সমস্ত তোমাদিগের ও তোমাদের পশুর ভোগের জন্য।"

এরূপ অনেক আয়াতে পানির গুরুত্ব এবং মাটিতে পানি থাকার সুফল অর্থাৎ মাটির উর্বরতার উপর জোর দেয়া হয়েছে। মরুভূমির দেশে মানুষের বাঁচা মরা পানির উপরেই নির্ভর করে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআনে এ প্রসঙ্গটির অবতারণা এ ক্ষুদ্র ভৌগলিক তাৎপর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী গ্রহেই পানি আছে এবং কুরআনে এ বৈশিষ্টের উপরই জোর দেয়া হয়েছে। পানি না থাকলে পৃথিবী চাঁদের মতই একটি মৃত গ্রহ হয়ে যেত। কুরআনে পৃথিবী সম্পর্কিত নানা বিষয়ের মধ্যে পানির কথাই প্রথমে বলা হয়েছে। তাছাড়া পানির বিবর্তন চক্রটিও কুরআনে নিখুঁত ও নির্ভুল ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পানির বিবর্তনচক্র ও সমুদ্র

মানব জীবনে পানির ভূমিকা বিষয়ক কুরআনের আয়াতগুলি যদি পরপর পড়ে শুনানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে এমন সব কথা বলা হয়েছে যা আমাদের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য। কারণ বর্তমান যুগে আমরা প্রায় সকলেই পানির প্রাকৃতিক বিবর্তন চক্র সম্পর্কে কমবেশী অবহিত আছি।

এ বিষয়ে প্রাচীনকালে যে সকল ধারণা প্রচলিত ছিল তা বিবেচনা করে দেখা যায় যে এগুলি মূলত অনুমান ও কল্পনা ভিত্তিক ছিল। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় ঐ ধারণাগুলি প্রচলিত থাকলেও খোদ কুরআনে তা কোন স্থান পায়নি। সেচ কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কিছু অংশ অনুমান ভিত্তিক যুক্তি অনুসারে সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও সেই সকল ধ্যান-ধারণা বর্তমান যুগে আর গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মাটির নিচের পানি যে উপর থেকে চুঁইয়ে আসে তা অনুমান করা সহজ ছিল। প্রাচীনকালে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমের অধিবাসী ভিটরুভিয়াস পোলিও মারকাস

এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু অনেকে এ ধারণাকে ব্যতিক্রম বলে মনে করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বহু শতাব্দী যাবৎ (এবং এ সময়ই কুরআন নাযিল হয়েছে) পানির গতিচক্র সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করে এসেছে।

এ বিষয়ে দু'জন বিশেষজ্ঞ জি গাসটানি এবং বি ব্লাভোক্স বিশ্বকোষের (ইউনিভার্সালিস এনসাইক্লোপিডিয়া) প্রবন্ধে সমস্যাটির একটি উত্তম ইতিহাস দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন- "খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মিলেটাসের থেলস এ মতবাদ পোষণ করতেন যে সমুদ্রের পানি বায়ু চালিত হয়ে স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয়, এবং সেই পানি মাটিতে পড়ার পর মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। প্লেটো এ মতবাদে বিশ্বাস করতেন এবং মনে করতেন যে মাটির নিচের কোন গভীর সুড়ঙ্গপথ (টারটারাস) দিয়ে ঐ পানি আবার সাগরে ফিরে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ মতবাদের অনেক সমর্থক ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডেসকার্টেস। এরিসটোটল মনে করতেন যে, মাটির নিচের পানি বাষ্প হয়ে পাহাড়ী এলাকার ঠান্ডায় জমে গিয়ে ভূগর্ভে হ্রদ সৃষ্টি করে থাকে এবং সেই পানিই ঝর্ণার আকারে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ মতবাদ সেনেকা (প্রথম শতাব্দী) ও ভলগার এবং আরও অনেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত পোষণ করতেন। ১৫৮০ সালে বার্নার্ড পালিসি পানির গতিচক্র সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা গঠন করেন। তিনি বলেন যে, মাটির নীচে যে পানি আছে তা উপর থেকে বৃষ্টির পানি চুঁইয়ে আসা। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ম্যারিওট এবং পি পেরোল্ট এ মতবাদ সমর্থন ও অনুমোদন করেন।"

কিন্তু আল কুরআনের নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন আয়াতে মুহাম্মদের (সঃ) আমলে প্রচলিত নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণার চিহ্নমাত্র নেই।

সূরা ৫০ (কাফ) আয়াত ৯-১১ঃ "আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি উপকারী বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান, শস্যরাজি ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর আমার দাসদিগের জীবিকা স্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এ ভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে।"

সূরা ২৩ (মুমিনুন) আয়াত ১৮-১৯ঃ "এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিত ভাবে, অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম। অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদিগের জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; ইহাতে তোমাদিগের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক।"

সূরা ১৫ (হিজর) আয়াত ২২ঃ "আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দিই; উহার ভান্ডার তোমাদিগের নিকট নাই।"

এ আয়াতের দুটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু বা ফলনশীল বায়ুর অর্থ এই যে, বায়ু দ্বারা অনেক ফল-ফুলের বীজ ও রেণু বাহিত হয়। অপর অর্থ এ হতে পারে

যে, বায়ু দ্বারা বাহিত অনেক বৃষ্টিহীন মেঘ বৃষ্টিপূর্ণ মেঘে পরিণত হতে পারে। নিচের আয়াতগুলির মত অনেক ক্ষেত্রেই বায়ুর এ ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

সূরা ৩৫ (ফাতির) আয়াত ৯ঃ "আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর তিনি উহা নির্জীব ভূখন্ডের দিকে পরিচালিত করেন, অতঃপর তিনি উহা দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। পুনরুত্থান এরূপেই হইবে।"

লক্ষণীয় আয়াতের প্রথম অংশ বর্ণনামূলক এবং তারপর কোন অর্ন্তবর্তীকালীন বিরতি ছাড়াই সরাসরি আল্লার তরফ থেকে ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে। বর্ণনার এ আকস্মিক পরিবর্তন কুরআনে হামেশাই দেখা যায়।

সূরা ৩০ (রুম) আয়াত ৪৮ঃ "আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন, পরে ইহাকে খন্ড-বিখন্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা; তিনি তাহার দাসদিগের মধ্যে যাহাদিগের প্রতি ইচ্ছা ইহা দান করেন; উহারা তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়।"

সূরা ৭ (আরাফ) আয়াত ৫৭ঃ "তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহী রূপে প্রেরণ করেন। যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন উহাকে নির্জীব ভূখন্ডের দিকে প্রেরণ করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বাধিক ফল উৎপাদন করি। এভাবে মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।"

সূরা ২৫ (ফুরকান) আয়াত ৪৮-৪৯ঃ "তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করেন, উহা দ্বারা মৃত ভূখন্ডকে সজ্জীবিত করিবার জন্য এবং অসংখ্য জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।"

সূরা ৪৫ (জাসিয়া) আয়াত ৫ঃ "নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।"

এখানে বায়ু দ্বারা বৃষ্টির চক্র পরিবর্তনের উপর জোর দেয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সূরা ১৩ (রাদ) আয়াত ১৭ (অংশ)ঃ "তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকা সমূহ উহাদিগের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে।"

সূরা ৬৭ (মুলক) আয়াত ৩০ঃ "বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদিগের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে

প্রবহমান পানি?"

সূরা ৩৯ (যুমার) আয়াত ২১ (অংশ)ঃ "তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন অতঃপর ভূমিতে স্রোত রূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন?"

সূরা ৩৬ (ইয়াসীন) আয়াত ৩৪ঃ "উহাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ।"

শেষের তিনটি আয়াতে প্রস্রবণ এবং যে প্রক্রিয়ায় বৃষ্টির পানি দ্বারা তা পূর্ণ করা হয় তার উপর জোর দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন এবং প্রসঙ্গত স্মরণ করা প্রয়োজন যে, মধ্য যুগে বিশ্বাস করা হত এবং এরিস্টটলের মত জ্ঞানীজনও মনে করতেন যে, ভূগর্ভ থেকেই প্রস্রবণের পানি আসে। ফ্রান্সের ন্যাশনাল স্কুল অব এগ্রোনমির অধ্যাপক এম আর রেমেনিয়েরাস বিশ্বকোষে (এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনির্ভাসালিস) তাঁর হাইড্রোলজি (পানি বিজ্ঞান) বিষয়ক প্রবন্ধে পানির গতিচক্রের প্রধান প্রধান পর্যায়ের একটি বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রাচীন কালে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে উত্তম সেচ ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, তৎকালীন ধারণা ও মতবাদ ভ্রান্ত ছিল বলে সাধারণ মানুষ তাদের সেচ কার্যে অভিজ্ঞতার উপরই বেশী নির্ভর করত। তিনি বলেন, "রেনেসাঁর (১৪০০-১৬০০ খৃষ্টাব্দ) আমল পর্যন্ত নিছক দার্শনিক মতবাদই বহাল ছিল। তারপর বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণা শুরু হওয়ায় সেই মতবাদ বাতিল হয়ে যায়। লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এরিস্টটলের মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। 'ওয়ান্ডারফুল ডিসকোর্স অন দি নেচার অব ওয়াটার এন্ড ফাউনটেনস বোথ ন্যাচরাল এন্ড আর্টিফিশিয়াল' প্যারিস ১৫৭০) নামক গ্রন্থে বার্নার্ড পলিসি পানির গতিচক্র এবং বৃষ্টির পানির দ্বারা ঝর্ণার সিঞ্চিত হওয়ার বিষয়ে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেন।"

ঠিক এ কথাই অর্থাৎ বৃষ্টির পানির ভূগর্ভে প্রবেশ করে উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার ব্যাপারটিই সূরা যুমারের ২১ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নুরের ৪৩ আয়াতে বৃষ্টি ও শিলার কথা বলা হয়েছেঃ"তুমি কি দেখ না আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাহাদিগকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, তুমি দেখিতে পাও, অতঃপর উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশে অবস্থিত শিলাস্তুপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়।"

এ প্রসঙ্গে সূরা ওয়াকিয়ার তিনটি আয়াতের (৬৮-৭০) বিষয়বস্তুর উপর বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজনঃ

"তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করিয়াছ? তোমরাই কি

উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?"

আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান এবং তিনি যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, আল্লার মিঠা পানিকে নোনা পানিতে পরিণত করতে পারার ক্ষমতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার মধ্যে সেই ইশারাই দেয়া হয়েছে। মানুষকে মেঘ থেকে পানি নামিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ দিয়েও সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে। আধুনিক যুগে মানুষ অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মানুষের বৃষ্টি সৃষ্টির ক্ষমতা থাকা বিষয়ে কুরআনে যে বর্ণনা আছে তার প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করা কি কারও পক্ষে সম্ভব?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছেঃ না, সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে মানুষের ক্ষমতার যে সীমাবদ্ধতা আছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ফরাসী আবহাওয়া অফিসের বিশেষজ্ঞ এম এ ফ্যাসি বিশ্বকোষে (ইউনিভার্সালিস এনসাইক্লোপিডিয়া) 'বৃষ্টি' শিরোনামে লিখেছেনঃ "যে মেঘ বৃষ্টির জন্য পরিপক্ক হয়নি, অথবা সেইরূপ বৈশিষ্ট লাভ করেনি সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করানো কখনই সম্ভব হবে না।" অর্থাৎ প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল না হলে কারিগরি জ্ঞান প্রয়োগ করে মানুষের পক্ষে বৃষ্টির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা কখনই সম্ভব হবে না। তা না হলে খরা বা অনাবৃষ্টি কখনই হতে পারত না। অথচ বাস্তবে দেখা যায় খরা বা অনাবৃষ্টি হামেশাই হয়ে থাকে। সুতরাং বৃষ্টি বা আবহাওয়ার উপরে নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা মানুষের জন্য স্বপ্নই থেকে যাবে।

পানির গতি বিবর্তনের জন্য যে প্রাকৃতিক স্থায়ী নিয়ম আছে মানুষ ইচ্ছা করলেই তা লংঘন করতে পারে না। আধুনিক পানি বিজ্ঞানের ধারণা মুতাবেক এ প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে নিম্নরূপঃ

সূর্যরশ্মি থেকে আসা ক্যালোরির কারণে সমুদ্র এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের পানি বাষ্প হয়ে যায়। এ বাষ্প আবহাওয়া মন্ডলে উঠে গিয়ে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। বাতাস এ মেঘকে বিভিন্ন দূরত্বে নিয়ে যায়। মেঘ তখন বর্ষণ না করে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে, অথবা অন্যান্য মেঘের সঙ্গে মিলিত হয়ে আরও ঘনীভূত হয়ে যেতে পারে, অথবা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে বর্ষণ ঘটাতে পারে। এ বৃষ্টি সাগরে (ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭০ ভাগ সাগর) পতিত হওয়ার পর বিবর্তন চক্রের কাজ আবার নতুন ভাবে শুরু হয়ে যায়। বৃষ্টি যখন মাটিতে পড়ে তখন তা গাছপালায় গ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে তাদের জন্ম ও বিকাশে সহায়তা করে। গাছপালা থেকে কিছু পানি আবার আবহাওয়া মন্ডলে ফিরে যায়। অবশিষ্ট পানি মাটিতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে মাটির তলদেশ হয়ে সাগরে ফিরে যায় কিম্বা ঝর্ণা ও নদীতে প্রবাহিত হয়।

পানি বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যের সঙ্গে এ অধ্যায়ে উধৃত কুরআনের আয়াতগুলি মিলিয়ে দেখলে উভয়ের মধ্যে অদ্ভুত মিল ও সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

সাগর

সাগরের ব্যাপারটি অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের। কুরআনে সাগর সম্পর্কে এমন কোন বর্ণনা নেই যার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তবে একটি বিষয় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় সাগর সম্পর্কে যে সকল মতবাদ, উপকথা বা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, কুরআনের কোথাও তার কোন সমর্থন নেই।

কয়েকটি আয়াতে সাগর ও নৌ চালনার বিষয় আছে। সেখানে সাধারণভাবে দর্শনযোগ্য বিষয় থেকে আল্লার সর্বময় ক্ষমতা অনুধাবন করার জন্য চিন্তার খোরাক আছে। নিচের কয়েকটি আয়াত নজির হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ ঃ

সূরা ১৪ (ইব্রাহীম) আয়াত ৩২ঃ "তিনি নৌযানকে তোমাদিগের অধীন করিয়াছেন যাহাতে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে তাহার বিধানে।"

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ১৪ঃ "তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্যাহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যদ্বারা তোমরা অলংকৃত হও; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং ইহা এজন্য যে তোমরা যেন তাহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

সূরা ৩১ (লুকমান) আয়াত ৩১ঃ "তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লার অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে তোমাদিগকে তাহার নিদর্শনাবলী দেখাইবার জন্য? প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।"

সূরা ৫৫ (রহমান) আয়াত ২৪ঃ "সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ অর্ণবপোতসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।"

সূরা ৩৬ (ইয়াসীন) আয়াত ৪১-৪৪ঃ "উহাদিগের জন্য এক নিদর্শন এ যে আমি উহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম এবং উহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি; সে অবস্থায় উহারা কোন সাহায্যকারী পাইবে না এবং উহারা পরিত্রাণও পাইবে না- উহাদিগের প্রতি আমার অনুগ্রহ না হইলে এবং উহাদিগকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে না দিলে।"

এখানে স্পষ্টতই নৌযানে মানুষ বহন অর্থাৎ অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে নূহকে (আ) নৌযানে বহন করে শুষ্ক জমিনে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার কথা বলা হয়েছে।

সমুদ্র সম্পর্কে আর একটি দৃশ্যমান বিষয় তার অস্বাভাবিক বৈশিষ্টের কারণেই সহজে নজরে পড়ে এবং এ বৈশিষ্ট বড় বড় নদী ও সমুদ্রের প্রবেশপথেও দৃশ্যমান হয়ে থাকে। কুরআনে এ বৈশিষ্টের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

এ বৈশিষ্ট হচ্ছে এ যে নদীর মিঠা পানি সাগরের নোনা পানির সঙ্গে মেশে না। টাইগ্রিস (দাজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদী যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে এ দৃশ্য দেখা যায়। ঐ খাড়ি এক শতাধিক মাইল দীর্ঘ একটি সাগর বিশেষ এবং শাতিল আরব নামে অভিহিত। এ উপসাগরের অভ্যন্তরে যখন সাগরের ঢেউ আসে তখন নদীর মিঠা পানিকে শুষ্ক স্থলভাগের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় এবং এভাবে সেচকার্যের সহায়তা করে। এ বিষয়ে কুরআনের এবারতের অর্থ উপলব্ধি করার জন্য অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, আরবী "বাহর" শব্দে বিপুল পরিমাণ পানি বুঝায় এবং সেই অর্থে সাগরও যেমন বুঝায় তেমনি নীলনদ, টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসের মত বড় বড় নদীও বুঝায়। ইংরেজি "সি" (ওণণ) শব্দ এ সাধারণ অর্থই বহন করে।

মিঠা পানি ও নোনা পানি না মেশার বৈশিষ্টটি নিচের তিনটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

সূরা ২৫ (ফুরকান) আয়াত ৫৩ঃ "তিনিই দু দরিয়াকে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর। উভয়ের মধ্যে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।"

সূরা ৩৫ (ফাতির) আয়াত ১২ঃ "দুটি দরিয়া একরূপ নহে- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা মৎস্যাহার কর এবং তোমাদিগের ব্যবহার্য রত্নাবলী আহরণ কর।"

সূরা ৫৫ (রহমান) আয়াত ১৯, ২০ ও ২২ঃ "তিনি প্রবাহিত করেন দু দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না। উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।"

মূল ঘটনার বর্ণনার পর উভয় প্রকার পানি থেকে যা পাওয়া যায় তার উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ মাছ, মুক্তা ও প্রবাল। মিঠা পানি ও নোনা পানি না মেশার ঘটনা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর ক্ষেত্রে একক বা একমাত্র ঘটনা নয়। অন্যত্রও এ ঘটনা আছে। কুরআনে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর নাম উল্লেখ না থাকলেও সাধারণত মনে করা হয় যে এ দু নদীর দিকেই ইশারা করা হয়েছে। প্রবল স্রোতস্বিনী মিসিসিপি ও ইয়াংসি নদীর ক্ষেত্রেও ঐ একই ঘটনা দেখা যায়। দূরতম গভীর সাগরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের মিঠা পানি নোনা পানির সঙ্গে মেশে না।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ

পৃথিবীর গঠন খুবই জটিল। এখন মোটামুটি ভাবে অনুমান করা সম্ভব যে, একটি অতিশয় পুরু স্তর থেকে খুবই উত্তপ্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে পৃথিবী গঠিত হয়েছে। তার কেন্দ্রস্থলে পাথর জাতীয় পদার্থ এখনও গলিত ও উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং উপরের

স্তরটি ঠান্ডা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করেছে। উপরের স্তর বা পৃথিবীর ত্বক খুবই পাতলা; তার পরিমাপ মাইলের হিসাবে কিম্বা বড়জোর দশ মাইলের ইউনিটে করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল থেকে পরিধির দূরত্ব ৩,৭৫০ মাইলের চেয়ে কিছু বেশী। সুতরাং ত্বকের পরিমাপ গড়পড়তা হিসেবে গোলকের পরিধির একশো ভাগের একভাগও হয় না। অথচ সকল ভূতাত্ত্বিক ঘটনা এ ত্বকের উপরেই ঘটেছে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে পৃথিবীর ত্বকে যে ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলেই পবর্তমালা গঠিত হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদদের নিকটে এ প্রক্রিয়া 'অরোজেনেসিস' নামে পরিচিত এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে ভাঁজের ফলে পর্বত গঠিত হয়েছে ঠিক সে ভাঁজের কারণেই পৃথিবীর ত্বক আনুপাতিক ভাবে নিচে নেমে গিয়েছে এবং এভাবে পর্বতের জন্য শক্ত বুনিয়াদ সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে সাগর ও জমিনের বন্টন ও অনুপাতের বিষয়টি অতি সম্প্রতি সাব্যস্ত হয়েছে এবং এখনও এমন কি সাম্প্রতিকতম ও জ্ঞাত আমলের ব্যাপারেও আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রয়েছে। সাগরমালা সম্ভবত পাঁচ কোটি বছর আগে গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমগ্র ভূখন্ড সম্ভবত একটিমাত্র খন্ডের আকারে ছিল এবং পরে তা খন্ডিত হয়ে বিভিন্ন মহাদেশের আকার ধারণ করে। কোন মহাদেশ বা তার অংশ বিশেষ (উত্তর আটলান্টিক মহাদেশ এবং ইউরোপের অংশবিশেষ) সামুদ্রিক অঞ্চলে পর্বত গঠিত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক ধারণা মতে জমিন গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে পর্বতের গঠন ও বিকাশই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে চতুর্থ পর্যায় পর্যন্ত জমিনের গঠন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেকটি পর্বতমালার গঠন সাগর ও জমিনের ভারসাম্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জমিনের কোন অংশ নতুন ভাবে গড়ে উঠেছে এবং এভাবে লক্ষ লক্ষ বছর যাবত সাগর ও জমিনের বন্টন ও অনুপাত পরিবর্তন করেছে। এভাবে পরিবর্তন হতে হতে বর্তমানে পৃথিবীর জমিনের পরিমাণ সাগরের পরিমাণের দশ ভাগের মাত্র তিন ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

এভাবে বিগত কয়েক লক্ষ বছরে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এখন মোটামুটি ভাবে তার একটি বর্ণনা দেয়া সম্ভব হতে পারে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের প্রসঙ্গে কুরআনে কেবলমাত্র পর্বতের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

নিচের আয়াতগুলিতে পৃথিবীর গঠন প্রসঙ্গে মানুষের প্রতি আল্লার করুণার কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে আর কিছু বোধহয় বলার মত নেই।

সূরা ৭১ (নূহ) আয়াত ১৯-২০ঃ "এবং আল্লাহ তোমাদিগের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।"

সূরা ৫১ (যারিয়াত) আয়াত ৪৮ঃ "আমি ভূমিকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত

সুন্দরভাবে বিছাইয়াছি ইহা।"

ভূমিকে কার্পেটের মত বিছিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ কার্পেট হচ্ছে পৃথিবীর ত্বক, একটি অতিশয় শক্ত খোসা যার উপরে আমরা বাস করি। এ ত্বক না থাকলে পৃথিবী কোন প্রাণীর বাসের উপযোগী হতে পারত না। কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তরল উত্তপ্ত এবং জীবন বিধ্বংসী।

পর্বতমালা এবং ভূপৃষ্ঠ ভাঁজ হওয়ার ফলে তাদের শক্ত ও শক্তিশালী হওয়া বিষয়ে কুরআনে যে বিবরণ আছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সূরা ৮৮ (গাশিয়া) আয়াত ১৯-২০ঃ "পর্বতমালা কিভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে (তাবুর মত) এবং ভূতলকে কিভাবে সমতল করা হইয়াছে?"

পবর্তমালা কিভাবে জমিনে প্রোথিত হয়েছে পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সূরা ৭৮ (নাবা) আয়াত ৬-৭ঃ "আমি কি ভূমিকে বিছানা ও পর্বতকে কীলক সদৃশ করি নাই?" কীলক হচ্ছে তাঁবুর টানা দড়ি বাঁধার জন্য মাটিতে পোতা খুঁটা (আওতাদ, ওয়াতাদের বহুবচন)।

জমিনের ভাঁজগুলিই যে পর্বতের বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করে আধুনিক ভূতত্ত্ববিদগণ তা স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে একেকটি ভাঁজের আকার এক থেকে দশ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। এ ভাঁজগুলি ভূত্বককেও শক্তিশালী করে থাকে। এ পটভূমিকায় নিচের আয়াতগুলির প্রতি খেয়াল করা যেতে পারেঃ

সূরা ৭৯ (নাজিয়াত) আয়াত ৩২ঃ "এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন।"

সূরা ৩১ (লুকমান) আয়াত ১০ঃ "তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদিগকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে।"

সূরা নাহলের ১৫ আয়াতে এ একই কথা বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার ৩১ আয়াতেও এ একই ধারণা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ "এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক ঢলিয়া না যায়।"

এ আয়াতগুলিতে এ ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে যে পর্বতগুলো যেভাবে স্থাপন করা হয়েছে তার ফলে স্তিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এ ধারণা আধুনিক ভূতাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

পৃথিবীর আবহাওয়া

আকাশ সম্পর্কে কুরআনের বিবিধ বর্ণনা আমরা আগেই পরীক্ষা করে দেখেছি এখন আমরা আবহাওয়া মন্ডলের কতিপয় ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত পরীক্ষা

করে দেখব। এখন আমরা দেখতে পাব যে, এ আয়াতগুলিতে বর্ণিত তথ্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের আদৌ কোন বিরোধিতা নেই।

উচ্চতা

মানুষ উর্ধে আরোহন করলে অস্বস্তি বোধ করে। উচ্চতা বাড়লে অস্বস্তিও বেড়ে যায়। এ পরিচিত অনুভূতির কথাই সূরা আনআমের ১২৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ "আল্লাহ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।"

কতিপয় ভাষ্যকার দাবী করেছেন যে, মুহাম্মদের (সঃ) আমলে উর্ধে আরোহণের অস্বস্তির কথা আরবদের জানা ছিল না। কিন্তু এ দাবী আদৌ সত্য নয়। কারণ আরব এলাকায় তখনও দু মাইলের চেয়েও বেশী উঁচু পর্বত ছিল; সুতরাং ঐ উচ্চতায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কথা তাদের না জানা থাকার কথা নয়। নবীর আমলে ইয়েমেনের রাজধানী সানা শহরে লোকবসতি ছিল এবং সমুদ্র সমতল থেকে শহরটির উচ্চতা ছিল প্রায় ৭,৯০০ ফুট। কোন কোন ভাষ্যকার আবার এ আয়াতে মহাশূন্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু তাও সত্য নয়। মহাশূন্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এ আয়াতে অন্তত নেই।

আবহাওয়া মন্ডলে বিদ্যুৎ

নিচের কয়েকটি আয়াতে আবহাওয়ামন্ডলে বিদ্যুৎ থাকা এবং তার ফলে বাজপড়া ও শিলাপাত হওয়ার কথা বলা হয়েছেঃ

সূরা ১৩ (রাদ) আয়াত ১২-১৩ঃ "তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলি যাহা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনি সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজপাত এবং যাহাতে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন; তবুও উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে যদিও তিনি মহা শক্তিশালী।"

সূরা ২৪ (নূর) আয়াত ৪৩ঃ "তুমি কি দেখ না আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, অতঃপর তাহাদিগকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন। তুমি দেখিতে পাও, অতঃপর উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা, আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা

অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়।"

এ দুটি আয়াতে স্পষ্টতই বৃষ্টির ঘনমেঘ বা শিলামেঘের গঠন এবং বজ্রপাতের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। মেঘের ক্ষেত্রে তার উপকারিতার কারণে ভরসা সৃষ্টি করে এবং বজ্রের ক্ষেত্রে ভীতির সঞ্চার হয় কারণ যখন তা পতিত হয় মহা শক্তিশালী আল্লার ইচ্ছাতেই হয়। এ দুটি ঘটনার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা আবহাওয়ামন্ডলে বিদ্যুৎ থাকা সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা সাব্যস্ত ও সমর্থিত হয়েছে।

ছায়া

ছায়া যে আছে এবং তা যে চলতে পারে এ ঘটনা এখন খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। নিচের কয়েকটি আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ৮১ঃ "আল্লাহ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদিগের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ৪৮ঃ "উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লার সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যাহার ছায়া আল্লার প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত থাকিয়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়ে?"

সূরা ২৫ (লুকমান) আয়াত ৪৫-৪৬ঃ "তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়া বিস্তার করেন? তিনি তো ইচ্ছা করিলে ইহাকে স্থির রাখিতে পারিতেন; বরং তিনি সূর্যকে করিয়াছেন ইহার নিদের্শক। অতঃপর তিনি ইহাকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনেন।"

এ আয়াতগুলিতে আল্লার প্রতি তাঁর সৃষ্ট সকল বস্তু ও তাদের ছায়ায় বিনীত ভাব থাকা এবং আল্লাহ ইচ্ছে করলেই তাঁর শক্তির সকল নিদর্শন ফিরিয়ে নিতে পারেন বলে উল্লেখ করা ছাড়াও সূর্য ও ছায়ার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, মুহাম্মদের (সঃ) আমলে ছায়ার গতি সূর্যের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলার গতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বিশ্বাস করা হত এবং সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় পরিমাপের জন্য সূর্য ঘড়ির ক্ষেত্রে এ নীতিই প্রয়োগ করা হত। তৎকালে প্রচলিত এ ব্যাখ্যার কোন উল্লেখ না করেই কুরআনে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এবং ব্যাখ্যাটির চরিত্র এমন যে মুহাম্মদের (সঃ) পরে বহু শতাব্দী যাবত তা সহজভাবেই মেনে নেয়া হত। যদিও শেষ পর্যন্ত তা ভুল বলে প্রমানিত হয়। কুরআনে কেবল মাত্র ছায়ার নির্দেশক হিসেবেই সূর্যের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। স্পষ্টতই কুরআনে যে প্রকারে ছায়ার কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে এ বিষয়ের আধুনিক জ্ঞান ও তথ্যের কোন বিরোধিতা নেই।

প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্য

এ অধ্যায়ে প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক অনেক আয়াতের সমাবেশ করা হয়েছে। সে সঙ্গে উদ্ভিদ জগত এবং প্রাণী জগতের সাধারণ ও বিশেষ বিষয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট সম্বলিত কিছু আয়াতও সংযোজন করা হয়েছে। এ বিষয়ের আয়াত গুলি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। আমি যেভাবে এ আয়াতগুলি শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি তাতে কুরআনে বর্ণিত তথ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

শব্দার্থের কতিপয় অন্তর্নিহিত অসুবিধার কারণে এ অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে কুরআনের এবারত পরীক্ষা করা কখনও কখনও যথেষ্ট নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহায়তায় সে সমস্যা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। এ সহায়তা প্রাণীজগত, মানবজগত এবং উদ্ভিদজগতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে এবং এ সহায়তা না হলে কুরআনের বর্ণনার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যে উপনীত হওয়াই সম্ভব হত না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে যে পন্ডিত ব্যক্তিগণ কুরআনের যে সকল তরজমা করেছেন বিজ্ঞানীর কাছে তা অবশ্যই ভুল বলে সাব্যস্ত হবে। প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া যাঁরা ভাষ্য লিখেছেন তাঁদের ভাষ্যের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রাণের উৎপত্তি

প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের মনে সর্বদাই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তার নিজের প্রাণ সম্পর্কে তো বটেই, তার চারদিকে বিচরণশীল বিবিধ প্রাণ সম্পর্কেও। এ প্রশ্নটি আমরা **সাধারণ দৃষ্টিকোণ** থেকে বিচার-বিবেচনা করে দেখব। **মানুষের পৃথিবীতে** আবির্ভাব এবং সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিধায় সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

কুরআনে যেখানে প্রাণের উৎপত্তি সাধারণ ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। যে আয়াতে এ বর্ণনা আছে সেখানে বিশ্বের গঠন প্রক্রিয়াও বর্ণিত হয়েছেঃ

সূরা ২১ (আম্বিয়া) আয়াত ৩৩ঃ "সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না?"

কোন কিছুর মধ্য হইতে অন্য কোন কিছু পাওয়ার ধারণায় কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় না। এ আলোকে আয়াতটির অর্থ এ হতে পারে যে, পানিকে অপরিহার্য উপাদান রূপে ব্যবহার করেই প্রত্যেকটি প্রাণবান জীব সৃষ্টি করা হয়েছে; অথবা পানিতেই প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে। এ দুটি অর্থই আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাণের উৎপত্তি আসলে পানিতেই এবং সকল জীবকোষের প্রধান উপাদানও পানিই। পানি ছাড়া জীবন সম্ভবই হতে পারে না। অপর কোন গ্রহে প্রাণী আছে কিনা এ প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় সেখানে পানি আছে কি?

আধুনিক তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনতম প্রাণ উদ্ভিদ জগতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সামুদ্রিক শেওলা ক্যালড্রিয়ান আমলের পূর্বে অর্থাৎ জ্ঞাত প্রাচীনতম জমিনের আমলেই দেখা গেছে। প্রাণীর অর্থাৎ প্রাণীজগতের জীবকোষ সম্ভবত তার কিছু পরে এসেছে এবং তাও সমুদ্র থেকেই এসেছে।

পানি (ইংরাজী ওয়াটার) আরবী 'মাআ' শব্দের অনুবাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাআ' শব্দে আকাশের পানি, সাগরের পানি অথবা যে কোন প্রকারের তরল পদার্থ বুঝা যেতে পারে? প্রথম অর্থের পানি উদ্ভিদ জগতের সকল প্রাণের জন্য অপরিহার্য।

সূরা ২০ (তা-হা) আয়াত ৫৩: "তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা (জোড়ায় জোড়ায়) বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।"

উদ্ভিদ জগতের জোড়া সম্পর্কে এ প্রথম উল্লেখ। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

অপর অর্থে অর্থাৎ কোন প্রকারের না বলে শুধু তরল পদার্থ বলা হলে যে পানি বুঝা যায় তার একটি প্রকার সকল জীবের প্রাণ গঠনের মূল ভিত্তি। সূরা ২৪ (নূর) আয়াত ৪৫: "আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে।" পানি শব্দটি যে বীর্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় তা আমরা পরে দেখতে পাব।

সাধারণভাবে প্রাণের উৎপত্তি বিষয়েই হোক, অথবা মাটিতে উদ্ভিদের উদগম বিষয়েই হোক, অথবা প্রাণীর বীর্য বিষয়েই হোক, কুরআনে যে সকল বিবরণ আছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সকল প্রবাদ ও উপকথা প্রচলিত ছিল কুরআনে তার একটিরও উল্লেখ নেই।

উদ্ভিদ রাজ্য

বৃষ্টির কারণে গাছপালা লতাগুল্ম উৎপন্ন হওয়ার ব্যাপারে যে সকল আয়াতে আল্লার রহমতের উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলিই পুরোপুরি উদ্ধৃত করা সম্ভব। তবে এখানে

আমরা মাত্র তিনটি আয়াত উধৃত করছিঃ

সূরা ১৬ নাহল আয়াত ১০-১১ঃ "তিনিই আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন; উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ (ও তৃণলতা) যাহাতে তোমরা পশুচারণ করিয়া থাক। তিনি তোমাদিগের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, জায়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল।"

সূরা ৬ (আনআম) আয়াত ৯৯ঃ "তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করেন; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদগম করেন, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেন এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন এবং জায়তুন ও দাড়িম্বও, ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসাদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয় তখন উহাদিগের দিকে লক্ষ্য কর; বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

সূরা ৫০ (কাফ) আয়াত ৯-১১ঃ "আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি উপকারী বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান, শস্যরাজি ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর আমার দাসদিগের জীবিকাস্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে।"

এরূপ সাধারণ প্রকৃতির তথ্যের সঙ্গে কুরআনের সুনির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে।

উদ্ভিদ জগতে ভারসাম্য

সূরা ১৫ (হিজর) আয়াত ১৯ঃ "আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি সুপরিমিতভাবে।"

বিভিন্ন খাদ্যের গুণবৈচিত্র

সূরা ১৩ (রাদ) আয়াত ৪ঃ "ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন; উহাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ; উহাদিগকে দেয়া হয় একই পানি এবং ফলের হিসাবে উহাদিগের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।"

এ আয়াতগুলির অস্তিত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ এখানে নেহায়েতই সাদামাটা ভাষায় মৌলিক সত্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং তৎকালীন প্রবাদ বা উপকথার কোন উল্লেখই করা হয়নি। তবে উদ্ভিদ জগতে বংশবিস্তার বিষয়ে কুরআনের বর্ণনাই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

উদ্ভিদ জগতে বংশ বিস্তার

উদ্ভিদ জগতে দু প্রকারে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে- যৌন এবং অযৌন। প্রথম প্রকারকেই প্রকৃতপক্ষে বংশবিস্তার বলা যেতে পারে, কারণ এক্ষেত্রে এমন একটি দৈহিক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রসূতির অনুরূপ এক নতুন জীবের আবিভাব ঘটানো।

পক্ষান্তরে অযৌন বংশবিস্তার হচ্ছে নিছক সংখ্যাবৃদ্ধি। মূল গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশের মূল গাছের আকারেই বিকশিত হওয়া। গুইলিয়ারমন্ড ও মানজেনট এ প্রক্রিয়াকে "বিশেষ ধরনের জন্ম" বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রক্রিয়ার একটি সহজ উদাহরণ হচ্ছে কলম করা ও গাছের ডাল কেটে নিয়ে মাটিতে পুঁতে তাতে নতুন শিকড় গজানো। সকল গাছ থেকে কলম করা যায়না; কিছু গাছ আছে যা কলম করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। কোন কোন গাছে এমন মুথা বা ঝুরি জন্মায় যা বীজের মতই ব্যবহার করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, যৌন প্রক্রিয়ার ফলেই বীজের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উদ্ভিদ জগতে একই অথবা একাধিক গাছের পুরুষ ও নারী অংশের সংমিশ্রণের ফলে যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার ঘটে থাকে। কুরআনে একমাত্র এ প্রক্রিয়ারই উল্লেখ আছে।

সূরা ২০ (তাহা) আয়াত ৫৩ঃ "তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং উহা দ্বারা (জোড়ায় জোড়ায়) বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন।"

'যওজ' শব্দের অর্থ জোড়ার একটি। এ আরবী শব্দের বহুবচন হচ্ছে 'আযওয়াজ'। শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে এমন কিছু যা অপর কিছুর সঙ্গে মিলিত হয়ে জোড়া গঠন করে। এ অর্থে শব্দটি বিবাহিত দম্পতি এবং একজোড়া জুতার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সূরা ২২ (হজ্জ) আয়াত ৫ঃ "তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্যশ্যামল হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ (জোড়ায় জোড়ায়)।"

সূরা ৩১ (লুকমান) আয়াত ১০ঃ "তিনিই পৃথিবীতে উদগত করেন সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ (জোড়ায় জোড়ায়)।"

সূরা ১৩ (রাদ) আয়াত ৩ঃ "তিনি (পৃথিবীতে) প্রত্যেক ফল সৃষ্টি করিয়াছেন দু প্রকারের (জোড়ায়)।"

আমরা জানি যে, উচ্চতর পর্যায়ের গাছের বংশবিস্তার প্রক্রিয়ার শেষ বস্তু হচ্ছে ফল। এ জাতীয় গাছের সংগঠন খুবই উন্নত মানের এবং জটিল। ফলের আগের পর্যায় হচ্ছে ফুল এবং সে ফুলের পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ আছে। স্ত্রী অঙ্গে রেণু স্থাপিত হওয়ার পর ফল ধরে, তারপর সে ফল পাকার পর বীজ সৃষ্টি হয়। সুতরাং সকল ফলই পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এ কথাই কুরআনে বলা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে অনুর্বর ফুল (পুরুষ ও স্ত্রী রেণুর সংমিশ্রণ ছাড়া) থেকেও ফল হতে পারে, যেমন কলা, কয়েক ধরনের আনারস, ডুমুর, কমলা ও আঙ্গুর। এ সকল ফল আবার উর্বর ফুল থেকেও জন্মাতে পারে।

বীজের বহিরাবরণ (অনেক সময় খুবই শক্ত হয়ে থাকে) খুলে যাওয়ার পর যখন অংকুরোদগম হয় তখনই বংশ বিস্তার প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় আসে। বহিরাবরণ খুলে যাওয়ার ফলেই শিকড় গজাতে পারে এবং সে শিকড় তখন মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে একটি নতুন চারা গজিয়ে উঠতে সহায়তা করে থাকে।

কুরআনে এ অংকুরোদগম প্রক্রিয়ার কথা এভাবে বলা হয়েছেঃ

সূরা ৬ (আনআম) আয়াত ৯৫ঃ "আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি (উন্মুক্ত করিয়া) অংকুরিত করেন।"

উদ্ভিদ জগতের জোড়ার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে কুরআনে এ ধারণাটি আরও ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সূরা ৩৬ (ইয়াসীন) আয়াত ৩৬ঃ "পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না তাহাদিগের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।"

মুহাম্মদের (সঃ) আমলে "উহারা যাহাদিগকে জানে না" এ বিষয়ে হয়ত নানা প্রকারের আন্দাজ অনুমান হয়ে থাকবে। কিন্তু আমরা এখন সঠিকভাবেই জানি যে, প্রাণী এবং অপ্রাণী জগতে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম পর্যায়ে এ জোড়ার অস্তিত্ব আছে। লক্ষণীয় যে, কুরআনের এ সকল ধারণা আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংগে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

প্রাণীর রাজ্য

কুরআনে এমন কয়েকটি বিষয় আছে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সংগে আধুনিক বিজ্ঞানের মুকাবিলা হওয়া প্রয়োজন। তবে কেউ যদি নিচে উধৃত আয়াতটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন না করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনে আসলে যে কি আছে তা তিনি পুরোপুরিভাবে জানতে পারবেন না। এ আয়াতে মানুষকে তার প্রতি আল্লার রহমত উপলব্ধি করানোর উদ্দেশ্যে প্রাণী জগতের কতিপয় উপাদান সৃষ্টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই (বিবিধ উপাদান) সৃষ্টি করা হয়েছে, এভাবে বর্ণনা করা কুরআনের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট **এবং** মূলত এ বৈশিষ্টের একটি নজীর হিসেবেই আমরা আয়াতটি বিশেষভাবে উধৃত করছি। আয়াতটির লক্ষ্য পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীগণ এবং এ দৃষ্টিকোণ ছাড়া অন্য কোনভাবে বিষয়টি বিবেচনার **অবকাশ নেই**।

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ৫-৮ঃ "তিনি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাদিগের **জন্য**

উহাতে শীতবস্ত্রের উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক এবং তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং উহারা তোমাদিগের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূর দেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছিতে পারিতে না। তোমাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ।"

এ সাধারণ বর্ণনার পাশাপাশি কুরআনে কতিপয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তথ্য দেয়া হয়েছে। বিষয়গুলি হচ্ছে- (১) প্রাণীজগতে বংশবিস্তার, (২) প্রাণীজগতে সমাজের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ, (৩) মৌমাছি, মাকড়সা ও পাখী সম্পর্কে বর্ণনা, (৪) প্রাণী দুগ্ধের উপাদানের উৎস বিষয়ের বিবরণ।

এখন আমরা এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।

১। প্রাণীজগতে বংশবিস্তার

সূরা নাজমের ৪৫-৫৬ আয়াতে বিষয়টি খুবই সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছেঃ "তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী স্খলিত শুক্র বিন্দু হইতে।"

এখানে "যুগল" বলতে যা বুঝানো হয়েছে উদ্ভিদ জগত বিষয়ক আয়াতে তা "জোড়া" বলে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তবে লক্ষণীয় যে, এখানে যুগলের লিঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। বংশবিস্তারের জন্য অল্প পরিমাণ তরল পদার্থের প্রয়োজন বলে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা সঠিক, সুনির্দিষ্ট, এবং সম্পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। "শুক্র" বুঝা যায় এরূপ শব্দই আরবীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা আমরা পরে আলোচনা করব।

২। প্রাণীজগতে সমাজের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ

সূরা ৬ (আনআম) আয়াত ৩৮ঃ "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি ওড়ে না যাহা তোমাদিগের মত এক একটি সমাজ নয়। গ্রন্থে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্র হইবে।"

এ আয়াতের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমত আয়াতের বর্ণনা থেকে মনে হয় মৃত্যুর পর পশুপাখির কি হবে সে সম্পর্কে এখানে নির্দেশনা আছে। কিন্তু দৃশ্যত এ বিষয়ে ইসলামে কোন নির্দেশ নেই। দ্বিতীয়ত মনে হয় এখানে সাধারণভাবে পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের (তকদির) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (তকদির

বলতে মানুষের ক্ষেত্রে কি বুঝতে হবে ইতিপূর্বে এ গ্রন্থের তৃতীয় অংশের শুরুতে আমরা আলোচনা করেছি)। তকদির সার্বভৌম শক্তি অথবা শর্তাধীন শক্তি হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে। শর্তাধীন বা শর্ত সাপেক্ষ তকদির বলতে আমরা সে আচরণ বুঝাতে চাচ্ছি যা কাঠামোগত বা ক্রিয়াগত বৈশিষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; যেমন প্রাণী পরিবেশ বিশেষে তার বিশেষ অনুভূতি অনুসারে কাজ করে থাকে। এ অনুভূতি তার দেহের বাইরের পরিবেশের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ব্লাশেয়ার বলেছেন, আগের দিনের ভাষ্যকার রাজি মনে করেন যে, প্রাণী যে আভ্যন্তরিক অনুভূতি সঞ্জাত কার্য দ্বারা আল্লার উপাসনা করে এ আয়াতে তার কথাই বলা হয়েছে। শেখ সি বৌবাকিয়ার হামজা তাঁর কুরআনের তরজমার ভাষ্যে বলেছেন- "আসমানী জ্ঞানে সৃষ্ট অনুভূতির ফলে সকল প্রাণী সমাজবদ্ধ হয় এবং দাবী করে যে প্রত্যেক সদস্যের কাজ সমগ্র শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হবে।"

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে পশুপাখির আচরণ সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর তদন্ত পরিচালিত হয়েছে এবং তার ফলে দেখা গেছে যে, তারা সত্যি সত্যিই সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। এরূপ কোন কোন সমাজের কাজ দীর্ঘদিন যাবত পর্যবেক্ষণের পর ঐ সমাজের সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও সংগঠন আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। কতিপয় প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে অতি সম্প্রতি তাদের সমাজ সংগঠনের কর্মকর্তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। মৌমাছি সম্পর্কেই নিসন্দেহে সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে এবং মৌমাছির আচরণ নির্ণয়ের কাজের সঙ্গে য়ানফ্রিশের নাম জড়িত রয়েছে। এ কাজের জন্য ফ্রিশ, লোরেঞ্জ ও টিনবার্জেন ১৯৭৩ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

৩। মৌমাছি, মাকড়সা ও পাখি বিষয়ক বর্ণনা

স্নায়ুতন্ত্র বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ যখন প্রাণীর আচরণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখাতে চান তখন তাঁরা প্রথমেই মৌমাছি, মাকড়সা এবং পাখির (বিশেষত যাযাবর পাখি) কথা বলে থাকেন। এ তিন প্রাণীর ক্ষেত্রে নিসন্দেহে অতিশয় উন্নত ধরনের সমাজ সংগঠনের সন্ধান পাওয়া যায়।

কুরআনে এ তিন প্রাণীর কথা উল্লেখ থাকার কারণে যে বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের চরিত্র ও আচরণ সত্য সত্যই বৈশিষ্টপূর্ণ। এখন আমরা পর পর এ তিন প্রাণী সম্পর্কে আলোচনা করব।

মৌমাছি

কুরআনে মৌমাছি সম্পর্কেই দীর্ঘতম বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ৬৮-৬৯ঃ "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ

করে তাহাতে; উহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; ইহাতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার।"

[লক্ষণীয় যে, কুরআনে একমাত্র এভাবেই মানুষের জন্য ব্যাধির প্রতিকারের উল্লেখ আছে। কতিপয় রোগের ক্ষেত্রে মধু সত্যিই উপকারী। এ বিষয়ে বিপরীত যা কিছুই বলা হোক না কেন, কুরআনের অন্যত্র কোথাও আর কোন রোগ প্রতিকারের উল্লেখ নেই।]

প্রতিপালকের পদ্ধতি অনুসরণ কর বলতে আসলে যে কি বুঝায় তা নির্ণয় করা কঠিন; তবে নির্দেশটি বোধহয় সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। মৌমাছির আচরণ সম্পর্কে এযাবত যে তথ্য আবিষ্কার হয়েছে তার ভিত্তিতে শুধু এটুকই বলা যেতে পারে যে, তাদের সকল আচরণ তাদের স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাকড়সা ও পাখির ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য। মৌমাছির নাচ অপর মৌমাছির সঙ্গে যোগাযোগের একটি উপায়, কতদূরে কোন দিকে অবস্থিত ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা যেতে পারে এভাবে তা তারা একে অপরকে জানিয়ে থাকে। তাছাড়া কোন ধরনের দেহভঙ্গি দ্বারা কর্মী মৌমাছিদের মধ্যে সংবাদ বিনিময় হয়ে থাকে ফন ফ্রিশের গবেষণায় তাও সাব্যস্ত হয়েছে।

মাকড়সা

মাকড়সার ঘরের অস্থায়ী অবস্থা বিশেষভাবে দেখানোর জন্যই কুরআনে এ প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাকড়সার ঘরের (জাল) মত হালকা, অস্থায়ী ও ভঙ্গুর জিনিস আর হতে পারে না। কুরআন বলছে, মাকড়সার ঘর ঠিক তাদের ঘরের মতই মজবুত যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মনিব গ্রহণ করেছে।

সূরা ২৯ (আনকাবুত) আয়াত ৪১ঃ "যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, সে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত।"

মাকসড়ার গ্রন্থি থেকে নির্গত এক প্রকার লালার সাহায্যে তারা ঘর বানায়। এ রেশমের মত সুতা খুবই মিহি ও হালকা। মাকড়সার জাল এতই দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর যে মানুষের পক্ষে অমন কিছু প্রস্তুত করা আদৌ সম্ভব নয়। এ জালের বিস্ময়কর ও অসাধারণ কারুকার্য দেখে প্রকৃতি বিজ্ঞানীগণ হতবাক হয়ে গেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, মাকড়সার স্নায়ুবিক কোষের অবস্থান বৈচিত্রের কারণেই জ্যামিতিক ভাবে নিখুঁত অমন বুননকার্য সম্ভব হয়ে থাকে।

পাখী

কুরআনে পাখীর কথা অনেক জায়গাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইব্রাহীম, ইউসুফ,

দাউদ, সোলায়মান এবং ঈসা নবীর জীবনের ঘটনা প্রসঙ্গেও পাখির উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা এখানে যে বিষয়ে আলোচনা করছি তাতে ঐ সকল উল্লেখের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই।

কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে জমীনে প্রাণীর সমাজ এবং আসমানে পাখীর সমাজ থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ৬ (আনআম) আয়াত ৩৮ঃ "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি ওড়ে না যাহা তোমাদের মত এক একটি সমাজ নয়। গ্রন্থে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্র হইবে।"

অপর দুটি আয়াতে আল্লার শক্তির প্রতি পাখির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের উল্লেখ আছে।

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ৭৯ঃ "তাহারা কি লক্ষ্য করে না বিহংগের প্রতি যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ উহাদিগকে সেখানে স্থির রাখেন।"

সূরা ৬৭ (মূলক) আয়াত ১৯ঃ "উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদিগের উর্ধদেশে উড্ডীয়মান বিহংগকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই উহাদিগকে স্থির রাখেন।"

এ দুটি আয়াতের যে কোন একটি শব্দের তরজমা করা খুবই জটিল ব্যাপার। এখানে যে তরজমা করা হয়েছে তাতে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর নিজ শক্তিতে পাখিকে ধরে রাখেন। মূল আরবী ক্রিয়াপদটি হচ্ছে 'আমসাকা', যার মূল অর্থ হচ্ছে 'হাত স্থাপন করা, আটক করা, ধরা, কাউকে ধরে রাখা।'

কুরআনে আল্লার হুকুমের উপর পাখির এ যে সম্পূর্ণ নির্ভরতার উল্লেখ করা হয়েছে, এ অবস্থার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের তুলনা করা যেতে পারে, যে তথ্যে দেখা গেছে যে, কতিপয় প্রজাতির পাখি তাদের চলাফেরার পথের ব্যাপারে একটি নির্ধারিত ধারা অনুসরণ করে থাকে। এ সকল পাখি, এমনকি তাদের অনভিজ্ঞ শাবকগুলিও অতিশয় দীর্ঘ এবং জটিল পথ অতি সহজেই নির্ভুলভাবে অতিক্রম করে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে তারা আবার তাদের যাত্রাস্থলে ফিরে আসে। ফলে এ সত্যই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রেই এ সফরের কর্মসূচী পূর্বনির্ধারিত অবস্থায় স্থাপিত আছে। এছাড়া এ কাজের আর কোন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে না। অধ্যাপক হ্যামবার্জার তাঁর "পাওয়ার এন্ড ফ্রেজাইলিটি' (লা পুইসানস আলা ফ্রেজাইলিটে) নামক গ্রন্থে (প্রকাশক ফ্ল্যামারিত্তন, প্যারিস, ১৯৭২) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাসিন্দা এক ধরনের পাখির (মাটন-বার্ড) বিখ্যাত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এ পাখি ছয় মাস সময়ে ১৫,৫০০ মাইলেওর বেশী পথ বাংলা ৪ সংখ্যার আকারে সফর করে থাকে এবং সর্বাধিক এক সপ্তাহ বিলম্বে তার যাত্রাস্থলে ফিরে আসে। স্বীকার করতেই হয় যে এ সফরের জটিল নির্দেশাবলী পাখির স্নায়ুতন্ত্রেই স্থাপিত আছে। অতি অবশ্যই এ সফরসূচী পূর্বনির্ধারিত, কিন্তু কে পূর্বনির্ধারণ করেছেন?

৪। প্রাণীদুগ্ধের উপাদানের উৎস

এ বিষয়ে কুরআনে যে সংজ্ঞা দেয়া আছে (সূরা ১৬-নাহল আয়াত ৬৬) তা আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এখানে এ আয়াতের যে তরজমা ও ব্যাখ্যা দিয়েছি তা আমার নিজের। কারণ এ আয়াতের আধুনিকতম তরজমাতেও তরজমাকারীগণ এমন অর্থ দিয়েছেন যা আমার মতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। দুটি দৃষ্টান্ত দিইঃ

আর ব্লাশেয়ারের তরজমা (প্রকাশক- জি পি মাইসোনেভু আলারোজ, প্যারিস, ১৯৬৬)ঃ "অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। তোমাদের পান করার জন্য দিয়ে থাকি বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য উত্তম এবং যা আসে তাদের পেটের হজম হওয়া খাদ্য ও রক্তের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জিনিস থেকে।"

অধ্যাপক হামিদুল্লাহর তরজমা (প্রকাশক- ক্লাব ফ্রাং কাইজ দু লিভার, প্যারিস, ১৯৭১)ঃ "অবশ্যই তোমাদের গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। তাদের পেটের মধ্যে যা আছে, তাদের মল ও রক্তের মধ্য থেকে আমরা তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, পানকারীদের জন্য যা উপাদেয়।"

এ তরজমা দু'টি কোন শরীরবিদ্যা বিশেষজ্ঞকে দেখান হলে তিনি বলবেন ব্যাপারটি অস্পষ্ট, ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। তার কারণ এই যে, এমনকি প্রাথমিক ভাবেও বিষয়টির আধুনিক ধারণার সঙ্গে তরজমায় প্রদত্ত ধারণার কোন মিল নেই অথচ এ দুজন তরজমাকারী খুবই বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ। সকলেই জানেন যে, কোন তরজমাকারী তরজমায় বিশেষজ্ঞ হলেও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে যদি বিশেষজ্ঞ না হন, তাহলে বৈজ্ঞানিক বর্ণনার তরজমায় তিনি ভুল করতে পারেন। আমার নিজের মতে আয়াতটির সঠিক তরজমা হবে এরূপঃ "অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। আমরা তোমাদের পান করতে দেই তাদের দেহের মধ্যে যা আছে, যা নাড়ীর মধ্যকার বস্তু ও রক্তের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়, সে দুধ বিশুদ্ধ ও উপাদেয় যারা পান করে তাদের কাছে।"

কায়রোর সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক এফেয়ার্স সম্পাদিত এবং ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'মুনতাখাব' নামক গ্রন্থে এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, আমার এ ব্যাখ্যা তার খুবই কাছাকাছি। উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রিম কাউন্সিল তাঁদের ব্যাখার জন্য আধুনিক শরীরবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে আমি আমার ভাষ্যের সমর্থনে বলতে পারি যে আমি 'তাদের দেহের মধ্যে' ব্যবহার করেছি; পক্ষান্তরে আর ব্লাশেয়ার ও অধ্যাপক হামিদুল্লাহ তরজমা করেছেন 'তাদের পেটের মধ্যে' বলে। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আরবী 'বাতন' শব্দটির অর্থ 'মধ্যভাগ' বা 'কোন কিছুর অভ্যন্তর ভাগ'-ও হতে পারে, আবার পেটও

হতে পারে। শব্দটির এখানে শরীরতত্বগত কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার হিসেবে 'তাদের দেহের মধ্যে' বেশ লাগসই ও সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়।

দুধের উপাদানের 'প্রাথমিক উৎস'-এর ধারণা আরবী 'মিন' (ইংরেজী ফ্রম এবং বাংলা থেকে) শব্দ থেকে এবং সংমিশ্রণের ধারণা আরবী 'বাইনি' শব্দ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বাইনি শব্দের অর্থ 'মধ্যেও' হতে পারে (ইংরেজী এমঙ্গ), আবার 'মধ্যবর্তী'-ও হতে পারে (ইংরেজী বিটুইন)। দুটি দ্রব্য বা দুজন মানুষ একসঙ্গে আনা হল, এ অর্থেও অবশ্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আয়াতটির অর্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করতে হলে শরীরবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

হজম প্রক্রিয়ার জন্য দেহে যে নির্ধারিত এলাকা বা পথ আছে তার সর্বত্র ক্রিয়াশীল রাসায়নিক পরিবর্তন থেকেই দেহের সাধারণ পুষ্টি সাধনের সারবস্তু আসে। এ সারবস্তু নাড়ীর আভ্যন্তরিক বস্তু থেকেই আসে। রাসায়নিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার যথাযথ পর্যায়ে নাড়ীতে আসার পর বস্তুটি নাড়ীর দেয়ালের মধ্য দিয়ে সঞ্চালন প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত এলাকার দিকে চলে যায়। এ গমন বা প্রবাহ দুভাবে সাধিত হয়ে থাকে- সরাসরিভাবে 'লিমফ্যাটিক ভেসেল' নামে পরিচিত নাড়ীর মারফত, অথবা বৃহৎ সঞ্চালন পথে। তপরপর ঐ বস্তু কলিজায় উপনীত হয় এবং সেখানে রদবদল হওয়ার পর সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় গিয়ে শামিল হয়। এভাবে সবকিছুই রক্তপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

দুধের উপাদান স্তনগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। রক্ত প্রবাহের পথে হজম হওয়া খাদ্যের যে সারবস্তু সেখানে এসে পৌছায় তা থেকেই ঐ উপাদানগুলি পুষ্টি লাভ করে। সুতরাং রক্ত ঐ সারবস্তুর সংগ্রহকারী ও পরিচালক হিসেবে কাজ করে এবং ঐ বস্তুই দুধ উৎপাদক স্তনগ্রন্থির পুষ্টি সাধন করে থাকে। অবশ্য ঐ সারবস্তু দেহের অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধনও করে থাকে।

এখানে যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া সকল কিছু সচল করে তোলে তা হচ্ছে নাড়ীর দেয়াল স্তরে নাড়ীর আভ্যন্তরিক বস্তু ও রক্ত একত্রিত হওয়া। হজম প্রক্রিয়ার ব্যাপারে রাসায়নিক এবং শরীরতাত্বিক পরীক্ষার ফলে ঠিক এ ধারণাই আবিষ্কৃত হয়েছে। নবী মুহাম্মদের (সঃ) আমলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং অতি সম্প্রতি মানুষের বোধগম্য হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, দেহে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাপারটি অর্থাৎ রক্ত যে দেহে সর্বদা প্রবাহিত হয়ে থাকে, এ তথ্য আবিষ্কার করেন হার্ভে, কুরআন নাযিল হওয়ার প্রায় দশ শতাব্দী পরে।

সেহেতু আমি মনে করি যে, কুরআনে ঐ সকল তথ্য থাকার কোন মানবিক ব্যাখ্যা হতে পারে না।

মানুষের বংশবিস্তার

মানুষের প্রাচীনতম রচনায় যখনই বংশবিস্তারের বিষয় এসেছে তখনই সেখানে ভুল বিবরণ দেয়া হয়েছে। মধ্যযুগে এমন কি আরও সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়টি কিংবদন্তি ও কুসংস্কারে আবৃত ছিল। তাছাড়া অবশ্য কোন উপায়ও ছিল না; কারণ বংশবিস্তারের জটিল প্রক্রিয়া বুঝার জন্য মানুষকে প্রথমে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়েছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করতে হয়েছে এবং শরীরবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, প্রসূতিবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ববর্তী মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে হয়েছে।

কিন্তু কুরআনের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বংশবিস্তারের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, জন্মের বিভিন্ন স্তরের সঠিক বর্ণনা এবং কোথাও একটি মাত্রও ভুল বিবরণ নেই। সকল কিছু মানুষের বোধগম্য সরল ভাষায় সহজ ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ঠিক সেই প্রকারে বর্ণিত হয়েছে মানুষ যা বহুদিন পরে আবিষ্কার করেছে।

মানুষের বংশবিস্তারের বিষয়টি বিভিন্ন প্রসঙ্গে কয়েক ডজন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট স্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বুঝার জন্য আয়াতগুলি একত্র করা প্রয়োজন। এ গ্রন্থে আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়ের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি একত্র করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

কতিপয় মৌলিক ধারণা

বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে কতিপয় মৌলিক ধারণা স্মরণ করা প্রয়োজন। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং তার পরে বহু শতাব্দী যাবত এ সকল তথ্য মানুষের জানা ছিল না।

মানুষের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া অন্যান্য সকল স্তন্যপায়ী জীবের মত একই প্রকারের। ডিম্বাশয় থেকে বিচ্যুত হওয়া একটি ডিম্বের উর্বরতা লাভ করা থেকেই এ প্রক্রিয়ার শুরু হয়। নারীর মাসিক ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে জরায়ুতে এ উর্বরতা ঘটে থাকে এবং এ উর্বরতা ঘটায় পুরুষের শুক্র, কিম্বা আরও সঠিক ভাবে শুক্রকীট। একটি মাত্র শুক্রকীটই এ কাজের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং উর্বরতা সাধনের জন্য ক্ষুদ্রতম পরিমাণের শুক্র বা বীর্যই প্রয়োজন হয়ে থাকে; কেননা ঐ পরিমাণ বীর্যের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ শুক্রকীট থাকে। পুরুষের অন্ডকোষ শুক্র উৎপন্ন করে থাকে এবং মূত্রনালীর সঙ্গে সংযুক্ত কোষ ও নালীপথের পাশাপাশি অবস্থিত অন্যান্য গ্রন্থি থেকেও লালা উৎপন্ন হয়ে শুক্রের সঙ্গে মিলিত হয়।

উর্বর হওয়া ডিম্ব নারীর গর্ভের একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থিতি লাভ করে- জরায়ুর পথে গর্ভে অবতরণের পর ভ্রূণ গঠিত হয় এবং তা পেশী ও লালার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে। উর্বর হওয়া ডিম্ব যদি কখনও গর্ভের পরিবর্তে জরায়ুতে অবস্থান গ্রহণ করে তাহলে গর্ভধারণ বাধাগ্রস্থ হয়।

ভ্রূণটি যখন খালি চোখে দেখার মত হয় তখন তা একটি ক্ষুদ্র মাংসপিন্ডের মত দেখায়, এবং তার কেন্দ্রস্থলে মানুষের আকৃতি প্রথমে দৃশ্যমান হয় না। ভ্রূণ ক্রমে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করে বড় হয় তা এখন সর্বজন বিদিত। এ সকল পর্যায়ে হাড়, পেশী, স্নায়ু, রক্তপ্রবাহ, নাড়িভূড়ি প্রভৃতি গঠিত হয়।

এ সকল আধুনিক প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সঙ্গে এখন আমরা মানুষের বংশবিস্তার বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা মিলিয়ে দেখব।

কুরআনে মানুষের বংশ বিস্তার

বংশবিস্তার সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করা খুব সহজ কাজ নয়। প্রথম অসুবিধে হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ের বর্ণনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এ অসুবিধের কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। কিন্তু আও বড় অসুবিধে হচ্ছে শব্দার্থের সমস্যা এবং এ সমস্যার ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারেন।

আসলে বর্তমানে কুরআনের এমন অনেক তরজমা ও ভাষ্য চালু আছে যা এ বিষয়ে একজন বিজ্ঞানীকে অতি সহজেই সম্পূর্ণ ভুল ধারণা দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অধিকাংশ তরজমায় মানুষ "জমাট রক্ত" বা "আঠালো রক্ত" দ্বারা গঠিত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন বিজ্ঞানীর কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞানের পটভূমিকা না থাকার কারণে বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদগণ যে কেন এ ধরনের ভুল করেছেন, তা আমরা মাতৃগর্ভে ডিম্বের অবস্থান গ্রহণ বিষয়ক অনুচ্ছেদের আলোচনায় দেখতে পাব।

বংশবিস্তার বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য অনুধাবনের জন্য ভাষা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকা যে কতখানি অপরিহার্য এ মন্তব্য থেকেই তা অনুমান করা যেতে পারে।

মাতৃগর্ভে পূর্ণতা পাওয়ার আগে একটি ভ্রূণ ক্রমবিকাশের যে সকল পর্যায় অতিক্রম করে থাকে কুরআনে তা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ৮২ (ইনফিতার) আয়াত ৬-৮ঃ "হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসামঞ্জস্য করিয়াছেন, তিনি তোমাকে তাঁহার ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করিয়াছেন।"

সূরা ৭১ (নুহ) আয়াত ১৪ঃ "তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে।"

এ সাধারণ বর্ণনার পাশাপাশি কুরআনের বংশ বিস্তার প্রসঙ্গে যে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা এভাবে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারেঃ

(১) স্বল্পতম পরিমাণ শুক্রেই উর্বরতা সাধিত হতে পারে।

(২) শুক্রের উপাদান।

(৩) উর্বর ডিম্বের অবস্থান গ্রহণ।

(৪) ভ্রূণের ক্রমবিকাশ।

এ বিষয়গুলি এখন আমরা পরপর আলোচনা করব।

(১) স্বল্পতম পরিমাণ শুক্রেই উর্বরতা সাধিত হতে পারে

কুরআনে নিম্নলিখিত প্রকাশভঙ্গিতে এ ধারণাটি এগার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা ১৬ (নাহল) আয়াত ৪ঃ "তিনি সামান্য পরিমাণ (শুক্র) হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।"

যথাযথ কোন সঠিক শব্দ না থাকায় এখানে আরবী "নুতফা" শব্দটি "সামান্য পরিমাণ (শুক্র)" বলে তরজমা করা হয়েছে। এ শব্দটি যে ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে তার অর্থ হচ্ছে "ফোঁটা ফোঁটা পড়া, টিপ টিপ করে পড়া" এবং বালতি খালি করার পর তলায় যা অবশিষ্ট থাকে সেই তলানি বুঝানোর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং এ শব্দ দ্বারা তরল পদার্থের সামান্য পরিমাণ বুঝায়। তরল পদার্থ বলতে এখানে শুক্রই বুঝানো হয়েছে, কারণ অপর একটি আয়াতে শব্দটি শুক্রের সঙ্গ সম্পর্কিত করা হয়েছে।

সূরা ৭৫ (কিয়ামা) আয়াত ৩৭ঃ "সে (মানুষ) কি স্খলিত শুক্রবিন্দু মাত্র ছিল না?"

এখানে আরবী "মণি" শব্দে শুক্র বুঝানো হয়েছে।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঐ 'বিন্দু মাত্র' একটি মজবুত নিরাপদ আধারে (আরবী 'কারার') স্থাপন করা হয় এবং আধারটি স্পষ্টতই যৌনাঙ্গ।

সূরা ২৩ (মুমিনুন) আয়াত ১৩ঃ "অতঃপর আমি উহাকে (মানুষকে) একটি (শুক্র) **বিন্দুমাত্র** রূপে স্থাপন করি এক মজবুত নিরাপদ আধারে।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মজবুত নিরাপদ আধার-এর বিশেষণ হিসেবে আরবীতে যে 'মাকিন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার তরজমা করা প্রায় অসম্ভব। এ শব্দে মজবুত, নিরাপদ ও সম্মানিত স্থানের ধারণা প্রকাশ পায়। যেভাবেই বলা হোক না কেন শব্দটি দ্বারা সেই নির্দিষ্ট স্থান বুঝায়, মাতৃগর্ভের যে স্থানে **মানুষ বেড়ে উঠে**। উর্বরতা প্রক্রিয়ার জন্য যে মাত্র বিন্দু পরিমাণ শুক্রের প্রয়োজন হয়, এ বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন; কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য থেকে এ বিষয়ে আমরা এখন ঠিক এ কথাই জানতে পেরেছি।

(২) শুক্রের উপাদান

কুরআনে উর্বরতা সাধনকারী তরল পদার্থের বর্ণনা যে ভাষায় দেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট কৌতুহল উদ্দীপক।

(ক) 'শুক্র'-সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণিত- সূরা কিয়াম, ৩৭ আয়াত।

(খ) 'স্খলিত তরল পদার্থ থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে'- সূরা তারিক, ৬ আয়াত।

(গ) 'ঘৃণিত তরল পদার্থ'-সূরা সিজদা, ৮ আয়াত এবং সূরা মুরসালাত, ২০ আয়াত।

'ঘৃণিত' (আরবী 'মাহিন') শব্দটির প্রয়োগ তরল পদার্থটি প্রকৃতির কারণে বোধহয় করা হয়নি। পদার্থটি যেহেতু পেশাবের পথ দিয়েই প্রবাহিত হয় সেহেতু ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ঘ) 'মিলিত' বা 'মিশ্রিত' তরল পদার্থ (আরবী 'আমসাজ')-"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি একবিন্দু মিশ্রিত তরল পদার্থ হইতে" -সূরা দাহার, ২ আয়াত।

অধ্যাপক হামিদুল্লার মত অনেক ভাষ্যকারই এ 'মিলিত' অর্থে নারী ও পুরুষের তরল পদার্থের মিশ্রণ বুঝিয়েছেন। পূর্ববর্তী অনেক ভাষ্যকারও ঐ কথাই বলেছেন; কারণ উর্বরতা সাধনের শরীরবিদ্যাগত ব্যুৎপত্তি এবং বিশেষত নারীর ক্ষেত্রে জীববিদ্যাগত অবস্থা বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, মিশ্রণ বলতে নর-নারীর তরল পদার্থের মিশ্রণই বুঝায়।

কায়রোর সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক এফেয়ার্স সম্পাদিত "মুনতাখাব" গ্রন্থের ভাষ্যকারের মত আধুনিক গ্রন্থকারগণ অবশ্য এ ধারণা সংশোধন করেছেন এবং বলেছেন যে 'শুক্র বিন্দুটি' বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। মুনতাখাবের ভাষ্যকার কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেননি, কিন্তু যতটুকু বলেছেন আমার মতে তা যথেষ্ট সঙ্গত ও বস্তুনিষ্ঠ।

শুক্রের উপাদান কি কি?

যে তরল পদার্থ শুক্র নামে অভিহিত হয়ে থাকে তা নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত রস দ্বারা গঠিত হয়।

(ক) অন্ডকোষঃ এ স্থান থেকে নিঃসৃত রসে শুক্রকীট আসলে লম্বাটে কোষ বিশেষ এবং লেজের মত তার একটি বর্ধিত অংশ আছে, এবং তা এক প্রকার হালকা রসে নিমজ্জিত থাকে।

(খ) শুক্রকোষঃ পুরুষাঙ্গের নিকটে অবস্থিত এ কোষে শুক্র জমা থাকে। এ পাত্র বা আধারে একটি নিজস্ব রসও নিঃসৃত হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে উর্বরা সাধনের মত কোন উপাদান থাকে না।

(গ) লিঙ্গগ্রন্থিঃ এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস শুক্রকে ঘনত্ব এবং গন্ধ দিয়ে থাকে।

(ঘ) মূত্রনালীর সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থিঃ এখানে যে তিনটি গ্রন্থি আছে তা তিনজন বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে কুপারের গ্রন্থি, মেরির গ্রন্থি এবং লিটারের গন্থি নামে পরিচিত। প্রথম দুটি গ্রন্থি থেকে আঠালো রস এবং তৃতীয় গ্রন্থি থেকে কাদা বা গ্রিজ জাতীয় রস নিঃসৃত হয়ে থাকে।

কুরআনে যে 'মিশ্রিত তরল পদার্থ'- উল্লেখ আছে, এগুলি হচ্ছে তার উৎস ও উপাদান।

এ বিষয়ে বলার মত কথা অবশ্যই আরও আছে। কুরআনে যেখানে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত উর্বরা সাধনকারী তরল পদার্থের কথা বলা হয়েছে, সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঐ পদার্থ থেকে গৃহিত উপাদান দিয়ে মানুষের বংশ রক্ষা করা হবে।

সূরা সিজদার ৮ আয়াতে এ অর্থই পাওয়া যায়ঃ "অতঃপর (আল্লাহ) তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে।"

আরবী 'সুলালা' শব্দের তরজমা করা হয়েছে 'নির্যাস' বলে। এ শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে 'কোন বস্তু থেকে গৃহিত, অপর কোন বস্তু থেকে আগত কোন বস্তুর উত্তম অংশ।' যে ভাবেই বলা হোক না কেন এ শব্দে একটি সম্পূর্ণ বস্তুর অংশ বিশেষ বুঝা যায়।

যে কোষ দ্বারা ডিম্ব উর্বরা হয় অর্থাৎ বংশবিস্তার ঘটে তা লম্বা আকারের। তার আয়তন এক মিলিমিটারের দশ হাজার ভাগের একভাগ। স্বাভাবিক যৌনমিলনে একজন পুরুষ কয়েক কোটি কোষ উৎপন্ন করে থাকে এবং তার মধ্যে সাধারণত একটি ডিম্বকোষে প্রবেশ করে থাকে। অবশিষ্টগুলি পথিমধ্যে থেকে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে একজন পুরুষ একবারের মিলনে কয়েক ঘন-সেন্টিমিটার শুক্র স্খলন করে থাকে এবং এক ঘন-সেন্টিমিটার শুক্রে ২ কোটি ৫০ লক্ষ শুক্রকীট থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিবিধ উপাদানে অতিশয় জটিল প্রক্রিয়ায় গঠিত একটি তরল পদার্থের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দ্বারাই বংশবিস্তারকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এ অবস্থায় আধুনিক গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংগে কুরআনের বর্ণনার পরিপূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাকা না হয়ে পারি না।

(৩) উর্বর ডিম্বের নারী যৌনাঙ্গে অবস্থান গ্রহণ

ডিম্ব উর্বর হওয়ার পর তা জরায়ুতে নেমে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এ বিষয়টিই কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

সূরা ২২ (হজ্জ) আয়াত ৫ঃ "আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখিয়া দিই।"

ডিম্ব লম্বাকৃতি ধারণ করে মাটিতে গাছের শিকড়ের মত জরায়ুর (মাতৃগর্ভের) মাংসল অংশে সংলগ্ন হয়ে সেখান থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। ডিম্বের ঐ আকৃতির ফলে আক্ষরিক অর্থেই তা জরায়ুতে লেগে থাকে। এ তথ্য অতি সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত

হয়েছে।

এ লেগে থাকার ব্যাপারটি কুরআনের পাঁচটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ৯৬ (আলাক) আয়াত ১-২ঃ "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে যাহা লাগিয়া থাকে তাহা হইতে।"

'যাহা লাগিয়া থাকে' হচ্ছে আরবী 'আলাক' শব্দের তরজমা। এটাই শব্দটির মূল অর্থ। তাৎপর্য হিসেবে আর একটি অর্থ করা হয় 'জমাট রক্ত' বা 'রক্তপিন্ড' এবং অনেক তরজমায় এ অর্থ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ ব্যবহার ভুল এবং এ সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। কারণ মানুষের জন্ম প্রক্রিয়ায় কখনই 'জমাট রক্ত' বা 'রক্তপিন্ড' স্তর আসে না। অপর একটি তরজমার ক্ষেত্রেও এ একই কথা প্রযোজ্য। এ তরজমা হচ্ছে 'আঠা বা সংযুক্তি' এবং এ তরজমাও যথাযথ নয়। মূল অর্থ 'যাহা লাগিয়া থাকে' আধুনিক পরীক্ষিত তথ্যের সঙ্গে যথাযথ ভাবে সংগতিপূর্ণ।

ঐ ধারণা আরও চারটি আয়াতে এসেছে এবং সেখানে শুক্রবিন্দুর পূর্ণ অবয়ব পর্যন্ত ক্রমবিকাশ বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ২২ (হজ্জ) আয়াত ৫ঃ "আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি... যাহা লাগিয়া থাকে তাহা হইতে।"

সূরা ২৩ (মুমিননু) আয়াত ১৪ঃ "আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি এমন বস্তুতে যাহা লাগিয়া থাকে।"

সূরা ৪০ (মুমিন) আয়াত ৬৭ঃ "তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন... শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর যাহা লাগিয়া থাকে তাহা হইতে।"

সূরা ৭৪ (কিয়ামা) আয়াত ৩৭-৩৮ঃ "সে (মানুষ) কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে কি এমন বস্তুতে পরিণত হয় নাই যাহা লাগিয়া থাকে? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে কি আকৃতি দান করেন নাই ও সুঠাম করেন নাই?"

যে অঙ্গে গর্ভধারণ করা হয় তা বুঝানোর জন্য কুরআনে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আরবী ভাষায় জরায়ু বুঝানোর জন্য এখনও সেই শব্দই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন কোন সুরায় তাকে আবার 'নিরাপদ আধার' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। অপর একটি সূরায় (সূরা ৬ আয়াত ৯৮) একটি ভ্রমনস্থলের উল্লেখ আছে। 'নিরাপদ আধার' যে পরিবেশে উল্লেখ করা হয়েছে, এ উল্লেখও ঠিক সেই পরিবেশেই করা হয়েছে এবং মনে হয় মাতৃগর্ভই বুঝানো হয়েছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এ আয়াতের এ অর্থই হয় বলে মনে করি, কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে এখানে আমি কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি না।

অপর একটি আয়াতের খুবই সতর্ক ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সূরা ৩৯ (যুমার) আয়াত ৬ঃ "তিনি তোমাদিগকে তোমাদিগের মাতৃগভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

অন্ধকার হচ্ছে আরবী "জুলুমাত' শব্দের তরজমা। শিশুর দেহ গঠিত হওয়ার সময় যে তিনটি পর্দা তাকে রক্ষা করে থাকে, এখানে সেই তিনটি পর্দার কথাই বলা হয়েছে বলে কুরআনের আধুনিক ভাষ্যকারগণ মনে করেন। পর্দা তিনটি হচ্ছে পেটের দেয়াল, জরায়ু, এবং ভ্রূণের চারদিকের তরল পদার্থ।

আমার মূল আলোচনার জন্য এ আয়াতটি উধৃত করার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু প্রসঙ্গটির সম্পূর্ণতার স্বার্থে উধৃত করলাম। এখানে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে দেহ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিরোধিতা করার কোন সঙ্গত যুক্তি আমার কাছে নেই, কিন্তু কুরআনে কি ঠিক ঐ অর্থেই ঐ কথা বলা হয়েছে?

(৪) জরায়ুতে ভ্রূণের ক্রমবিকাশ

ভ্রূণের ক্রমবিকাশের কতিপয় পর্যায় সম্পর্কে কুরআনে যে বর্ণনা আছে তা আমাদের আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এবং কুরআনে এমন একটি মাত্র বর্ণনাও নেই যা আধুনিক বিজ্ঞানের সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে।

'যা লেগে থাকে' সে বিষয়ের বর্ণনার পরে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে, ভ্রূণ এক পর্যায়ে 'চর্বিত মাংস'-এর আকার ধারণ করে থাকে। তারপর হাড় সৃষ্টি হয় এবং তা মাংসে আবৃত হয়ে থাকে।

সূরা ২৩ (মুমিনুন) আয়াত ১৪ঃ "যাহা লাগিয়া থাকে তাহাকে আমি পরিণত করি চর্বিত মাংসপিন্ডে, পরে তাহাকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে, যাহা পরে আবৃত করি মাংস দ্বারা।"

আরবী 'মুদগা' শব্দের তরজমা চর্বিত মাংস, এবং 'লাহম' শব্দের তরজমা সাধারণ বা অচর্বিত মাংস। এ পার্থক্যটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শুরুতে ভ্রূণ একটি ক্ষুদ্র মাংসপিন্ডের আকারে থাকে। ক্রমবিকাশের একটি পর্যায়ে তা খালি চোখে চর্বিত (কিমা করা) মাংসের মত দেখায়। এ মাংসের মধ্যেই হাড়ের কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এ হাড় পরে পেশী দ্বারা আবৃত হয় এবং এ ক্ষেত্রেই 'লাহম' শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ভ্রূণের ক্রমবিকাশের সময় তার কোন কোন অংগ যে সম্পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং কোন কোন অংগ যে পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট থাকে তা এখন মানুষ জানতে পেরেছে। সূরা হজ্জে যে 'মুখাল্লাক' (পূর্ণ আকৃতি দান) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ নিশ্চয়ই এ রকম।

সূরা ২২ (হজ্জ) আয়াত ৫ঃ "শুক্রকে আমরা এমন কিছুতে পরিণত করি যাহা লাগিয়া থাকে ...উহাদের পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ডে পরিণত করি।"

কুরআনে ইন্দ্রিয় এবং উদর মধ্যস্থ অন্ত্রের আবির্ভাবেরও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরা ৩২ (সিজদা) আয়াত ৯ঃ "(তিনি) তোমাদিগকে দিয়েছেন চক্ষু, কর্ণ ও অন্ত্র।"

যৌনাঙ্গের গঠনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ৫৩ (নাজম) আয়াত ৪৫-৪৬ঃ "তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী, স্খলিত শুক্রবিন্দু হইতে।"

সূরা (ফাতির) আয়াত ১১ঃ "আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে, অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল (পুরুষ ও নারী)।"

সূরা ৫ (কিয়াম) আয়াত ৩৯ঃ "অতঃপর তিনি কি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন নাই যুগল নর ও নারী?"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনের সকল বর্ণনা অবশ্যই আধুনিক কালের সাব্যস্ত ও স্বীকৃত তথ্য ও ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। তাহলে দেখা যাবে যে উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রয়েছে। একই সঙ্গে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মানুষের মধ্যে যে সকল ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল তার সঙ্গেও কুরআনের বর্ণনা মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ সকল ধ্যান-ধারণা কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে কত সামঞ্জস্যহীন ও বিপরীতমুখী ছিল। আমরা আজ যেভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারছি, তৎকালীন মানুষের পক্ষে তা অতি অবশ্যই সম্ভব ছিল না। কারণ আজ আমরা আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যে সাহায্য পাচ্ছি তৎকালীন মানুষের পক্ষে তা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। প্রকৃত পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতেই মানুষ এ সকল বিষয়ে কিছুটা পরিষ্কার ধারণা পেতে শুরু করে।

সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী ভিত্তিহীন প্রবাদ, কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে নানাবিধ ধারণা ও মতবাদ গড়ে উঠেছিল এবং তা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবত বহাল ছিল। তারপর হার্ভে যখন বলেন (১৬৫১) যে, "সকল জীবনই প্রথমত ডিম থেকে আসে" তখন ভ্রূণবিদ্যার ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় বিজ্ঞানের অগ্রগতি তরান্বিত হলেও মানুষ তখনও ডিম ও শুক্রকীটের পৃথক পৃথক ভূমিকা নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত ছিল। বিখ্যাত প্রকৃতিবিশারদ বাফোন ডিম্ব-মতবাদের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু বনেট বীজের 'একত্রে গ্রথিত' হওয়ার মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ মতবাদে বলা হত যে, মানবজাতির মাতা ইভের (হাওয়া) ডিম্বকোষে সকল মানুষের বীজ একটির মধ্যে অপরটির এভাবে একত্রে গ্রথিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ মতবাদই আনুকূল্য লাভ করেছিল।

আমাদের আমলের এক হাজার বছরেরও বেশী সময় আগে যখন এ সকল উদ্ভট মতবাদ বেশ জোরেশারেই চালু ছিল তখনই মানুষ কুরআন সম্পর্কে অবহিত হয়। এ গ্রন্থে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য সহজ ভাষায় বর্ণিত আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের কয়েক শত বছর লেগে গিয়েছে।

কুরআন ও যৌনশিক্ষা

বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক যুগেই সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে বহুবিধ আবিষ্কার হয়েছে। যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে শিশুদের সামনে যে জ্ঞান ভান্ডার খুলে দেয়া হয়েছে তা আধুনিক বিশ্বের একটি বিরাট সাফল্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অতীতে এ বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্টতা আরোপ করা হত এবং অনেকে বলেন এজন্য ধর্মই দায়ী। অবশ্য কোন ধর্ম দায়ী তা তারা নাম ধরে বলেন না।

ওপরে যে সকল তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, চৌদ্দশত বছর আগেই মানুষের বংশবিস্তার বিষয়ক তত্বগত বিষয়গুলি মানুষের নজরে আনা হয়েছে। অধিকতর ব্যাখ্যার জন্য দেহের গঠন ও জীববিদ্যা তখন না থাকার কারণে যতখানি সম্ভব ততটুকু তথ্যই দেয়া হয়েছে। এ প্রসংগে আরও মনে রাখা দরকার যে, তৎকালীন শ্রোতাদের বুঝতে পারার ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বিষয়টি সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে বাস্তব অবস্থার বিষয়টি আদৌ উপেক্ষা করা হয়নি। মানুষের বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন অবস্থা এবং সে অবস্থায় কেমন আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে কুরআনে বহু নির্দেশ আছে। যৌনবিজ্ঞানের কথাও এতে বাদ দেয়া হয়নি।

কুরআনের দুটি আয়াতে যৌনসংগমের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আয়াতের ভাষায় সুনির্দিষ্টতা ও শালীনতা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আয়াত দুটির বিভিন্ন তরজমা ও ব্যাখ্যায় যে পার্থক্য দেখা যায় তাতে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি এবং অনেক তরজমা পড়ে দেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর অব মেডিসিন ডক্টর এ কে গিরডের তরজমাই আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে, এজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর তরজমা নিম্নরূপঃ

সূরা ৮৬ (তারিক) আয়াত ৬-৭ঃ "(মানুষকে) সৃষ্টি করা হইয়াছে স্খলিত তরল পদার্থ হইতে। উহা নির্গত হয় পুরুষের যৌন অঞ্চল ও নারীর যৌন অঞ্চলের সম্মিলনের ফলে।"

কুরআনে 'সুলব' (একবচন) শব্দ দ্বারা পুরুষের যৌন অঞ্চল এবং 'তারাইব' (বহুবচন) শব্দ দ্বারা নারীর যৌন অঞ্চল নির্দেশ করা হয়েছে। এ তরজমাই আমার কাছে সবচেয়ে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। ইংরাজী ও ফরাসী অনুবাদকগণ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তরজমা করেছেন- "(মানুষ) সৃষ্টি করা হইয়াছে স্খলিত তরল পদার্থ হইতে, যাহা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।" এটা তরজমার চেয়ে ব্যাখ্যা বলেই বেশী মনে হয়। কিন্তু তথাপি বিষয়টি বোধগম্য নয়।

স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের আচরণ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্ত্রীর মাসিক হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তাঁর রসূলকে হুকুম দিয়েছেনঃ

সূরা ২ (বাকারা) আয়াত ২২২-২২৩ঃ "লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, উহা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করিবে না। সুতরাং তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন। আল্লাহ তওবাকারীদের এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদিগকে পছন্দ করেন।"

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমাদের শস্যক্ষেত্রে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু (সৎকর্ম) করিও।"

আয়াতের প্রথম অংশের অর্থ খুবই পরিষ্কার। এখানে মাসিক হওয়ার সময় স্ত্রী সঙ্গম করতে পুরুষকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে জমি চাষ করার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে, বীজ বপনের আগে কৃষককে যা সম্পন্ন করতে হয়। বীজ থেকে অংকুরোদগম হয়, নতুন চারা জন্ম নেয়। এ উপমা দ্বারা যৌন সঙ্গমের উদ্দেশ্য অর্থাৎ বংশবিস্তারের কথা মনে রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর ব্লাশেয়ার আয়াতের শেষ অংশের যে তরজমা করেছেন তাতে সঙ্গম-পূর্ব প্রাথমিক প্রস্তুতির প্রতি ইশারা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

এ আয়াতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সাধারণ প্রকৃতির। এ প্রসঙ্গে জন্মনিরোধের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ আয়াতে কিম্বা অন্যত্র কোথাও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

গর্ভপাত ঘটানোর বিষয়েও কোন উল্লেখ কোথাও নেই। ওপরে যে সকল আয়াত উধৃত করা হয়েছে তা অনুধাবন করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 'যাহা লাগিয়া থাকে' তার ক্রমবিকাশের ফলেই ভ্রূণ থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়। সুতরাং ব্যক্তিক মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মানের যে কথা কুরআনে বারবার বলা হয়েছে তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই গর্ভপাতের উপরে নিষেধাজ্ঞা ও নিন্দাবাদ এসে যায়। সকল তৌহীদবাদী ধর্মেই এখন এ মতবাদ পোষণ করা হয়ে থাকে।

রোযার সময় রমযান মাসে রাতের বেলায় যৌনসঙ্গমের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সূরা ২ (বাকারা) আয়াত ১৮৭ঃ "সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। ... সুতরাং তোমরা তাহাদের সহিত সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যাহা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কামনা কর।"

কিন্তু হজ্জের সময় মক্কায় স্ত্রীসঙ্গম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা ২ (বাকারা) আয়াত

১৯৭ঃ "যে কেহ এ মাসগুলিকে হজ্জ করা তাহার কর্তব্য মনে করে তাহার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ বিধেয় নহে।"

এ নিষেধাজ্ঞা শিকার করা এবং কলহ-বিবাদের ওপরেও আরোপ করা হয়েছে। তালাকের প্রসঙ্গে কুরআনে রজঃস্রাবের কথা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা ৬৫ (তালাক) আয়াত ৪ঃ "তোমাদিগের যেসব স্ত্রীর ঋতুমতি হইবার আশা নাই, তাহাদিগের ইদ্দতকাল সম্পর্কে তোমাদিগের সন্দেহ হইলে জানিয়া রাখ তাহাদিগের ইদ্দতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদিগেরও ইদ্দতকাল অনুরূপ এবং গর্ভবতী নারীদিগের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"

তালাকের ঘোষণা থেকে তা বলবৎ হওয়ার সময় পর্যন্ত ইদ্দতকাল বা অপেক্ষা করার সময় বুঝায়। 'যাদের ঋতুমতি হওয়ার আশা নাই' বলতে যে সকল নারীর ঋতু স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের কথা বুঝানো হয়েছে। তথাপি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। তারপর তারা পুনরায় বিয়ে করতে পারে।

যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদেরও তিনমাস অপেক্ষা করতে এবং গর্ভবতীদের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এ বিধানগুলি আধুনিক শরীরবিদ্যার নিয়ম-নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। নারীর বৈধব্য বিষয়েও কুরআনে অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত বিধান আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনে বংশবিস্তার বিষয়ে যে সকল তত্ত্বগত বিবরণ এবং যৌন জীবন বিষয়ে যে সকল বাস্তব নির্দেশ উপদেশ আছে, তা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন তথ্যের সঙ্গেই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনাঃ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বাইবেলে বর্ণিত অনেকগুলি বিষয় কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। এরূপ সাধারণ বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ নবীদের কাহিনী- নূহ, ইব্রাহীম, ইউসুফ, ইলিয়াস, ইউনুস, আইউব ও মূসার কাহিনী এবং ইসরায়েলী বাদশাহদের কাহিনী। সল, দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনী। এছাড়া পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর সৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, বন্যা ও দেশত্যাগের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাও রয়েছে এবং এ সকল ঘটনার ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। অবশেষে নিউ টেস্টামেন্ট মুতাবিক যিশু ও তার মাতা মেরির ঘটনাবলীও রয়েছে।

আসমানী গ্রন্থ বহির্ভূত উৎস থেকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি সেই আধুনিক জ্ঞানের আলোকে আমরা যদি ঐ দুখানি আসমানী গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়বস্তু বিবেচনা করি তাহলে আমাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়? আমরা কি দেখতে পাই?

সাধারণ বিষয়ঃ কুরআন, গসপেল ও আধুনিক জ্ঞান

কুরআন ও গসপেলের সাধারণ বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ গ্রন্থের গোড়ার দিকে গসপেলের যে সকল বিষয়বস্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা হয়েছে তার একটিও কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি।

কুরআনে যিশুর কথা অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে- মেরির নিকট তাঁর পুত্রের অলৌকিক জন্মের সংবাদ জ্ঞাপন, মেরি কর্তৃক ঐ সংবাদ প্রচার, পয়গম্বর হিসাবে যিশুর উচ্চ মর্যাদা, ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা, তাঁর পাওয়া অহি মানুষের নিকট প্রচার করা, ঐ অহি দ্বারা তৌরাতের সমর্থন ও সংশোধন, তাঁর ধর্মপ্রচার, তাঁর সাহাবী খলিফা ও অলৌকিক কার্য, তাঁর আল্লাহর নিকটে উত্থান, রোজ কিয়ামতে তাঁর ভূমিকা প্রভৃতি।

কুরআনে সূরা ইমরান ও সূরা মরিয়মে যিশুর পরিবার সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা আছে। সেখানে তাঁর মাতা মরিয়মের জন্ম, যৌবনকাল ও অলৌকিক মাতৃত্বের বর্ণনা আছে। যিশুকে সর্বদা 'মরিয়মের পুত্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর বংশ-পরিচয় কেবলমাত্র মাতৃকুল থেকেই দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ জৈবিক অর্থে তাঁর কোন পিতা ছিলেন না। আমরা আগেই দেখেছি এ ব্যাপারে কুরআনের সঙ্গে গসপেলের মথি ও লুকের বর্ণনার পার্থক্য আছে; কারণ তাঁরা যিশুর পিতৃকুলের পরিচয় দিয়েছেন এবং দুজন দুরকম বিবরণ দিয়েছেন।

কুরআনে যিশুকে তাঁর মাতৃকুলের শেজরানামায় নূহ, ইব্রাহীম ও মরিয়মের পিতার (কুরআনে নাম আছে ইমরান) বংশধারায় দেখানো হয়েছে।

সূরা ৩ (ইমরান) আয়াত ৩৩-৩৪ঃ "আদম, নূহ ও ইব্রাহীমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে আল্লাহ সারা জাহানের উপর মনোনীত করিয়াছেন; তাহারা পরস্পরের আওলাদ..."

সুতরাং যিশু তাঁর মাতা মরিয়মের দিক থেকে এবং মরিয়মের পিতা ইমরানের দিক থেকে নূহ ও ইব্রাহীমের আওলাদ। গসপেলে যিশুর পূর্ব পুরুষদের নামে যে ভুল আছে কুরআনে তা নেই। একইভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টে ইব্রাহীমের পূর্ব পুরুষদের বর্ণনার যে আজগুবি কথাবার্তা আছে কুরআনে তাও নেই। এ গ্রন্থের গোড়ার দিকে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তথাপি বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনে এ বিষয়টি আর একবার খেয়াল করা দরকার। তদুপরি মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই কুরআন লিখেছেন এবং এজন্য প্রধানত বাইবেল থেকে নকল করেছেন বলে যে ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে, তার মুকাবিলায় এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন। মুহাম্মদ (সঃ) যদি সত্য সত্যই নিজে কুরআন লিখে থাকেন এবং বাইবেল থেকে নকল করে থাকেন, তাহলে তিনি যিশুর পূর্ব পুরুষ সম্পর্কিত বাইবেলের বর্ণনাটি নকল করলেন না কেন? তার বদলে তিনি এমন

একটি বর্ণনা কিভাবে বসিয়ে দিলেন যা আধুনিক জ্ঞানের আলোকে সকল বিতর্কের উর্ধে?

প্রসঙ্গত লক্ষ্যণীয় যে, এ বিষয়ে গসপেল ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা দুটি পরস্পর বিরোধী এবং সেই কারণে তার একটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

সাধারণ বিষয়ঃ কুরআন ওল্ড টেস্টামেন্ট ও আধুনিক জ্ঞান

কুরআনের সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের কতিপয় সাধারণ বিষয় সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পর্কে আলোচনার সময় পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে আলোকপাত করে দেখানো হয়েছে যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, অথচ কুরআনের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। বিষয়টি যেহেতু আগেই একবার পরীক্ষিত এবং আলোচিত হয়েছে সেহেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নেই।

ইসরায়েলের বাদশাহদের সম্পর্কে কুরআন ও ওল্ড টেস্টামেন্ট উভয় গ্রন্থেই বর্ণনা আছে। কিন্তু এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও বিবরণ এতই স্বল্প যে তার ভিত্তিতে ঐ সকল বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়। আধুনিক জ্ঞান এ বিষয়ে সত্যই অপর্যাপ্ত।

পয়গম্বরদের ব্যাপারেও প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে। উভয় গ্রন্থে এ বিষয়ে বিবরণ আছে। কিন্তু বর্ণিত ঘটনাবলীর স্থান, কাল ও পাত্রজনিত তথ্যের কতখানি আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় হওয়ার পরই বিষয়টি আধুনিক জ্ঞানের আলোকে বিবেচনা করা সম্ভব হতে পারে।

তবে উভয় গ্রন্থেই এমন দুটি বিষয় আছে যা আধুনিক জ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব এবং প্রয়োজন। বিষয় দুটি হচ্ছে নূহের আমলের বন্যা এবং মূসার আমলের দেশত্যাগ।

বন্যার ঘটনাটি পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব এ কারণে যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঐ বন্যা এমন কোন চিহ্ন রেখে যায়নি যা ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনার পোষকতায় উল্লেখ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে আধুনিক জ্ঞানে এমন কোন তথ্য নেই যার ভিত্তিতে কুরআনের বর্ণনার সমালোচনা করা যেতে পারে।

আর দেশত্যাগের ঘটনাটি পরীক্ষা করা সম্ভব এ কারণে যে, এ বিষয়ে উভয় গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে সাধারণভাবে তা স্পষ্টতই একে অপরের পরিপূরক এবং আধুনিক জ্ঞানে যে তথ্য পাওয়া যায় তা উভয়েরই পরিপোষক।

নূহের আমলের প্লাবনঃ ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা

এ গ্রন্থের গোড়ার দিকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্লাবনের ঘটনাটি আমরা বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং স্মরণ করা যেতে পারে যে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি- প্লাবন সম্পর্কে একটি নয়, দুটি বিবরণ আছে এবং তা দুটি পৃথক আমলে লেখা হয়েছে।

প্রথমটি ইয়াহভিষ্ট বর্ণনা এবং তা খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর। দ্বিতীয়টি স্যাকারডোটাল বর্ণনা এবং তা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর। সমসাময়িক পুরোহিতগণ লিখেছিলেন বলে এ বর্ণনাটি স্যাকারডোটাল নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

এ দুটি বর্ণনাকে পৃথক পৃথকভাবে সনাক্ত করা যায় না। একটির সঙ্গে অপরটি মিশ্রিত হয়ে আছে। একটির কোন কোন অনুচ্ছেদ অপরটিতেও পাওয়া যায়। জেরুসালেমের বাইবেল স্কুলের অধ্যাপক ফাদার দ্য ফক্স তাঁর জেনেসিসের তরজমার ভাষ্যে একটি বর্ণনার অনুচ্ছেদ যে কিভাবে অপর বর্ণনায় হুবহু বসিয়ে দেয়া হয়েছে তা উদাহরণসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনায় মোট দশটি ইয়াহভিষ্ট অনুচ্ছেদ আছে। শুরুতে ও শেষে ইয়াহভিষ্ট অনুচ্ছেদ আছে এবং মাঝখানে দুটি ইয়াহভিষ্ট অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি করে স্যাকারডোটাল অনুচ্ছেদ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে মোট নয়টি স্যাকারডোটাল অনুচ্ছেদ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। দুটি বর্ণনা যেহেতু ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী, সেহেতু ঘটনার ধারাবাহিকতার দিকে নজর রেখে না পড়লে কোন বর্ণনাই যুক্তিসঙ্গত বা অর্থবোধক বলে মনে হবে না। ফাদার দ্য ফক্স নিজেই বলেছেন- "দুটি বর্ণনায় বন্যা দুটি পৃথক প্রক্রিয়ায় ঘটেছে বলে দেখা যায়, স্থিতিকালও দু রকমের পাওয়া যায় এবং নূহ তাঁর কিশতিতে যে জীবজন্তু নিয়েছিলেন তার সংখ্যাও দু বর্ণনায় দু রকম আছে।"

আধুনিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্লাবন বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা নিম্নবর্ণিত কারণে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

(১) ওল্ড টেস্টামেন্টে প্লাবনটি বিশ্বব্যাপী হয়েছিল বলে বর্ণিত হয়েছে।

(২) ইয়াহভিষ্ট বর্ণনায় প্লাবনের কোন সময়কাল উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু স্যাকারডোটাল বর্ণনায় সময় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এমন সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে যখন ঐরূপ কোন বিপর্যয় ঘটা আদৌ সম্ভব ছিল না।

এ অভিমতের যুক্তিবাদ নিম্নরূপঃ

স্যাকারডোটাল বর্ণনায় সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, নূহের বয়স যখন ৬০০ বছর তখনই প্লাবন হয়েছিল। জেনেসিসের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত শেজরানামা (স্যাকারডোটাল পাঠ থেকে গৃহীত এবং এ গ্রন্থের প্রথম দিকে উধৃত থেকে) দেখা যায় যে, আদমের ১,০৫৬ বছর পরে নূহের জন্ম হয়েছিল। সুতরাং আদম সৃষ্টি হওয়ার

১,৬৫৫ বছর পরে বন্যা হওয়ার কথা। পক্ষান্তরে জেনেসিসের (১১, ১০-৩২) একই স্যাকারডোটাল পাঠে প্রদত্ত ইব্রাহীমের শেজরানামা থেকে দেখা যায় যে, ইব্রাহীম বন্যার ২৯২ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা বাইবেল থেকেই জানতে পারি যে, ইব্রাহীম মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব ১৯৫০ সালে জীবিত ছিলেন। তাহলে বন্যাটি খৃষ্টপূর্ব একবিংশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দীতে হয়েছিল বলে স্থির করা যায়। এ হিসাব বাইবেলের প্রাচীন সংস্করণে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তখন বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না বলে বিপরীত কোন যুক্তি উত্থাপন করা সম্ভব ছিল না। ফলে বাইবেলে প্রদত্ত কালানুক্রম সকলে বিনা দ্বিধায় মেনে নিত। কিন্তু এখন প্রাচীন ঘটনাবলীর কালানুক্রম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে যাওয়ায় ওল্ড টেস্টামেন্টের স্যাকারডোটাল পাঠের লেখকগণ যে কাল্পনিক সন-তারিখ দিয়েছিলেন তা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বাইবেলের পরবর্তী সংস্করণ থেকে ঐ সন-তারিখ গায়েব করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে সকল শেজরানামা এখনও গায়েব করা হয়নি তার ভিত্তিতে হিসাব করলেই ঐ মারাত্মক ভুল অতি সহজেই ধরা পড়ে। বাইবেলের আধুনিক ভাষ্যকারগণ অবশ্য ঐ ভুলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, অথবা করতে সক্ষম হন না।

বর্তমান কালে এমন একটি ধারণা করা কিভাবে সম্ভব যে খৃষ্টপূর্ব একবিংশ বা দ্বাবিংশ শতাব্দীতে এমন একটি প্রলয়কান্ড হয়েছিল যার ফলে পৃথিবীর সকল প্রাণী (নূহের কিশতির আরোহীগণ ছাড়া) খতম হয়ে গিয়েছিল? তখন দুনিয়ার বেশ কয়েকটি অংশে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং তার ধ্বংসাবশেষ আমাদের পর্যন্তও এসে পৌঁছেছে। উদাহরণস্বরূপ ঐ সময় মিসরে প্রাচীন রাজত্বের পর মধ্যবর্তী যুগ শেষ হয়ে মধ্য রাজত্বের শুরু হয়। বর্তমানে আমরা ইতিহাস সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছি তার আলোকে বিচার করলে ঐ প্লাবনে সকল মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে দাবী করা হাস্যকর বলেই মনে হয়।

সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে প্লাবন সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা আধুনিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর বাইবেলের পাঠ যে মানুষের হাতেই রদবদল হয়েছে, একই বিষয়ে **দুটি** পাঠ থাকা থেকেই তার আনুষ্ঠানিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্লাবন বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা

কুরআনে প্লাবন সম্পর্কে একটি সাধারণ বর্ণনা আছে। এ বর্ণনা বাইবেলের বর্ণনা থেকে **সম্পূর্ণ** পৃথক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কোন প্রশ্ন বা সমালোচনার সৃষ্টি করে না।

কুরআনে প্লাবনের কোন ধারাবাহিক বর্ণনা নেই। বিভিন্ন সূরায় নূহের জনগণের উপরে আপতিত শাস্তির কথা বলা হয়েছে মাত্র। সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা আছে ১১ সূরার (হুদ) ২৫-৫৯ আয়াতে। ৭১ সূরায় (নূহ) এবং ২৬ সূরা (শুআরা) ১০৫-১৫৫ আয়াতে সর্বোপরি আছে নূহের নছিহতের বিবরণ। প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহের বিবেচনায় যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী সমাজের উপরে আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার সাধারণ পটভূমিকায় কুরআনে বর্ণিত প্লাবনের কথা বিবেচনা করব।

বাইবেলে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী সমগ্র মানবসমাজের শাস্তি হিসেবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্লাবনের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সমাজের উপরে কতিপয় শাস্তি নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন ২৫ সূরার (ফুরকান) ৩৫-৩৯ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারুণকে তাহার সাহায্যকারী করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমি সেই সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূল গণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। সীমালংঘনকারীদিগের জন্যে আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম আদ, সামুদ, রসবাসী এবং উহাদিগের অন্তরবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও। আমি উহাদিগের প্রত্যেককে দৃষ্টান্ত দ্বারা সতর্ক করিয়াছিলাম এবং অবাধ্যতার জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম।"

একইভাবে ৭ সূরার (আরাফ) ৫৯-৯৩ আয়াতে নূহের সম্প্রদায় আদ, সামুদ, লুতের সম্প্রদায় (সদোম) ও মাদিয়ানের উপরে নাযিল করা শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্লাবনের প্রলয়কে কুরআনে নির্দিষ্টভাবে নূহের সম্প্রদায়ের জন্য শাস্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বাইবেলের বর্ণনার সঙ্গে কুরআনের বর্ণনার এটা প্রথম মৌলিক পার্থক্য।

দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, কুরআনে প্লাবনের কোন সন-তারিখও দেয়া নেই, মেয়াদও দেয়া নেই; কিন্তু বাইবেলে দেয়া আছে।

প্লাবনের কারণ উভয় গ্রন্থে মোটামুটি একই রকম বর্ণিত আছে। বাইবেলের স্যাকারডোটাল বর্ণনায় (আদিপুস্তক ৭, ১১) একই সময়ে দুটি কারণের ক্রিয়াশীল হওয়ার কথা আছে "ঐ দিনে মহাজলধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল এবং আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত হইল।" পক্ষান্তরে কুরআনের ৫৪ সূরার (কমর) ১১-১২ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণে এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবন; অতঃপর আকাশের পানিও জমিনের পানি মিলিত

হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে।"

কিশতির আরোহীদের সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা সুনির্দিষ্ট। আল্লাহ নূহকে যে হুকুম দেন তা সঠিকভাবেই পালন করা হয়। হুকুমে নিম্নলিখিত কাজ করতে বলা হয়।

সূরা ১১ (হুদ) আয়াত ৪০ঃ "ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া, যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে।" তাহার সঙ্গে বিশ্বাস করিয়াছিল অল্প কয়েক জন।

পরিবার থেকে যাকে বাদ দেয়া হয় সে ছিল নূহের এক পাপাচারী পুত্র। নূহের মিনতি সত্বেও তার ব্যাপারে আল্লার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়নি (সূরা হুদ, আয়াত ৪৫-৪৬)। নূহের পরিবার (ঐ পুত্র বাদে) ছাড়াও কুরআনে কিশতির যাত্রী হিসেবে এমন কিছু লোকের উল্লেখ আছে যারা আল্লার উপরে ঈমান এনেছিল।

বাইবেলে অবশ্য অমন কোন মানুষের উল্লেখ নেই। আসলে কিশতির যাত্রী সম্পর্কে বাইবেলে তিনটি পৃথক বর্ণনা আছে।

প্রথম বর্ণনা-ইয়াহভিস্ট পাঠ মতে 'পবিত্র' ও 'অপবিত্র' প্রাণী ও পাখির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক 'পবিত্র' প্রজাতির সাত জোড়া (সাতটি পুরুষ ও সাতটি স্ত্রী) এবং প্রত্যেক 'অপবিত্র' প্রজাতির এক জোড়া (একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী) প্রাণীও কিশতিতে নেয়া হয়। (উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন সকল সেমিটিক ভাষায় 'সাত' বলতে সাধারণত 'বহু' বুঝাত। এখানেও তাই বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় বর্ণনা- সংশোধিত ইয়াহভিস্ট বর্ণনা মতে (আদিপুস্তক ৭, ৮) 'পবিত্র' বা 'অপবিত্র' যেরূপই হোক না কেন প্রত্যেক প্রজাতির মাত্র এক জোড়া প্রাণী কিশতিতে নেয়া হয়েছিল।

তৃতীয় বর্ণনা- স্যাকারডোটাল পাঠ মতে কিশতিতে নূহ, (তাঁর পরিবারের কেউ বাদ ছিল না) এবং প্রত্যেক প্রজাতির একজোড়া প্রাণী ছিল।

মূল প্লাবনের বিবরণ কুরআনের ২১ সূরার (হুদ) ২৫-৪৯ আয়াতে এবং ২৩ সূরার (মুমিনুন) ২৩-৩০ আয়াতে আছে। বাইবেলের বর্ণনাও প্রায় একই প্রকারের; তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই।

নূহের কিশতি যে স্থানে গিয়ে স্থল পেয়েছিল বাইবেলে তার নাম আরারাত পর্বত (জেনেসিস বা আদিপুস্তক ৮, ৪) এবং কুরআনে তার নাম জুদি (সূরা হুদ, ৪৪ আয়াত)। এ পর্বতটি আরমেনিয়ার আরারাত পর্বতমালার সর্বোচ্চ পর্বত বলে কথিত হয়ে থাকে, কিন্তু ঐ দুটি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য মানুষ যে তার নাম বদল করেনি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর ব্লাশেয়ার এ কথা সমর্থন করে বলেছেন যে, আরবে জুদি নামে একটি পাহাড় আছে। তবে নামের এ সামঞ্জস্য কৃত্রিমও হতে পারে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, প্লাবন সম্পর্কে বাইবেল ও কুরআনের বর্ণনায় যে প্রধান প্রধান পার্থক্য আছে তা সঠিক ও সুনির্দিষ্ট ভাবেই সনাক্ত করা সম্ভব। কয়েকটি পার্থক্য অবশ্য বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অভাবে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। তবে স্বীকৃত ও সর্বজনগৃহীত তথ্যের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে বাইবেলের বর্ণনা সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত তথ্য ও জ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ; বিশেষত প্লাবনের সনতারিখ এবং ভৌগলিক পরিধি সম্পর্কে এই কথা আরও বেশী প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কুরআনের বর্ণানয় এমন কিছু নেই যার বিরুদ্ধে কোন বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা উত্থাপন করা যেতে পারে। তবে কেউ হয়ত এমন কথা বলতে পারেন যে, বাইবেল ও কুরআন নাযিল হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে মানুষের পক্ষে এমন জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব ছিল কিনা, যার ফলে ঘটনাটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া গিয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, না। কারণ, ওল্ড টেস্টামেন্টের সময় থেকে কুরআনের সময় পর্যন্ত এ প্রাচীন কাহিনীটি সম্পর্কে একমাত্র বাইবেল ছাড়া মানুষের কাছে আর কোন দলীল ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে ঘটনাটির বিবরণে পরবর্তীকালে যে অর্থ ও তাৎপর্যগত পরিবর্তন এসেছে তাতে মানুষের কোন হাত নেই। তাহলে এ পরিবর্তনের জন্য আর একটি ব্যাখ্যা বা কারণ মেনে নিতে হয় এবং তা হচ্ছে বাইবেলের বর্ণনার পরবর্তীকালে নাযিল হওয়া অহি।

মহাযাত্রা

মূসা ও তাঁর অনুসারীদের মিসর থেকে মহাযাত্রা (কেনানের পথে প্রথম পর্যায়) একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কখনও কখনও মূলত কিংবদন্তি বলে অভিযোগ করা হলেও ঘটনাটি প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং পরিচিত পটভূমিকায় অবস্থিত।

ওল্ড টেস্টামেন্টের পেন্টাটিউক অর্থাৎ তৌরাতের দ্বিতীয় গ্রন্থে (যাত্রাপুস্তক) এ ঘটনা বর্ণিত আছে। সেখানে বিরাণভূমিতে সফর এবং সিনাই পাহাড়ে আল্লার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির একটি বিবরণও আছে। কুরআনেও এ বিষয়ে দীর্ঘ বিবরণ আছে। সূরা আরাফ, ইউনুস, তাহা ও শুয়ারা সহ দশটিরও অধিক সূরায় ফেরাউনের সঙ্গে মূসা ও তাঁর ভাই হারুণের সম্পর্ক এবং তাঁদের মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এছাড়াও অন্যত্র সংক্ষেপে অথবা স্মারক হিসেবে এ ঘটনার উল্লেখ আছে। আমার নিজের জানা মতে মিসরীয় পক্ষের প্রধান নায়ক ফেরাউনের নাম কুরআনের সাতাশটি সূরায় মোট চুয়াত্তর বার উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনা মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, প্লাবনের ঘটনার তুলনায় এ ঘটনার ব্যাপারে উভয় বর্ণনার মধ্যে অনেক মিল আছে। অমিল অবশ্যই আছে, তথাপি আমরা দেখতে পাব যে বাইবেলের বর্ণনার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য

আছে। কারণ এ বর্ণনা থেকেই সংশ্লিষ্ট ফেরাউন, কিম্বা বলা যায় সংশ্লিষ্ট দুজন ফেরাউনকে সনাক্ত করা যায়। সনাক্ত করার এ প্রক্রিয়াটি বাইবেল থেকেই শুরু হয়েছে এবং কুরআনে বর্ণিত তথ্য দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে। তার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত তথ্য যোগ করে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করা যেতে পারে।

বাইবেল বর্ণিত মহাযাত্রা

বাইবেলের বর্ণনা শুরু হয়েছে ইয়াকুবের সঙ্গে ইহুদীদের মিসের প্রবেশের কথা স্মরণের মধ্য দিয়ে। ইয়াকুব সেখানে ইউসুফের সঙ্গে মিলিত হন। পরে যাত্রাপুস্তক ১, ৮, মতেঃ "পরে মিসরের উপরে এক নতুন রাজা উঠিলেন, তিনি যোসেফকে জানিতেন না।"

তারপর অত্যাচার শুরু হয়। ফেরাউন পিথোম ও রামিসেস শহর (যাত্রাপুস্তক ১, ১১) নির্মাণের কাজে ইহুদীদের মজুর হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। আর তাদের সংখ্যা যাতে না বাড়তে পারে সে জন্য ইহুদীদের প্রত্যেকটি নবজাত পুত্র সন্তানকে নদীতে ফেলে দেয়ার হুকুম দেন। মূসা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম তিন মাস তাঁর মা তাঁকে কোন মতে লুকিয়ে রাখেন এবং তারপর তাঁকে ঝুড়িতে করে নদীর তীরে রেখে আসেন। ফেরাউনের কন্যা ঘটনাক্রমে শিশুটিকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে যান এবং তার দেখাশুনার দায়িত্ব একজন পরিচারিকার উপর অর্পণ করেন। এ পরিচারিকা আসলে ছিলেন মূসার মা। মূসার বোন দূরে লুকিয়ে থেকে রাজকন্যাকে তার ভাইকে নিয়ে যেতে দেখেন এবং শিশুটিকে না চেনার ভান করে একজন ভাল পরিচারিকার সন্ধান দেয়ার কথা বলে শিশুর মাকেই সে কাজে লাগিয়ে দেন। শিশুটি ফেরাউনের অন্যতম পুত্র হিসেবেই লালিত পালিত হয় এবং তাঁর নাম রাখা হয় মূসা।

যৌবনে মূসা মিডিয়ায় (মাদায়েন) নামক একটি দেশে চলে যান। সেখানে তিনি বিয়ে করেন এবং বহুদিন বাস করেন। এ পর্যায়ে বাইবেলে (যাত্রাপুস্তক ২, ২৩) এক গুরুত্বপূর্ণ খবর দেয়া হয়েছে- "এ সময় মিসর-রাজের মৃত্যু হইল।"

আল্লাহ মূসাকে ফেরাউনের নিকট যেতে এবং তাঁর ভাইদের মিসরের বাইরে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন (বাইবেলে জলন্ত ঝোপের কাহিনীতে এ হুকুমের কথা আছে)। এ দায়িত্ব পালনে মূসাকে তাঁর ভাই হারুণ সাহায্য করেন। মিসরে ফিরে যাওয়ার পর মূসা হারুণকে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের কাছে যান। যে ফেরাউনের আমলে মূসার জন্ম হয়েছিল এ ফেরাউন ছিলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী।

ফেরাউন মূসার অনুসারী ইহুদীদের মিসর **ত্যাগে**র অনুমতি দিলেন না। আল্লাহ পুনরায় অহি নাযিল করে মূসাকে ফেরাউনের কাছে পুনরায় অনুরোধ জানাতে হুকুম

দিলেন। বাইবেল অনুসারে এ সময় মূসার বয়স ছিল আশি বছর। তিনি যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা তিনি যাদুর মারফত ফেরাউনকে দেখালেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। আল্লাহ প্লেগ রোগের আকারে মিসরের উপরে গজব নামিয়ে দিলেন। নদীর পানি রক্তে পরিণত হল, কোটি কোটি ব্যাঙ, ডাশ ও মাছি লোকালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, মানুষ ও প্রাণীর দেহে ফোঁড়া দেখা দিল, গৃহপালিত পশু মারা গেল, ঘনঘন শিলাপাত হল, পঙ্গপালে দেশ ছেয়ে গেল, সর্বত্র অন্ধকার নেমে এল এবং প্রথম সন্তানের মৃত্যু হতে লাগল। কিন্তু তথাপি ফেরাউন ইহুদীদের মিসর ত্যাগের অনুমতি দিলেন না।

ফলে তারা রামিসেস শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। মহিলা ও শিশু ছাড়া তারা সংখ্যায় ছয় লক্ষ ছিল (যাত্রাপুস্তক ১২-৩৭)। পরে আমরা অবশ্য দেখতে পাব যে এ সংখ্যা অতিরঞ্জিত। ফেরাউন "আপন রথ প্রস্তুত করাইলেন ও আপন লোকদেরকে সঙ্গে নিলেন। আর মনোনীত ছয়শত রথ ও তৎসমুদয়ের উপরে নিযুক্ত সেনানীদেরকে লইলেন। এভাবে মিসর-রাজ ইসরায়েল সন্তানদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; তখন ইসরায়েল সন্তানেরা উর্ধ হস্তে বহির্গমন করিতেছিল।" (যাত্রাপুস্তক ১৪, ৬ ও ৮)। ফেরাউন বাহিনী সমুদ্রতীরে গিয়ে মূসার লোকজনকে ধরে ফেলল। মূসা তাঁর লাঠি উঁচু করলেন, সমুদ্র দুভাগ হয়ে গেল এবং তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে পা না ভিজিয়েই ওপারে চলে গেলেন। "পরে মিসরীয়রা, ফেরাউনের সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারূঢ়গণ ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। (যাত্রাপুস্তক ১৪, ২৩) "জল ফিরিয়া আসিল ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফেরাউনের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু ইসরায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলিল এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ হইল। (যাত্রাপুস্তক ১৪, ২৮-২৯)।

যাত্রাপুস্তকের বর্ণনা খুবই পরিষ্কার। ফেরাউন তাঁর বাহিনীর সামনে ছিলেন এবং তিনি পানিতে ডুবে মারা গেলেন। কারণ বর্ণনায় বলা হয়েছে- "তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না।" এ ঘটনাটি বাইবেলের গীতসংহিতায় (সাম্স) ১০৬ গীতের ১১ স্তোত্র এবং ১৩৬ গীতের ১৩ ও ১৫ স্তোত্রেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে, কারণ "তিনি সুফ-সাগরকে দ্বিভাগ করিলেন এবং তাহার মধ্য দিয়া ইসরায়েলকে পার করিলেন, কিন্তু ফেরাউন ও তাঁহার বাহিনীকে সুফ-সাগরে ঠেলিয়া দিলেন।" সুতরাং বাইবেল অনুসারে ফেরাউন যে সাগরে ডুবে মারা যান সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর লাশের কি গতি হল সে সম্পর্কে বাইবেলে কোন্ খবর নেই।

কুরআনে বর্ণিত মহাযাত্রা

কুরআনে এ মহাযাত্রার যে বিবরণ আছে তা মোটামুটি ভাবে বাইবেলের বর্ণনার মতই। তবে বিবরণটি বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে আছে ফলে তা একত্রিত করে পড়ে দেখার প্রয়োজন হয়।

কুরআনে মহাযাত্রার সময়কালীন গদিনশিন ফেরাউনের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ফলে তাঁকে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। বাইবেলেও নাম নেই তবে শুধু এটুকুই জানা যায় যে, তাঁর একজন মন্ত্রীর নাম ছিল হামান। কুরআনে ছয়বার তাঁর উল্লেখ আছে (সূরা কাসাস আয়াত ৬, ৮ ও ৩৮ সূরা আনকাবুত আয়াত ৩৯; এবং সূরা মুমিন আয়াত ২৪ ও ৩৬)।

ফেরাউন ইহুদীদের নির্যাতনকারী। সূরা ১৪ (ইব্রাহীম) আয়াত ৬ঃ "মূসা তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফেরাউনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে, যাহারা তোমাদিগকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত, তোমাদিগের পুত্রগণকে জবাই করিত ও তোমাদিগের নারীগণকে জীবিত রাখিত।"

সূরা আরাফের ১৪১ আয়াতেও একই ভাবে ঐ নির্যাতনের বর্ণনা আছে। ইহুদীগণ মিসরে দাস জীবন যাপনের সময় যে শহর নির্মাণ করেছিল কুরআনে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। বাইবেলে নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসাকে শিশুকালে নদীর তীরে রেখে যাওয়ার ঘটনাটি সূরা তাহা'র ৩৯-৪০ আয়াত এবং সূরা কাসাসের ৭-১৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা মতে মূসাকে ফেরাউনের পরিবার-পরিজন নিয়ে যায়।

সূরা ২৮ (কাসাস) আয়াত ৮-৯ঃ "ফেরাউনের লোকজন মূসাকে উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদিগের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফেরাউন, হামান ও উহাদিগের বাহিনী ছিল অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে, আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।' প্রকৃত পক্ষে উহারা উহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই।

মুসলিম কিংবদন্তি মতে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া মূসার লালন-পালন করেন। কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায় ফেরাউনের স্ত্রী নন, তাঁর বাড়ির লোকজন মূসাকে নদীর তীরে কুড়িয়ে পায়।

সূরা কাসাসের ১৩-২৮ আয়াতে মূসার যৌবনকাল, তাঁর মাদায়েনে অবস্থান ও তার বিয়ের বর্ণনা আছে। বিশেষত জ্বলন্ত ঝোপের ঘটনাটি সূরা তাহা'র প্রথম ভাগে এবং সূরা কাসাসের ৩০-৩৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনে মিসরের উপরে দশটি আসমানী গজব নাযিল হওয়ার কথা নেই (বাইবেলে আছে); সংক্ষেপে পাঁচটি গজবের (বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত) উল্লেখ আছে (সূরা আরাফ আয়াত ১৩৩)।

কুরআনে মিসর থেকে মহাযাত্রার বিবরণ আছে, কিন্তু বাইবেলে যে ভৌগলিক তথ্য বা অসংখ্য মানুষের উল্লেখ আছে কুরআনে তা নেই। ছয় লক্ষ পুরুষের তাদের পরিবার-পরিজন সহ দীর্ঘদিন যাবত মরুভূমিতে অবস্থানের যে বর্ণনা বাইবেলে আছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কুরআনে ইহুদীদের পিছনে ধাবমান ফেরাউনের মৃত্যু এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ সূরা ২০ (তাহা) আয়াত ৭৮ঃ "অতঃপর ফেরাউন তাহার সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলে সমুদ্র উহাদিগকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করিল। ইহুদীরা পার হয়ে গেল। ফেরাউন মারা গেল এবং তার লাশ পাওয়া গেল।" লাশ পাওয়ার এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ বাইবেলে নেই।

সূরা ১০ (ইউনুস) আয়াত ৯০-৯২ঃ "আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফেরাউন ও তাহার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমা লংঘন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন সে বলিল, আমি বিশ্বাস করিলাম যে বনি ইসরাইল যাহাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত।"

"এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহ চরাভূমিতে রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।"

এ ব্যাপারে দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথমত ফেরাউনের বিদ্বেষ ও ন্যায়ের সীমা লংঘনের ব্যাপারটি মূসা কর্তৃক তাকে হেদায়েত করার প্রচেষ্টার আলোকে উপলব্ধি করতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত ফেরাউনকে রক্ষা বা উদ্ধার করা বলতে তার লাশকে রক্ষা বা উদ্ধার করাই বুঝতে হবে, কারণ ফেরাউনকে যে দন্ডিত করা হয়েছে তা কুরআনেই বলা হয়েছে। সূরা ১১ (হুদ) আয়াত ৯৮।

"সে (ফেরাউন) কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে তাহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।"

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, ইতিহাস, ভূগোল ও স্থাপত্যবিদ্যার আলোকে যে সকল ঘটনা যাচাই করে দেখা সম্ভব সে সকল ঘটনার বর্ণনায় কুরআনে ও বাইবেলে নিম্নরূপ পার্থক্য আছেঃ

- মূসার অনুসারী ইহুদীগণ যে শহর নির্মাণ করেছিল এবং মহাযাত্রার পথে যে সকল স্থান অতিক্রম করেছিল কুরআনে তার নামের কোন উল্লেখ নেই।

- মূসার মাদায়েনে অবস্থান কালে কোন ফেরাউনের মৃত্যু হয়েছে বলে কুরআনে কোন উল্লেখ নেই।

- ফেরাউনকে হেদায়েতের চেষ্টা করার সময় মূসার বয়স কত ছিল তা কুরআনে বর্ণিত হয়নি।

- কুরআনে মূসার অনুসারীদের সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই, বাইবেলে স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে ছয় লক্ষ পুরুষ ও তাদের পরিবার-পরিজন; অর্থাৎ সর্বমোট বিশ লাখেরও বেশী নরনারী।

- ফেরাউনের মৃত্যুর পর তার লাশ উদ্ধার হওয়া সম্পর্কে বাইবেলে কোন উল্লেখ নেই।

আমাদের বর্তমান বিবেচনার জন্য উভয় গ্রন্থের বর্ণনার এ সাধারণ বিষয়গুলি লক্ষণীয়ঃ

- মূসার অনুসারী ইহুদীদের উপরে ফেরাউনের অত্যাচারের যে ঘটনা বাইবেলে বর্ণিত আছে কুরআনে তার সমর্থন আছে।

- কুরআন বা বাইবেলে মিসরের রাজার কোন নাম উল্লেখ করা হয়নি।

- মহাযাত্রার সময় ফেরাউনের মৃত্যু হওয়া বিষয়ক বাইবেলের বর্ণনা কুরআনে সমর্থিত হয়েছে।

কিতাবের তথ্যের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের মুকাবিলা

বনি ইসরাইলের মিসরে অবস্থানের মেয়াদ এবং তাদের মিসর ত্যাগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাইবেল ও কুরআনে যে বর্ণনা আছে তাতে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের মুকাবিলা চলতে পারে। তবে এ মুকাবিলা আসলে অসম হতে বাধ্য, কারণ কিছু তথ্য বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে এবং অবশিষ্ট তথ্য নিয়ে কোন আলোচনা করাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

১। কিতাবে বর্ণিত কিছু তথ্যের বিবেচনা

মিসরে বনি ইসরাইল

স্পষ্টতই ভুলের কোন ঝুঁকি প্রায় না নিয়েই বলা সম্ভব যে বাইবেলের বর্ণনা মুতাবিক (আদিপুস্তক ১৫, ১৩ এবং যাত্রাপুস্তক ১২, ৪০) ইহুদীগণ ৪০০ অথবা ৪৩০ বছর মিসরে অবস্থান করেছিল। আদিপুস্তক ও যাত্রাপুস্তকের বর্ণনার এ সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে, ইব্রাহীমের অনেক পরে ইয়াকুব-পুত্র ইউসুফ যখন তাঁর ভাইদের নিয়ে মিসরে যান তখন থেকেই ইহুদীদের মিসরে অবস্থানের মেয়াদ শুরু হয়।

তবে লক্ষ্যণীয় যে একমাত্র বাইবেলেই এ তথ্য আছে, আর কুরআনে কেবলমাত্র মিসর যাত্রার উল্লেখ আছে কিন্তু কোন সন-তারিখের উল্লেখ নেই এবং এছাড়া এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে এমন কোন দলীল আমাদের হাতে নেই।

পি মনটেট থেকে ডানিয়েল-রপস পর্যন্ত আধুনিক ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে, সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতাগণ যখন মিসরে উপনীত হন, ঠিক সেই সময় হাইকসোসগণও মিসর অভিমুখে রওনা হয় এবং সম্ভবত হাইকসোসদেরই কোন নরপতি নীলনদের উপত্যকায় অবস্থিত আভারিসে তাঁদের সাদর অভর্থনা জানান।

কিন্তু এ অনুমান যে বাইবেলের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ, বাইবেলে বলা হয়েছে (রাজাবলী-১,৬,১) যে, খৃষ্টপূর্ব ১৭১ সালে সোলায়মানের ভজনালয় নির্মাণের ৪৮০ বছর পূর্বেই ইহুদীগণ মিসর থেকে মহাযাত্রা করে মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব ১৪৫০ সালে এবং মিসরে প্রবেশ খৃষ্টপূর্ব ১৮৮০-১৮৫০ সালে হওয়ার কথা। অথচ ঠিক এ সময়ই নাকি ইব্রাহীম জীবিত ছিলেন এবং বাইবেলের অন্যান্য তথ্য থেকে জানা যায় যে, তাঁর ও ইউসুফের আমলের মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে ২৫০ বছর। সুতরাং ঘটনার ক্রমিকতার বিবেচনায় বাইবেলের এ বিবরণ আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পরে আমরা এ বিষয়ে ফাদার দ্য ফক্সের ব্যাখ্যা দেখতে পাব। আর ঐ যে আধুনিক ভাষ্যকারদের অনুমান, তার বিরুদ্ধে আপত্তির একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে বাইবেলের (রাজাবলী-১) এ বর্ণনা, অথচ বর্ণনাটি যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় তা আমরা আগেই দেখতে পেয়েছি।

কিতাবের বর্ণনা ছাড়া ইহুদীদের মিসরে অবস্থানের অন্য কোন প্রমাণ বা চিহ্ন তেমন পাওয়া যায় না। প্রাচীন মিসরের প্রতীকচিত্রে অবশ্য আপিরু, হাপিরু বা হাবিরু নামের একশ্রেণীর শ্রমিকের উল্লেখ দেখা যায় যাদের (সঠিক বা বেঠিক ভাবে) হিব্রু অর্থাৎ ইহুদী বলে সনাক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইমারত নির্মাণের শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক প্রভৃতি ছিল। কিন্তু তারা কোথা থেকে এসেছিল তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। ফাদার দ্য ফক্স বলেছেন- "তারা স্থানীয় লোক নয়, স্থানীয় সমাজের কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে তারা নিজেদের দাবী করে না এবং স্থানীয়দের মত পেশা বা মর্যাদাও তাদের নেই।"

মিসর-রাজ তৃতীয় টুথমোসিসের আমলের একখানি প্যাপিরাস দলীলে তাদের "আস্তাবলের শ্রমিক" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় আমেনোফিস তাদের ৩ হাজার ৬ শত জনকে কেনান থেকে বন্দী করে এনেছিলেন বলে জানা যায়। ফাদার দ্য ফক্স লক্ষ্য করেছেন যে তাদের মধ্যে অনেকে সিরীয়-ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিল। প্রথম সেথোসের আমলে (খৃষ্টপূর্ব ১৩০০ সাল) কেনানের বেথ-শিয়ান অঞ্চলে আপিরুগণ যথেষ্ট গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় রামেসেসের আমলে তাদের

কিছু লোককে খনি শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং কিছু লোককে মন্দিরের সুউচ্চ প্রবেশদ্বার নির্মাণের জন্য পাথর বহনের কাজে লাগানো হয়। বাইবেল থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, একই সময়ে তাদের মিসরের উত্তরাঞ্চলীয় রাজধানী শহর নির্মাণের কাজে নিয়োগ করা হয়। মিসরীয় রচনায় খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে একবার আপিরুদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় এবং সর্বশেষ উল্লেখ দেখা যায় তৃতীয় রামেসেসের আমলে।

আপিরু শব্দটি অবশ্য কেবলমাত্র মিসরেই ব্যবহৃত হয়নি, সুতরাং এ শব্দে একমাত্র হিব্রুদেরই বুঝানো হয়েছে কিনা তা বলা কঠিন। শব্দটি দ্বারা মূলত হয়ত জবর-মজুর বা ক্রীতদাস বুঝানো হয়ে থাকতে পারে এবং পরে তা একটি পেশার নামে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি আধুনিক শব্দের ব্যবহারের নজীর স্মরণ করা যেতে পারে। ফরাসী ভাষায় সুইসি (সুইস) শব্দটির কয়েক প্রকার অর্থ আছে। সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী, ঐ দেশ থেকে আসা প্রাচীন ফরাসী রাজার অধীনস্থ ভাড়াটিয়া সৈনিক, ভ্যাটিকানের প্রহরী বা খ্রীষ্টান চার্চের কর্মচারী।

তবে অবস্থা যাই হয়ে থাকুক না কেন ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসেসের আমলে তাদের দিয়ে যে কাজ করানো হয়েছিল তা যে জবর-মেহনত বা বাধ্যতামূলক শ্রম ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যে ইহুদীদের উপরে জুলুম করতেন সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে যে রামিসেস ও পিথম শহরের উল্লেখ আছে তা নালনদ উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। ঐ একই এলাকায় বর্তমান যুগের তানিস ও কানতির শহর অবস্থিত এবং এ দুই শহরের ব্যবধান প্রায় পনর মাইল। দ্বিতীয় রামেসেসের নির্মিত রাজধানীও এ এলাকায় ছিল এবং তিনিই ইহুদীদের উপরে জুলুম করতেন।

এ পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই মূসা জন্মগ্রহণ করেন। নদীর পানি থেকে তাঁর উদ্ধারের ঘটনাটি আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর একটি মিসরীয় নামও আছে। পি মনটেট তাঁর ইজিপ্ট এন্ড দি বাইবেল নামক গ্রন্থে (প্রকাশক ডিলাসক্স এন্ড নিসল, নিউফসাটেল, ১৯৫৯) দেখিয়েছেন যে, রাংক রচিত প্রতীকচিত্রভাষার অভিধানে মানুষের প্রচলিত নামের তালিকায় মেসু বা মেসি নামটিও রয়েছে। কুরআনে অবশ্য মূসা নামই ব্যবহৃত হয়েছে।

মিসরে দুর্যোগ

বাইবেলে 'প্লেগ' শিরোনামে মিসরে আল্লার তরফ থেকে দশ রকমের গজব নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক গজবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কয়েকটি গজবের আবার অলৌকিক বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে কেবলমাত্র

পাঁচটি গজবের কথা আছে। এগুলির অধিকাংশই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তবে ব্যাপক আকারের বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত।

বাইবেলে ব্যাঙ ও পঙ্গপালের দ্রুত বংশ বিস্তারের বর্ণনা আছে। নদীর পানি রক্ত হয়ে সমস্ত দেশ প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কথাও আছে। কুরআনে রক্তের উল্লেখ আছে মাত্র, আর কোন বিবরণ নেই। স্পষ্টতই রক্তের উল্লেখের ভিত্তিতে নানাবিধ কল্পকাহিনীর অবতারণা করা যেতে পারে।

বাইবেলে অন্যান্য যে সকল গজবের কথা আছে তা হচ্ছে বিষাক্ত পতঙ্গ, মাছির ঝাঁক, বিষফোঁড়া, শিলাবৃষ্টি, অন্ধকার, প্রথম সন্তানের মৃত্যু, এবং গবাদি পশুর মৃত্যু। প্লাবন শুরু হওয়ার মত এ সকল গজবও নানাভাবে শুরু হয়েছে এবং বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

মহাযাত্রার পথ

কুরআনে মহাযাত্রার পথ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই। পক্ষান্তরে বাইবেলে বিস্তারিত বিবরণ আছে। ফাদার দ্য ফক্স এবং পি মনটেট উভয়েই এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনার পথ খুলে দিয়েছেন। সম্ভবত তানিস কানতির অঞ্চল থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল, কিন্তু অবশিষ্ট পথের যে বর্ণনা বাইবেলে আছে তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তাছাড়া মূসা ও তাঁর দলবলের পার হয়ে যাওয়ার জন্য পানি যে ঠিক কোন জায়গায় বিভক্ত হয়েছিল তাও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

পানির অলৌকিক বিভক্তি

কোন কোন ভাষ্যকার মনে করেন যে, অলৌকিকভাবে পানি বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সম্ভবত জোয়ার-ভাটার কারণে অথবা দূরবর্তী কোন অগ্নিগিরিতে অগ্নুৎপাতের কারণে হয়ে থাকতে পারে। ভাটার সময় ইহুদীরা পার হয়ে থাকতে পারে এবং পরবর্তী জোয়ারের সময় মিসরীয়রা ডুবে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এ সবই নিছক অনুমান মাত্র।

ফেরাউনদের ইতিহাসে মহাযাত্রার স্থান

সময়ের হিসেবে মহাযাত্রা যে ইতিহাসের কোন পর্যায়ে অবস্থিত সে সম্পর্কে আরও সঠিক প্রমাণ নির্ণয় করা সম্ভব।

দ্বিতীয় রামিসেসের উত্তরাধিকারী মারনেপতাহ-ই যে মহাযাত্রার আমলের ফেরাউন

এ ধারণা বহুদিন যাবত পোষণ করা হয়ে আসছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিখ্যাত মিসরবিদ মাসপেরো তাঁর "ভিজিটস গাইড টু দি কায়রো মিউজিয়াম" (১৯০০) গ্রন্থে লিখেছেনঃ "আলেকজান্দ্রিয়ার প্রবাদ মতে মারনেপতাহ-ই মহাযাত্রার আমলের ফেরাউন ছিলেন এবং লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিলেন।" মাসপেরো যে দলীলের ভিত্তিতে এ কথা বলেছেন তা আমি হাতে পাইনি। কিন্তু তাঁর মত একজন বিশিষ্ট এবং সুবিখ্যাত ভাষ্যকারের উক্তি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

পি মনটেট ছাড়া অপর কোন মিসরবিদ বা বাইবেলবিদ এ ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে তেমন কোন গবেষণা করেননি। গত কয়েক দশকের মধ্যে অবশ্য এ বিষয়ে অনেক অনুমান উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে গ্রন্থের বর্ণনার একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করা। অনুমানের উদ্ভাবকগণ বর্ণনার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে আদৌ নজর দেননি এবং গ্রন্থের বর্ণনা বলতে শুধু বাইবেলের বর্ণনাই বুঝায় না। তদুপরি প্রত্যেকটি অনুমানেরই যে ইতিহাস ও পুরাকীর্তির তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন আছে উদ্ভাবকগণ তাও তেমন খেয়াল করে দেখেননি।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত অনুমান উদ্ভাবন করেছেন (১৯৬০) জে দ্য মিসেলি। তিনি একেবারে দিন-তারিখ নির্ণয় করে বলেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ১৪৯৫ সালের ৯ই এপ্রিল মহাযাত্রা হয়েছিল। তিনি পঞ্জিকার ভিত্তিতে হিসেব করে ঐ তারিখ নির্ণয় করেছেন এবং দাবী করেছেন যে ঐ সময় দ্বিতীয় টুথমোসিস মিসরের ফেরাউন ছিলেন। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন মহাযাত্রার আমলের ফেরাউন। এ দাবীর সমর্থনে তিনি বলেছেন যে, দ্বিতীয় টুথমোসিস মমিতে গায়ের চামড়ায় ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় এবং ঐ ক্ষতচিহ্ন কুষ্ঠরোগের ক্ষত। কিভাবে এবং অন্য কোন কারণে ঐ ক্ষত হয়নি কেন তা অবশ্য তিনি ব্যাখা করেননি। বাইবেলে বর্ণিত দশ গজবের মধ্যে একটি হচ্ছে ফোঁড়া। এ ফোঁড়াকেই তিনি কুষ্ঠরোগজাত মনে করে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু ঐ বাইবেলেই যে অন্যান্য তথ্য আছে তা তিনি আদৌ বিবেচনায় আনেননি। বিশেষত বাইবেলে যে রামিসেস শহর নির্মাণের উল্লেখ আছে তা থেকে এ কথাই প্রমানিত হয় যে, একজন রামিসেস ফেরাউন হওয়ার আগে মহাযাত্রা হয়নি।

তাছাড়া দ্বিতীয় টুথমোসিসের চামড়ার দাগ দেখেই তাকে মহাযাত্রার ফেরাউন বলে নির্ণয় করা যায় না। কারণ তাঁর পুত্র তৃতীয় টুথমোসিস এবং পৌত্র দ্বিতীয় আমিনোফিসের গায়েও ঐরূপ দাগ ছিল এবং কায়রো যাদুঘরে রক্ষিত তাদের মমিতে ঐ দাগ এখনও পরিষ্কার দেখা যায়। ভাষ্যকারগণ মনে করেন যে বংশগত কোন রোগের কারণেই ঐ দাগ হয়ে থাকবে। সুতরাং মিসেলির অনুমান আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

একইভাবে ডানিয়েল রপসের অনুমানও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তাঁর "পিপল অব দি বাইবেল" নামক গ্রন্থে (প্রকাশক- ডেসক্লি অব দ্য ব্রাউয়ার, প্যারিস, ১৯৭০) দ্বিতীয়

আমিনোফিসকে মহাযাত্রার আমলের ফেরাউন বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর পিতা (তৃতীয় টুথমোসিস) খুবই জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন এ অজুহাতের ভিত্তিতে তিনি দ্বিতীয় আমিনোফিসকে ইহুদীদের উপরে জুলুমকারী বলে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁর বিমাতা বিখ্যাত রাণী হাতশেপসুত শিশু মূসার লালন পালন করেছিলেন।

ফাদার দ্য ফক্স দ্বিতীয় রামিসেসকে মহাযাত্রার ফেরাউন বলে নির্ণয় করেছেন এবং তাঁর যুক্তি অনেকাংশে সংগত বলে মনে হয়। তিনি তাঁর "দি এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি অব ইজরায়েল" নামক গ্রন্থে (প্রকাশক-জে গাবালডা এন্ড কোং, প্যারিস, ১৯৭১) যা বলেছেন তা বাইবেলের বর্ণনার সংগে সকল বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও তাঁর দাখিল করা একটি প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রামিসেস ও পিথম শহর দ্বিতীয় রামিসেসের আমলেই নির্মিত হয়েছিল এবং খোদ বাইবলেই এ নির্মাণকার্যের সংবাদ আছে। সুতরাং দ্বিতীয় রামিসেসের সিংহাসনে আরোহণের আগে মহাযাত্রা হয়েছিল একথা আর বলা যায় না। এ শহর নির্মাণের ঘটনা ড্রিওটন ও ভ্যানডিয়ার বর্ণিত কালক্রম মুতাবিক খৃষ্টপূর্ব ১৩০১ সালে রৌটন বর্ণিত কালক্রম মুতাবিক খৃষ্টপূর্ব ১২৯০ সালে ঘটেছিল। উপরে বর্ণিত অনুমান দুটি আরও যে একটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয় তা হচ্ছে এই যে, বাইবেলের বর্ণনা মুতাবিক দ্বিতীয় রামিসেসই হচ্ছেন ইহুদীদের উপরে জুলুমকারী ফেরাউন।

ফাদার দ্য ফক্স মনে করেন যে, দ্বিতীয় রামিসেসের রাজত্বকালের প্রথমভাগে অথবা মধ্যভাগে মহাযাত্রা হয়েছিল। এ সময় নির্ণয় সুনির্দিষ্ট নয়। মনে হয় মূসা ও তাঁর অনুসারীদের কেনানে স্থিতিলাভ এবং মারনেপতার ইহুদীদের সংগে সন্ধি করতে কিছু সময় দেয়ার জন্যই তিনি ঐভাবে সময় নির্ধারণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, পিতা দ্বিতীয় রামিসেসের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে ফেরাউন মারনেপতাহ ইহুদীদের সংগে সমঝোতা করে সীমান্তে শান্তি স্থাপন করেছিলেন বলে তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বছরের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়।

কিন্তু এ অনুমানের বিরুদ্ধে দুটি মজবুত যুক্তি খাড়া করা যায়ঃ

(ক) বাইবেলে দেখা যায় যে, মূসা যখন মাদায়েনে অবস্থান করছিলেন তখন মিসরের রাজার মৃত্যু হয়, (যাত্রাপুস্তক ২, ২৩)। বাইবেলের অন্যত্র এ রাজাকেই ইহুদীদের জবর-মেহনতের দ্বারা রামিসেস ও পিথম শহর নির্মাণকারী বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় রামিসেস। সুতরাং মহাযাত্রার ঘটনাটি তাঁর উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফাদার দ্য ফক্স বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের এ বর্ণনার উৎস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন বলে জানিয়েছেন।

(খ) আরও তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, জেরুসালেমের বাইব্লিক্যাল স্কুলের ডিরেক্টর

হওয়া সত্ত্বেও ফাদার দ্য ফক্স তাঁর মহাযাত্রা বিষয়ক অনুমানে বাইবেলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদের আদৌ কোন উল্লেখ করেননি। অথচ এ দুটি অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে, পলায়নরত ইহুদীদের তাড়া করার সময় মিসর রাজের মৃত্যু হয়। এ বিবরণ থেকে এ কথাই প্রমানিত হয় যে, মহাযাত্রার ঘটনাটি একজন রাজার রাজত্বকালের শেষভাগে ছাড়া অন্য কখনও ঘটতে পারে না। কিন্তু ফাদার দ্য ফক্স পথম বা মধ্যভাগে ঘটেছিল বলে অনুমান করেছেন।

এ প্রসংগে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইহুদীদের তাড়া করতে গিয়েই যে ফেরাউন প্রাণ হারিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কারণ, খোদ বাইবেলেই এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আছে। "তখন তিনি আপন রথ প্রস্তুত করাইলেন এবং আপন লোকদিগকে সংগে লইলেন" (যাত্রা পুস্তক ১৪, ৬)। (মিসর রাজ ফেরাউন) "ইসরায়েল সন্তানদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, তখন তাহারা বহির্গমণ করিতেছিল" (যাত্রাপুস্তক ১৪, ৮)। এবং "জল ফিরিয়া আসিল ও তাহাদের রথও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফেরাউনের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না" (যাত্রাপুস্তক ১৪, ২৮-২৯)। এছাড়া গীতসংহিতাতেও (১৩৬, ১৫) ফেরাউনের মৃত্যুর উল্লেখ করে ঈশ্বরের স্তব করার আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে "তিনি ফেরাউন ও তাঁহার বাহিনীকে সুফ সাগরে ঠেলিয়া দিলেন।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মূসার জীবদ্দশায় দুজন ফেরাউনের মৃত্যু হয়েছে। মূসা যখন মাদায়েনে ছিলেন তখন একজন ফেরাউন মারা যান, এবং অপরজন ফেরাউন মারা যান মহাযাত্রার সময় সাগরের পানিতে ডুবে। স্পষ্টতই এ দুজন পৃথক পৃথক ফেরাউন। এ অবস্থায় মূসার আমলে মাত্র একজন ফেরাউন থাকার কথা মেনে নেয়া যেতে পারে না। অথচ ফাদার দ্য ফক্স একজন ফেরাউনের কথাই (দ্বিতীয় রামিসেস) বলেছেন। কিন্তু যেহেতু একজন ফেরাউন থাকলে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না সেহেতু ফাদার দ্য ফক্সের অনুমান সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না।

৩। দুই ফেরাউনের পরিচয়

জুলুমের ফেরাউন দ্বিতীয় রামিসেস এবং মহাযাত্রার ফেরাউন মারনেপতাহ। এ পার্থক্যটি যথেষ্ট স্পষ্ট।

মাসপেরো যে আলেকজান্দ্রিয়ান কিংবদন্তির উল্লেখ করেছেন পি মনটেট খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে তা ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, টলেমিদের স্বর্ণযুগে প্রাচীন ঐতিহাসিক দলীলাদি আলেকজান্দ্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হত, এবং রোমান বিজয়ের সময় তা ধ্বংস হয়ে যায়। সেই ক্ষতি এখন সকলেই গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন।

যাহোক ঐ একই বর্ণনা বহুকাল পরের ইসলামী কিংবদন্তি এবং খৃষ্টান কিংবদন্তিতেও পাওয়া গেছে। (লক্ষ্যণীয় যে, ধর্মীয় উপদেশর জন্য ব্যবহৃত বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচিত প্রাচীন ইতিহাসে এবং আরবী এইচ লেসটার রচিত ইতিহাসে মহাযাত্রার ঘটনাটি মারনেপতার রাজত্বকালে মিসরে ঘটেছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে)। মনটেট তাঁর "ইপিজপ্ট এন্ড দি বাইবেল নামক গ্রন্থে (প্রকাশক-ডিলাসক্স এন্ড নিসল, নিউশাতেল, ১৯৫৯) ঐ একই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর পোষকতায় অন্যান্য যুক্তিও আছে, বিশেষত কুরআনের বর্ণনায় তাঁর সমর্থন আছে, যদিও বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ মনটেট কুরআনের হাওয়ালা দেননি। কিন্তু এ সকল তথ্য বিবেচনার আগে আমরা প্রথমে বাইবেলের দিকেই নজর দেব।

যাত্রাপুস্তকে যদিও সংশ্লিষ্ট ফেরাউনের নামের উল্লেখ নেই, তবে "রামিসেস" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেলে হিব্রুদের জবর মেহনতে নির্মিত একটি শহরের নাম "রামিসেস" বলে বর্ণিত আছে। এখন অবশ্য আমরা জানি যে, ঐ শহরগুলি পূর্ব নীল উপত্যকার তানিস-কানতির অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় রামিসেস যে এলাকায় তাঁর উত্তরাঞ্চলীয় রাজধানী নির্মাণ করেন সেখানে আগেও কিছু দালানকোঠা ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক দশকের ভূতাত্ত্বিক খননকার্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় রামিসেসই স্থানটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত করেন এবং এ কাজে তিনি হিব্রুদের জবর মেহনতই ব্যবহার করেন।

বর্তমান যুগে বাইবেলে 'রামিসেস' শব্দটি পড়ে কেউ আর বিস্মিত হন না। দেড়শো বছর আগে শামপোলিয়ন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করে এ শব্দটির ব্যবহার নির্ণয় করেন এবং তখন থেকেই এ শব্দটি সকলের নিকট সাধারণ ভাবে পরিচিত। আমরা শব্দটি উচ্চারণ করতে, পড়তে এবং তার অর্থ উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, চিত্রলিপির মর্মার্থ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং বাইবেল ও কতিপয় গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তক ছাড়া অন্য কোথাও নামটি সংরক্ষিত নেই। এমন কি ঐ সকল পুস্তকেও নামটি কমবেশী বিকৃত আকারে দেখতে পাওয়া যায়। ট্যাসিটাস তাঁর 'অ্যানালস' গ্রন্থে শব্দটি 'রহামসিস' রূপে ব্যবহার করেছেন। একমাত্র বাইবেলেই শব্দটি সঠিক আকারে অর্থাৎ 'রামিসেস' রূপে দেখতে পাওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেন্ট অর্থাৎ তৌরাতের পাঁচ জায়গায় শব্দটির উল্লেখ আছে। আদিপুস্তক ৪৭, ১১; যাত্রাপুস্তক ১, ১১ ও ১২, ৩৭ এবং গণনাপুস্তক ৩৩, ৩ ও ৩৩, ৫।

হিব্রু ভাষায় রামিসেস শব্দটি দু ভাবে লিখিত দেখা যায় 'রাইমস' এবং রাইয়ামস (ইংরাজী 'ই' অক্ষরটি হিব্রু 'আইন' অক্ষরের সমপর্যায়ে ব্যবহৃত হয়)। বাইবেলের গ্রীক সংস্করণে শব্দটি 'রামিসে' হিসেবে লিখিত হয়েছে এবং ল্যাটিন সংস্করণে লিখিত হয়েছে 'রামিসেস' রূপে। ফরাসী ভাষার ক্লিমেনটাইন পাঠে (প্রথম সংস্করণ ১৬২১) শব্দটি

একইভাবে অর্থাৎ 'রামিসেস' হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। শামপোলিয়নের গবেষণার সময় ফরাসী ভাষার এ সংস্করণটিই চালু ছিল এবং তিনি তাঁর সামারি অব দি হাইরোগ্লিফিক সিসটেম অব দি এনসিয়েন্ট ইজিপশিয়ানস' নামক গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮২৮, ২৭৬ পৃষ্ঠা) শব্দটির বাইবেলে ব্যবহৃত বানানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাইবেলের হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন সংস্করণে রামিসেসের নাম অলৌকিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাইবেলের প্রাচীন সংস্করণে ভাষ্যকারগণ শব্দটির অর্থ আদৌ অনুধাবন করতে পারেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৬২১ সালের ফরাসী ভাষার ক্লিমেনটাইন বাইবেলে শব্দটির যে অর্থ দেয়া হয়েছে তা হাস্যকর। বলা হয়েছে রামিসেস শব্দের অর্থ 'হিংস্র প্রাণীর বজ'।

উপরের আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়ঃ

(ক) রামিসেস নামের কোন ফেরাউনের মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে মহাযাত্রা হয়নি এবং হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। উল্লেখযোগ্য যে, মিসরে রামিসেস নামে এগার জন রাজা ছিলেন।

(খ) যে ফেরাউন রামিসেস ও পিথম শহর নির্মাণ করেছিলেন তাঁর অর্থাৎ দ্বিতীয় রামিসেসের রাজত্বকালে মূসার জন্ম হয়েছিল।

(গ) মূসার মাদায়েনে অবস্থান কালে দ্বিতীয় রামিসেসের মৃত্যু হয় এবং মূসার জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বিতীয় রামিসেসের উত্তরাধিকারী মারনেপতাহর রাজত্বকালে ঘটে।

অধিকন্তু বাইবেলে আরও এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে যার ভিত্তিতে ফেরাউনদের ইতিহাসের ঠিক কোন পর্যায়ে মহাযাত্রা হয়েছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে। বাইবেলে আছে মূসা তার আশি বছর বয়সে তাঁর ভাইদের মুক্তি দেয়ার জন্য ফেরাউনকে রাজী করাতে চেষ্টা করেন। "মূসার বয়স যখন আশি এবং হারুণের তিরাশি তখন তাঁরা ফেরাউনের সঙ্গে কথা বলেন।" (মহাযাত্রা ৭, ৭)। বাইবেলে অন্যত্র (মহাযাত্রা, ২, ২৩) বলা হয়েছে যে, মূসার জন্মকালে যে ফেরাউন সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন তিনি মূসার মাদায়েনে অবস্থানকালে মারা যান। লক্ষ্যণীয় যে, বাইবেলে পরবর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনায় রাজার নামের কোন পরিবর্তন উল্লেখ করা হয়নি। এ দুটি বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মূসার মিসরে অবস্থানকালে যে দুজন ফেরাউন ছিলেন তাঁদের রাজত্বকালের মোট মেয়াদ কমপক্ষে আশি বছর ছিল।

দ্বিতীয় রামিসেসের রাজত্বকাল যে সাতষট্টি বছর ছিল তা প্রায় সঠিকভাবেই জানা যায়। ড্রিয়োটোন ও ভ্যানডিয়ারের হিসাব মতে এ মেয়াদ খৃষ্টপূর্ব ১৩০১ থেকে ১২৩৫ সাল পর্যন্ত এবং রৌটোনের হিসাব মতে খৃষ্টপূর্ব ১২৯০ থেকে ১২২৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় রামিসেসের উত্তরাধিকার মারনেপতাহর ক্ষেত্রে অবশ্য মিসরবিদগণ কোন

সঠিক তারিখ দিতে সক্ষম নন। তবে তাঁর রাজত্বকাল যে কমপক্ষে দশ বছর ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই কারণ ফাদার দ্য ফক্স উল্লেখ করেছেন যে, দশ বছরের প্রমাণ দলীল মতেই পাওয়া যায়। ড্রিয়োটোন ও ভ্যানডিয়ার দুটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন- খৃষ্টপূর্ব ১২৩৪ থেকে ১২২৪ পর্যন্ত দশ বছর, অথবা খৃষ্টপূর্ব ১২২৪ থেকে ১২০৪ পর্যন্ত বিশ বছর। মারনেপতহার রাজত্ব কিভাবে শেষ হয়েছিল সে সম্পর্কে মিসরবিদগণ কোন সুনির্দিষ্ট ইশারা দিতে পারেন না, তবে এটুকু সম্ভবতঃ বলা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর যাবত মিসরে গুরুতর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ছিল।

যাহোক এ সকল রাজত্বকালের মেয়াদ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় রামিসেস ও মারনেপতাহ ছাড়া বাইবেলের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অমন কোন দুজন ফেরাউনের সন্ধান পাওয়া যায় না যাঁদের রাজত্বকালের মোট মেয়াদ আশি বছর পূর্ণ হয়েছে অথবা তার চেয়ে বেশী হয়েছে। মূসা যখন হিব্রুদের উদ্ধার করেন তখন তাঁর বয়স আশি বছর ছিল, বাইবেলের এ তথ্য একমাত্র দ্বিতীয় রামিসেস ও তাঁর উত্তরাধিকারী মারনেপতাহর রাজত্বকালের সমষ্টিগত মেয়াদের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম সিথোস ও দ্বিতীয় রামিসেসের রাজত্বকালের মোট মেয়াদও প্রায় আশি বছর ছিল বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ মেয়াদটি আমাদের বিবেচনার প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু হিসেবে আসতে পারে না। কারণ, প্রথমত প্রথম সিথোসের রাজত্বকাল খুবই কম ছিল বিধায় মূসার যৌবনকালে মাদায়েনে সুদীর্ঘ অবস্থানের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত মূসার জীবনকালের দুজন ফেরাউনের মধ্যে প্রথম জনের রাজত্বকালে মূসা ঐ দীর্ঘ দিন মাদায়েনে ছিলেন বিধায় ঐ প্রথমজন ফেরাউন প্রথম মিথোস হতে পারেন না। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বরং এ সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, মূসা দ্বিতীয় রামিসেসের রাজত্বকালের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন, তার মাদায়েনে অবস্থানকালেই দ্বিতীয় রামিসেস সাতষট্টি বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তারপর দ্বিতীয় রামিসেসের পুত্র মারনেপতাহ সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি মিসরে ফিরে এসে এ নতুন ফেরাউনের কাছে হিব্রুদর উদ্ধারের ব্যাপারটি উত্থাপন করেন। মারনেপতাহ বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে যদি ধরা হয় তাহলে বলা যায় যে তাঁর কাছে মূসার হিব্রুদের উদ্ধারের প্রসঙ্গটি উত্থাপনের ঘটনা তাঁর রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধে ঘটেছিল। রৌটন এ সম্ভাবনাকেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছেন। কারণ তাহলে মূসা মারনেপতাহর রাজত্বকালের শেষভাগে মহাযাত্রা পরিচালনা করেন বলে ধরা যায়। এ অবস্থার বিপরীত কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না, কারণ বাইবেল ও কুরআন এ উভয় গ্রন্থ থেকেই আমরা জানতে পারছি যে, পলায়নপর হিব্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েই ফেরাউন নিহত হয়েছেন।

মূসার শৈশব এবং ফেরাউনের প্রাসাদে তাঁর আশ্রয় লাভের যে বর্ণনা ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় তার সাথে এ ঘটনাপ্রবাহ হুবহু মিলে যায়। দ্বিতীয় রামিসেস যে অতিশয়

বৃদ্ধ বয়সে মারা যান তা সর্বজনবিদিত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স নব্বই থেকে একশো বছরের মধ্যে ছিল। এ হিসেবে দেখা যায় যে তিনি তেইশ থেকে তেত্রিশ বছরের মধ্যবর্তী সময়কালে ফেরাউন হয়েছিলেন এবং সাতষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ফেরাউন হওয়ার আগেই বিয়ে করে থাকতে পারেন। সুতরাং তাঁর পরিবারের কোন সদস্যের মূসাকে কুড়িয়ে পাওয়া (কুরআন মতে), অথবা ফেরাউনের স্ত্রী কর্তৃক নীল নদের তীরে মূসাকে কুড়িয়ে পাওয়ার পর শিশুটিকে রাজপ্রাসাদে রাখার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনার ঘটনায় কোনই অসঙ্গতি নেই এবং এ ঘটনার বিপরীত কোন তথ্য বা বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। বাইবেলে বলা হয়েছে যে ফেরাউনের কন্যা মূসাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। ফেরাউন হওয়ার সময় দ্বিতীয় রামিসেসের যে বয়স ছিল তাতে সংশ্লিষ্ট সময়ে তাঁর একটি কিশোরী কন্যা থাকা বিচিত্র ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

এ প্রস্তাবনা কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এবং বাইবেলের একটিমাত্র বর্ণনার বিরোধী। বর্ণনাটি আমরা আগেই দেখেছি প্রথম রাজাবলি সহিফার ৬, ১ শ্লোকে লিখিত আছে (মিসর দেশ হইতে ইসরায়েল সন্তানদের বাহির হইয়া আসিবার পর চারিশত আশি বৎসরে ইসরায়েলের উপরে শলোমনের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে দ্বিতীয় মাসে শলোমন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন)। তবে উল্লেখযোগ্য যে এ সহিফা তৌরাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। এ বর্ণনাটি ব্যাপকভাবে বিতর্কিত এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের এ অংশে যে ঐতিহাসিক তথ্য আছে তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফাদর দ্য ফক্স সরাসরি বাতিল করে দিয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় যে বর্ণনায় সোলায়মানের ইবাদতগাহ নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে মহাযাত্রার তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে। বর্ণনাটি যেহেতু বিতর্কিত এবং সন্দেহযুক্ত সেহেতু উপরে বর্ণিত মহাযাত্রার ঘটনাপ্রবাহের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি হিসেবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শিলালিপির সমস্যা

ইহুদীদের পশ্চাদ্ধাবন করা মারনেপতাহর রাজত্বকালের সর্বশেষ কাজ বলে মহাযাত্রার যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, সমালোচকগণ তার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে করেন। তাঁরা মারনেপতাহর রাজত্বকালের পঞ্চম বছরের একখানি শিলালিপির উপরে নির্ভর করে এ আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন।

শিলালিপিখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চিত্রলিপির মধ্যে একমাত্র এ দলীলেই 'ইসরায়েল' শব্দটির উল্লেখ আছে এবং তার সঙ্গে এমন একটি গুণবাচক বিশেষণ আছে যা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শব্দটি কোন 'মানব গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়'-এর প্রতি প্রয়োগ

করা হয়েছে। শিলালিপিটি থিবিতে ফেরাউনের স্মৃতিমন্দির থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাতে লেখা ঘটনাবলীর বর্ণনা মারনেপতাহর রাজত্বকালের প্রথমদিক থেকেই শুরু হয়েছে। মিসরের প্রতিবেশী দেশসমূহের বিরুদ্ধে ফেরাউন মারনেপতাহ যে বিজয় লাভ করেন তার উল্লেখ লিপির শেষের দিকে একটি বিশেষ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে- "ইসরায়েল ধ্বংস করেন এবং তার কোন বীজ আর অবশিষ্ট নেই।" এ বর্ণনার ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে যে, 'ইসরায়েল' শব্দটির ব্যবহার থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, ইহুদীরা আগেই অর্থাৎ মারনেপতাহর রাজত্বের পঞ্চম বছরের মধ্যেই কেনানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। সুতরাং মিসর থেকে তাদের মহাযাত্রা আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

এ প্রস্তাবনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এ আপত্তি মেনে নিতে হলে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে ইহুদীরা আগে কখনই কেনানে বাস করত না এবং তারা সর্বদা মিসরেই ছিল। সুতরাং এ আপত্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ফাদার দ্য ফক্স দ্বিতীয় রামিসেসকে মহাযাত্রাকালীন ফেরাউন বলে গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর "দি এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি অব ইসরায়েল" নামক গ্রন্থে ইহুদীদের কেনানে বসতি স্থাপন সম্পর্কে বলেছেনঃ "ইসরায়েলীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সম্প্রদায়গুলির দক্ষিণে কাদেশ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না এবং এ বসতি মহাযাত্রার আগের আমলের।" সুতরাং তিনি এ সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের আগেও কিছু লোক মিসর ত্যাগ করেছিল। আপিরু বা হাবিরু নামে অভিহিত লোকেরা (যাদের কখনও কখনও ইসরাইলের বলে সনাক্ত করা হয়) দ্বিতীয় রামিসেস ও মহাযাত্রার অনেক আগে থেকেই সিরিয়া-ফিলিস্তিনে বাস করত এবং দ্বিতীয় আমিনোফিস যে ৩৬০০ জন বন্দীকে জবরমজুর হিসেবে মিসরে ফিরিয়ে এনেছিলেন আমাদের কাছে তার দালিলিক প্রমাণ আছে। তাছাড়া প্রথম সিথোসের আমলে কেনানে এ ধরনের আরও লোক ছিল এবং তারা বেথশিয়ান অঞ্চলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল। পি মনটেট তাঁর "ইজিপ্ট এন্ড দি বাইবেল" নামক গ্রন্থে এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে মারনেপতাহ সীমান্তের এসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং দেশের ভিতরে যারা ছিল তারা মূসার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে পরে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এ অনুমান মারনেপতাহর রাজত্বের পঞ্চম বছরের শিলালিপির বর্ণনার সঙ্গে আদৌ অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। পরস্পর বিরোধীও নয়।

তদুপরি ইহুদী জাতির ইতিহাসে 'ইসরায়েল' শব্দটি উল্লেখিত থাকার সঙ্গে মূসা ও তাঁর অনুসারীদের কেনানে বসতি স্থাপনের ধারণার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ইসরায়েল শব্দটির উৎস নিম্নরূপঃ

আদিপুস্তক (৩২,২৯) মতে ইসরায়েল হচ্ছে ইব্রাহীমের পৌত্র এবং ইসহাকের পুত্র ইয়াকুবের দ্বিতীয় নাম। 'একুমেনিক্যাল ট্রানশ্লেশন অব দি বাইবেল- ওল্ড টেস্টামেন্ট

(১৯৭৫) গ্রন্থের ভাষ্যকারগণ মনে কনে যে, শব্দটির অর্থ সম্ভবত 'আল্লাহ তাঁর শক্তিতে প্রকাশিত হলেন।' এ নামটি যেহেতু একজন মানুষকে দেয়া হয়েছিল সেহেতু তাঁর স্মৃতিতে তাঁর বংশধরদের ঐ নামে অভিহিত হওয়া বিচিত্র নয়।

সুতরাং 'ইসরায়েল' নামটি মূসার কয়েকশত বছর আগেই চালু ছিল। সেহেতু ফেরাউন মারনেপতাহর আমলের শিলালিপিতে থাকার কারণেই মারনেপতাহর রাজত্বের পঞ্চম বছরের আগেই মহাযাত্রা হয়েছিল বলে ধরে নেয়ারও কোন যুক্তি নেই।

শিলালিপিতে 'ইসরায়েল' নামে বর্ণিত একদল লোকের কথা বলা হয়েছে মাত্র। তাতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কোন ইশারা থাকতে পারে না। কারণ শিলালিপিটি খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর আগে ইসরায়েল রাজ্য আদৌ গঠিতই হয়নি। সুতরাং শিলালিপিতে কোন স্বল্প সংখ্যক লোকের সমপ্রদায়ের কথা বলা হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জেরুসালেম বাইব্লিক্যাল স্কুলের প্রফেসর ফাদার বি কেরিয়ার তাঁর 'বুক অব এক্সাডাস'-এর তরজমার ভাষ্যে (প্রকাশক-এডিশনস দ্যু সার্ক, প্যারিস, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১২) বলেছেনঃ "শিলালিপির অন্যান্য নামের সঙ্গে 'দেশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ইসরায়েল নামের সঙ্গে 'সম্প্রদায়' ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন আমরা জানি যে, আট অথবা নয় শতাব্দী যাবত প্রস্তুতি কালের পর 'ইসরায়েল ইতিহাসে প্রবেশ করেছে। ঐ সময়ে বহু আধা যাযাবর সম্প্রদায় বিশেষত আমোরাইট ও আরামিয়ান সম্প্রদায় সমগ্র এলাকায় বসতি স্থাপন করে। একই সময় ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব ইসরায়েলসহ অনেক গোত্রপতির আবির্ভাব হয়। ইয়াকুবের অপর নাম 'ইসরায়েল' নামে তাঁর গোত্র পরিচিতি লাভ করে এবং এ গোত্রই পরে, মারনেপতাহর রাজত্বকালের অনেক পরে একটি রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বিকশিত হয়। কেননা ইসরায়েল রাজ্য খৃষ্টপূর্ব ৯৩১ বা ৯৩০ থেকে ৭২১ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল।

৪। মহাযাত্রায় ফেরাউনের মৃত্যু বিষয়ে ধর্মগ্রন্থের বিবরণঃ

মহাযাত্রার সময় ফেরাউনের মৃত্যুর ঘটনাটি কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উভয় গ্রন্থের মূল পাঠেই বিষয়টি লক্ষ্যণীয়ভাবে উপস্থিত আছে। বাইবেলে কেবলমাত্র পেনটাটিউক বা তৌরাতেই নয়, গীতসংহিতা অধ্যায়েও বিষয়টির উল্লেখ আছে এবং এ প্রসঙ্গটি পূর্বেও একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, খৃষ্টান ভাষ্যকারগণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। ফাদার দ্য ফক্স বলেছেন যে, মিসর থেকে যে মহাযাত্রা হয়েছিল তা দ্বিতীয় রামিসেসের রাজত্বকালের প্রথমার্ধে বা মধ্যভাগে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বোধহয় লক্ষ্য করেননি যে ঐ ফেরাউন মহাযাত্রার সময়ই মারা গিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, মহাযাত্রা তাঁর রাজত্বের শেষভাগেই হয়েছিল। অথচ বাইবেলের তৌরাত ও

গীতসংহিতায় প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য যে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয় এ বিষয়ে জেরুসালেম বাইব্লিক্যাল স্কুলের প্রধান ও এনসিয়েন্ট হিস্ট্রী অব ইসরায়েল গ্রন্থের লেখক আদৌ চিন্তিত নন।

পি মনটেট তাঁর ইজিপ্ট এন্ড দি বাইবেল গ্রন্থে বলেছেন যে, মহাযাত্রা মারনেপতাহর আমলে হয়েছিল। কিন্তু হিব্রুদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউনের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি।

খৃষ্টানদের এ অতিশয় আশ্চর্যজনক মনোভাব ইহুদীদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিরোধী। গীতসংহিতার ১৩৬, ১৫ স্তোত্রে আল্লাহকে স্মরিয়া জানানো হয়েছে, কেননা তিনি "ফরৌন ও তাহার বাহিনীকে সুফ সাগরে নিমজ্জিত করিলেন।" ইহুদীদের প্রার্থনায় এ স্তোত্রটি হামেশা পাঠ করা হয়ে থাকে। খৃষ্টানগণ আরও জানেন যে, গীতসংহিতার এ বর্ণনার সঙ্গে যাত্রাপুস্তক ১৪, ২৮-২৯ স্তোত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে- "জল ফিরিয়া আসিল ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফরৌনের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না।" সুতরাং ফেরাউন ও তার বাহিনী যে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল সে সম্পর্কে তাদের মনে কোনই সন্দেহ থাকার কথা নয় এবং এসব কথা তাদের বাইবেলেই রয়েছে।

অথচ খৃষ্টান ভাষ্যকারগণ সকল সাক্ষ্য প্রমাণের বিপরীত উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ফেরাউনের মৃত্যুর ঘটনাটি উপেক্ষা করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার আরও এক কদম এগিয়ে গিয়ে কুরআনে বর্ণিত ঘটনাটির উল্লেখ করে পাঠকদের আজগুবি ধারণায় প্ররোচিত করে থাকেন। জেরুসালেম বাইব্লিক্যাল স্কুলের অনুমোদিত ও প্রকাশিত বাইবেলের তরজমায় (ল্য এক্সোড-এক্সোডাস ১৯৬৮, ৭৩ পৃষ্ঠা, প্রকাশক- লেস এড্রিশনস ড্যু সার্ফ, প্যারিস) ফাদার কৌরয়্যার ফেরাউনের মৃত্যু সম্পর্কিত ভাষ্যে বলেছেন- "কুরআনে (সূরা ১০, আয়াত ৯০-৯২) এ ঘটনাটির (ফেরাউনের মৃত্যু) উল্লেখ আছে, এবং জনপ্রিয় প্রবাদ আছে যে, সেনাবাহিনী সহ নিমজ্জিত ফেরাউন (হোলি টেক্সটে যার কোন উল্লেখ নেই) সমুদ্রের তলদেশে বাস করেন এবং সেখানকার মানুষ অর্থাৎ সিলমাছদের রাজা হিসেবে রাজত্ব করেন।"

"হোলি টেক্সট" বা পবিত্র পাঠ বলতে ভাষ্যকার সাহেব স্পষ্টতই বাইবেলের কথা বলেছেন, এবং সেই গ্রন্থে সেনাবাহিনীসহ ফেরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ নেই বলে একটি উদ্দেশ্যমূলক অসত্য বলেছেন। দ্বিতীয়, কুরআনের বর্ণনাটির উল্লেখ তিনি এমনভাবে করেছেন যাতে মনে হয় যে, ঐ বর্ণনা বাইবেলের সম্পূর্ণ বিরোধী। তৃতীয়, কুরআনের বর্ণনার উল্লেখ করার পরই তিনি তথাকথিত জনপ্রিয় প্রবাদের নামে একটি আজগুবি কাহিনীর অবতারণা এমনভাবে করেছেন যার ফলে অসতর্ক সাধারণ পাঠক এবং বিশেষত কুরআনের অনবহিত পাঠকের মনে এরূপ একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে যে, কুরআনের বর্ণনার সঙ্গে ঐ আজগুবি কাহিনীর সম্পর্ক আছে। অথচ ঐ

ভাষ্যকার সাহেব যেদিকে ইশারা করেছেন কুরআনের আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। কুরআনের ১০ সূরার (ইউনুস) ৯০-৯২ আয়াতে জানানো হয়েছে যে, ফেরাউন ও তাঁর বাহিনী যখন পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন তখন ইসরায়েল সন্তানগণ সাগর পার হয়ে যায় এবং ফেরাউন নিমজ্জিত হওয়ার সময় আর্তনাদ করে বলেন- "আমি বিশ্বাস করিলাম যে, বনি ইসরাঈল যাঁহাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।" আল্লাহ জবাব দিলেন "এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহ চরাভূমিতে রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক।"

ফেরাউনের মৃত্যু সম্পর্কে সূরায় এ বর্ণনাটুকুই আছে। এ সূরায় অথবা কুরআনের অন্যত্র কোথাও বাইবেলের ভাষ্যকার বর্ণিত ঐ আজগুবি কিচ্ছা নেই। কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের দেহ রক্ষা করা হবে এবং এ তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআন যখন নাজিল হয় তখন মহাযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে (সঠিকভাবে বা বেঠিকভাবে) বর্তমানে বিবেচিত সকল ফেরাউনের লাশ লুকসর থেকে নীল নদের অপর পারে অবস্থিত থিবিসের গোরস্তানে কবরে ছিল। কিন্তু তখন এ খবর কারও জানা ছিল না এবং অনেক দিন পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐ কবরগুলি আবিষ্কৃত হয়। কুরআনে যেমন বলা হয়েছে, মহাযাত্রাকালীন ফেরাউনের লাশ সত্যিই উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁর নাম যাই হোক না কেন কায়রোর মিসরীয় যাদুঘরের রাজকীয় মমিঘরে এখন যে কেউ সেই লাশ দেখতে পারেন। সুতরাং ফাদার কৌরয়্যার কুরআনের সঙ্গে যে কিচ্ছা জুড়ে দিতে চেয়েছেন সত্য ঘটনা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৫। ফেরাউন মারনেপতাহর মমি

সকল সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, লোরেট ১৮৯৮ সালে রাজাদের উপত্যকায় (কিংস ভ্যালি) থিবিসে দ্বিতীয় রামিসেসের পুত্র ও মহাযাত্রাকালীন ফেরাউন মারনেপতাহর মমিভূত লাশ আবিষ্কার করেন এবং সেখান থেকে তা কায়রোয় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯০৭ সালের ৮ই জুলাই তারিখে এলিয়ট স্মিথ এ মমির আবরণ অপসারণ করেন এবং তিনি তাঁর "দি রয়্যাল ম্যামিজ" নামক গ্রন্থে (১৯১২) এ প্রক্রিয়া এবং লাশ পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কয়েকটি জায়গায় কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ম্যামিটি তখন সন্তোষজনকভাবেই সংরক্ষিত ছিল এবং তখন থেকেই তা মাথা ও গলা খোলা এবং অবশিষ্ট দেহ কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় দর্শকদের দেখার জন্য কায়রো যাদুঘরে রাখা আছে। সম্ভবত ক্ষতি হওয়ার আশংকায় লাশের ঢাকা অংশটি আর খুলতে দেয়া হয় না এবং সেই ১৯১২ সালে এলিয়ট স্মিথের তোলা ছবি ছাড়া পুরো

লাশের আর কোন ছবি যাদুঘরে নেই।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে মিসরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ মেহেরবাণী করে আমাকে লাশের ঢাকা অংশ খুলে পরীক্ষা করার এবং ছবি তোলার অনুমতি দেন। মমিটির বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ষাট বছর আগের অবস্থার তুলনা করলে পরিস্কার বুঝা যায় যে অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং কিছু কিছু টুকরো এখন আর আদৌ নেই। লাশের মমিকরা অনেক টিস্যু কোথাও মানুষের হাতে এবং কোথাও সময়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে এ ক্ষতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আবিষ্কৃত হওয়ার আগে মমিটি তিন হাজার বছরেরও বেশী সময় যাবত থিবিসের গোরস্তানে কবরে ছিল। বর্তমানে মমিটি একটি সাধারণ কাঁচের আবরণে রাখা আছে। ফলে বাতাস সূক্ষ্ম কণা প্রভৃতি বাইরের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে সুরক্ষিত নয়। তদুপরি তাপমাত্রার উঠানামা এবং বাতাসের আর্দ্রতার মওসুমী পরিবর্তনও তার উপরে প্রতিনিয়ত প্রভাব ফেলছে। প্রায় তিন হাজার বছর যাবত মমিটি যে পরিবেশে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ছিল বর্তমান পরিবেশ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার গায়ে জড়ানো আবরণের সেই প্রতিরোধ এখন আর নেই। কবরের বদ্ধ অবস্থায় তাপমাত্রা মোটামুটি একই প্রকারের ছিল, বাতাসও অনেক কম আর্দ্র ছিল; কিন্তু বছরের কোন কোন সময় কায়রোর আবহাওয়া ঠিক অমন থাকে না। কবরে থাকার সময় সম্ভবত সেই প্রাচীনকালে গুপ্তধন সন্ধানী তস্করেরা হয়ত কিছুটা ক্ষতি করে থাকতে পারে, কীটের আক্রমণও হয়ে থাকতে পারে; তবে অবস্থা দেখে মনে হয় বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেই তুলনায় মমিটি তখন অনেক অনুকূল পরিবেশে ছিল।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে আমার সফরকালে আমার সুপারিশক্রমে কর্তৃপক্ষ মমিটি বিশেষভাবে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেন। ডাঃ আল-মেলিজি ও ডাঃ রামসাইস মমির এক্সরে ছবি তোলেন এবং তার ভিত্তিতে তাঁদের অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। ডাঃ মর্নিয়ালাবি পেট পরীক্ষা করেন এবং গলার কাছের একটি গতিপথে বুকের অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করে দেখেন। এটাই ছিল কোন মমির ক্ষেত্রে এনডোসকোপি প্রক্রিয়ার প্রথম ব্যবহার। তার ফলে আমরা দেহের অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা ভালভাবে দেখতে এবং তার ছবি তুলতে সক্ষম হই। এছাড়া প্রফেসর সিকালডি একটি সাধারণ চিকিৎসা ও আইন শাস্ত্রীয় পরীক্ষাও শুরু করেছেন। মমির দেহ থেকে আপনা-আপনি খসে পড়া আবরণখন্ড অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার পর সমগ্র প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হবে। প্রফেসর মাইনট ও ডাঃ ডুরিগণ এ পরীক্ষা চালাবেন। এ গ্রন্থ ছাপাখানায় পাঠানোর সময় (প্রথম ফরাসী সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৭৫) পরীক্ষার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়নি। সুতরাং তার ফলাফল এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হল না।

তবে ইতিমধ্যে এটুকু নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে যে, হাড়ের স্থানে স্থানে ক্ষতের চিহ্ন আছে এবং স্থানবিশেষে হাড়ের অংশবিশেষ নেই। এ অবস্থা ফেরাউনের মৃত্যুর আগে না পরে হয়েছে তা এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যু ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা মুতাবিক পানিতে ডুবে থাকতে পারে, অথবা ডুবে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে ভীতিপ্রসূত মারাত্মক মানসিক আঘাতজনিত কারণে হয়ে থাকতে পারে, অথবা উভয় প্রকারের সম্মিলিত কারণে হয়ে থাকতে পারে।

উপরে বর্ণিত মমির সংরক্ষণের অসুবিধা এবং বিশেষত হাড়ের ক্ষতির ব্যাপারটি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে পারে। ফলে অবিলম্বে ক্ষয় প্রতিরোধ এবং সংরক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে মমিটি বোধ হয় বেশী দিন অক্ষত অবস্থায় রাখা যাবে না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মহাযাত্রায় ফেরাউনের মৃত্যু ও তাঁর লাশ উদ্ধার যে আল্লার হুকুমেই হয়েছে, এ মমিই তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। সুতরাং সময়ের পরিক্রমায় এ সাক্ষ্য-প্রমাণ যাতে হারিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক চিহ্ন-দ্রব্য সংরক্ষণ করা মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য। কিন্তু এ মমিটির ক্ষেত্রে সেই কর্তব্য অনেক বেশী বড় ও ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এ মমি হচ্ছে এমন একজন মানুষের লাশের বাস্তব উপস্থিতি যিনি মূসাকে চিনতেন, তাঁর হেদায়েত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাঁর পলায়নকালে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন এবং সেই প্রক্রিয়ায় প্রাণ হারিয়েছিলেন। আর কুরআনের বর্ণনা মুতাবিক তাঁর লাশ পরবর্তী মানুষের জন্য চিহ্ন হওয়ার নিমিত্ত আল্লাহর হুকুমে ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

মারনেপতাহর মমির মত মূসার কাহিনীর আর একজন চাক্ষুস সাক্ষী দ্বিতীয় রামিসেসের মমিও সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

[ইংরেজী অনুবাদকের টিকা-১৯৭৫ সালে কায়রোতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় তার ফলাফল হাতে পাওয়ার পর গ্রন্থকার ডাঃ মরিস বুকাইলি ১৯৭৬ সালের প্রথম ভাগে ন্যাশনাল একাডেমি অব মেডিসিনসহ কতিপয় ফরাসী জ্ঞানী সমিতির সভায় তা পড়ে শুনান। এ পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মিসর সরকার চিকিৎসার জন্য দ্বিতীয় রামিসেসের মমি ফ্রান্সে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করেন। সেই মুতাবিক মমিটি ১৯৭৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্যারিসে পৌঁছেছে।]

ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার সত্যতার পোষকতায় যারা আধুনিক তথ্যের সন্ধান করেন তাঁরা কায়রোর মিসরীয় যাদুঘরের রয়্যাল ম্যমিজ রুমে গেলেই ফেরাউনের লাশ সম্পর্কিত আল-কুরআনের আয়াতের বাস্তব চিত্র দেখতে পাবেন।

কুরআন হাদীস ও আধুনিক বিজ্ঞান

ইসলামে কুরআনই বিধি-বিধানের একমাত্র উৎস নয়। মুহাম্মদের (সঃ) জীবন কালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে বিধিমূলক সম্পূরক তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

শুরু থেকেই হাদীস লিখিত আকারে আসার প্রচলন থাকলেও বহু হাদীস মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেও এসেছে। যাঁরা হাদীস সংগ্রহ করে একত্রিত করেছেন তাঁরা কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করার আগে অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে তদন্ত করেছেন এবং নির্ভুল তথ্য নির্ণয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। নবীর কথার সকল নির্ভরযোগ্য সংকলনেই প্রথমে যিনি তাঁর পরিবারের সদস্য বা তাঁর সাহাবী অর্থাৎ সঙ্গীর কাছ থেকে ঐ উক্তি শুনেছেন তাঁর নাম থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল বর্ণনাকারীর নামই লাগাতর ভাবে পাওয়া যায় এবং একমাত্র এ ঘটনা থেকেই সংগ্রহকারীর নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এভাবে মুহাম্মদের (সঃ) বহু কথা ও কাজের বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে। এগুলি হাদীস নামে পরিচিত। হাদীস শব্দের অর্থ "উক্তি" কিন্তু তাঁর কাজের বিবরণও হাদীস নামে অভিহিত করার রেওয়াজ আছে।

মুহাম্মদের (সঃ) ইন্তিকালের পরবর্তী কয়েক দশকে এরূপ কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ দুশো বছর পরেও প্রকাশিত হয়। সর্বাধিক নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বর্ণনা পাওয়া যায় আল-বুখারী ও মুসলিম নামক সংগ্রহে এবং এ দুখানি সংগ্রহও মুহাম্মদের (সঃ) ইন্তিকালের দুশো বছর পরে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মুহাম্মাদ মুহসিন খান এ সংগ্রহের আরবী-ইংরেজী প্রভাষিক সংকলন প্রস্তুত করেছেন (প্রকাশক- শোঠি ট্রু বোর্ড মিলস (কনভার্সন) লিমিটেড এবং তালিম-উল-কুরআন ট্রাস্ট, গুজরানওয়ালা ক্যান্টনমেন্ট, পাকিস্তান। সহি আল-বুখারী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১)। কুরআনের পর বুখারীর সংগ্রহই সাধারণত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। হৌদাস ও মারকাইস এ সংগ্রহটি 'লেস ট্রাডিশনস ইসলামিকস' (ইসলামিক ট্রাডিশনস) নামে ফরাসী ভাষায় তরজমা (১৯০৩-১৯১৪) করেন। ফলে যাঁরা আরবী জানেন না তাঁদের কাছে এখন হাদীস বোধগম্য হয়েছে। তবে এ ফরাসী তরজমাসহ ইউরোপীয়দের করা কতিপয় তরজমা সম্পর্কে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণ তাতে এমন কিছু ভুল ও অসত্য আছে যা তরজমাগত কারণে না হয়ে ব্যাখ্যাগত কারণে ঘটেছে। ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট হাদীসের অর্থ এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে যে, মূল হাদীসে যা নেই তরজমায় সেই ধারণা আরোপ করা হয়েছে।

উৎসের ব্যাপারে কতিপয় হাদীস ও গসপেলের ক্ষেত্রে একটি সাদৃশ্য দেখা যায়।

তা হচ্ছে এই যে, সংগ্রাহকদের কেউ বর্ণিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না এবং ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক দিন পরে তাঁরা তার বর্ণনা লিখেছেন। গসপেলের মতই সকল হাদীস নির্ভুল বলে গ্রহণ করা হয়নি। কেবল অল্প সংখ্যক হাদীস মোটামুটিভাবে বিশেষজ্ঞদের অনুমোদন লাভ করেছে। ফলে আল-মুয়াত্তা, সহি মুসলিম ও সহি আলবুখারী ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় যে, একই গ্রন্থে নির্ভুল বলে অনুমিত হাদীসের পাশাপাশি এমন হাদীসও স্থান পেয়েছে যা সন্দেহজনক অথবা এমন কি সরাসরি বাতিলযোগ্য।

ক্যানোনিক গসপেলের ক্ষেত্রে আধুনিক পন্ডিতগণ অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করলেও উর্ধতন খৃষ্টধর্মীয় কর্তৃপক্ষ কখনও তার নির্ভুলতা বিষয়ে প্রশ্ন করেননি। পক্ষান্তরে ইসলামের আদি যুগেই বিশেষজ্ঞগণ সর্বাধিক নির্ভুল বলে বিবেচিত হাদীসেরও বিস্তারিত সমালোচনা করেছেন। অবশ্য বিচারের কষ্টিপাথর মূল গ্রন্থ কুরআন সম্পর্কে কেউ কখনও কোন প্রশ্ন করেননি।

যে সকল বিষয়ে পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কারণে ব্যাখ্যা ও তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সেই সকল বিষয় মুহাম্মদ (সঃ) লিখিত অহির বাইরে কিভাবে প্রকাশ করেছেন, তা দেখার জন্য আমি নিজে হাদীস সাহিত্যের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছি। সহি মুসলিম নির্ভুল হলেও আমি আমার পরীক্ষায় সর্বাধিক নির্ভুল বলে বিবেচিত আল-বুখারী বেছে নিয়েছি। আমি সর্বদা স্মরণ রাখতে চেষ্টা করেছি যে, হাদীস যাঁরা সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের অপরের মৌখিক বর্ণনার উপরে আংশিকভাবে নির্ভর করতে হয়েছে এবং বর্ণনাকারীর ভুল বা নির্ভুলতাসহ তাঁরা ঐ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এভাবে লিখিত হাদীস একই বিষয়ে বহুলোকের বর্ণিত হাদীস থেকে পৃথক এবং এ বহুলোকের বর্ণিত হাদীস নিঃসন্দেহে নির্ভুল। (সহি মুসলিম গ্রন্থে প্রথম শ্রেণীর হাদীসকে জান্নি বা সন্দেহজনক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসকে কাতি বা নির্ভুল বলা হয়েছে)।

কুরআনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনা করে আমি যে ফলাফলে উপনীত হয়েছি, তার সঙ্গে হাদীসের বর্ণনা মিলিয়ে দেখেছি। তার ফল খুবই নৈরাশ্যজনক। বিজ্ঞানের মুকাবিলায় কুরআনের বর্ণনা সর্বদাই নির্ভুল পাওয়া যায়। কিন্তু মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক হাদীসের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক তথ্যের মুকাবিলায় সন্দেহজনক বলে দেখা যায়। এখানে আমি অবশ্য কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক হাদীসই পরীক্ষা করে দেখেছি।

কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যামূলক হাদীসের বেলায় ক্ষেত্রবিশেষে এমন ভাষ্য দেয়া হয়েছে যা বর্তমান যুগে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

সূরা ইয়াসিনের ৩৮ আয়াতে সূর্য সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তার গুরুত্ব ও সবিশেষ তাৎপর্য আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। ঐ আয়াতে বলা হয়েছে- "সূর্য আবর্তন করে তার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে।" অথচ একটি হাদীসে এ ব্যাপারটি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- "অস্ত গিয়ে সূর্য... আরশের নিচে পৌঁছে সিজদা করে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার

অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয় এবং তারপর এমন এক দিন আসবে যখন সে সিজদার উপক্রম করবে... পুনরায় তার নিজস্ব পথে চলার (উদিত হওয়ার) অনুমতি চাইবে... তখন তাকে যে পথে এসেছে সেই পথে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং সে তখন পশ্চিম দিকে উদিত হবে..." (সহি আল বুখারী, কিতাবু বাদউল খালক বা আদি সৃষ্টির গ্রন্থ, চতুর্থ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, ৫৪ অংশ, চতুর্থ অধ্যায়, ৪২১ নম্বর)। মূল পাঠটি অস্পষ্ট এবং তার অনুবাদ করা কঠিন। তবে এ বর্ণনায় যে উপমামূলক কাহিনী আছে তাতে সূর্যের পৃথিবী পরিক্রমার একটি ধারণা পাওয়া যায়। এ ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিপন্থী। সুতরাং এ হাদীসটির সঠিকতা সন্দেহজনক।

ঐ একই গ্রন্থে (সহি আল বুখারী, কিতাবু বাদউল খালক বা আদি সৃষ্টির গ্রন্থ, চতুর্থ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, ৫৪ অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৪৩০ নম্বর) মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি সময়ের হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মানব দেহের উপাদানগুলি শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার জন্য চল্লিশ দিন, 'যাহা লাগিয়া থাকে' পর্যায়ের জন্য আরও চল্লিশ দিন, এবং 'চর্বিত গোশত' পর্যায়ের জন্য তৃতীয় চল্লিশ দিন। তারপর ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় তার তকদির নির্ধারিত হওয়ার পর তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দেয়া হয়। ভ্রূণের ক্রমবিকাশের এ বিবরণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে মেলে না।

আরোগ্যের সহায়ক হিসেবে (রোগের নাম উল্লেখ না করে) মধুর সম্ভাব্য ব্যবহার সম্পর্কে একটি মাত্র মন্তব্য (সূরা নাহল, আয়াত ৬৯) ছাড়া কুরআনে রোগের প্রতিকার সম্পর্কে আদৌ কোন উপদেশ দেয়া হয়নি। অথচ হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সহি আল-বুখারীর একটি সম্পূর্ণ অংশই (৭৬ অংশ) ঔষধ বিষয়ক। এ অংশটি হৌদাস ও মারকাইসের ফরাসী তরজমায় চতুর্থ খন্ডের ৬২ থেকে ৯১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং ডক্টর মুহাম্মদ মুহসিন খানের দ্বিভাষিক আরবী-ইংরেজী সংস্করণে সপ্তম খন্ডের ৩৯৫ থেকে ৪৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ দীর্ঘ বিবরণে যে অনেক অনুমানভিত্তিক হাদীস আছে সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। তবে এ বিবরণের একটি গুরুত্ব আছে- তৎকালে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ধারণা পোষণ করা সম্ভব ছিল তার একটি পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। এ সঙ্গে আল-বুখারীর অন্যান্য অধ্যায়ে চিকিৎসার প্রাসঙ্গিক যে সকল হাদীস আছে তাও যোগ করা যায়।

এভাবেই আমরা কুনজর, ভূতে-ধরা ও ভারণ-তাড়ন বিষয়ক বিবরণ পাই। অবশ্য এ ব্যাপারে পয়সার বিনিময়ে কুরআনের ব্যবহার নিষেধ আছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর দিন-তারিখ যাদুর বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে এবং বিষধর সাপের বিরুদ্ধে যাদু প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঔষধ এবং তার সঙ্গত ব্যবহারের সম্ভাবনা যখন প্রায় ছিল না তখন সেই আমলে স্বাভাবিক ভাবেই নানাপ্রকার টোটকার প্রচলন ছিল। রক্ত ঝরানো, আগুনে সেক দেয়া, উকুনের উৎপাতে মাথা

কামানো, উটের দুধ ও নানাবিধ জীব ও গাছ গাছড়ার ব্যবহার যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্য তালপাতার মাদুর পুড়িয়ে সেই ছাই ক্ষতস্থানে লাগানো হত। জরুরী পরিস্থিতিতে তৎকালীন বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। তবে উটের পেশাব পান করতে বলা বোধহয় খুব একটা ভাল কাজ ছিল না।

বিভিন্ন রোগের ব্যাপারে হাদীসে যে ব্যাখা পাওয়া যায় আজকের দিনে তা সঠিক বলে মেনে নেয়া দুষ্কর। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারেঃ

জ্বরের উৎসঃ "দোযখের উত্তাপ থেকেই জ্বর হয়" এ বক্তব্যের সমর্থনে চারটি বর্ণনা আছে (আল-বুখারী, কিতাবুল তিব, সপ্তম খন্ড, ২৮ অধ্যায়, ৪১৬ পৃষ্ঠা)।

- প্রত্যেক রোগের প্রতিকার আছেঃ "আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি যার প্রতিকারও তিনি সৃষ্টি করেননি" (ঐ, প্রথম অধ্যায়, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)।

এ ধারণাটি মাছি বিষয়ক হাদীসে উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে- "কোন পাত্রে মাছি পড়লে সম্পূর্ণ মাছিটি পাত্রে ডুবিয়ে ফেলে দাও, কারণ তার এক পাখায় রোগ এবং অপর পাখায় রোগের প্রতিকার আছে (ঐ, ১৫-১৬ অধ্যায়, ৪৫২-৪৫৩ পৃষ্ঠা, এবং কিতাবু বাদউল খালক, ৫৪ অংশ, ১৫-১৬ অধ্যায়)।

- সাপের নজরে গর্ভপাত হয় (অন্ধও হতে পারে)। (ঐ, কিতাবু বাদউল খালক, চতুর্থ খন্ড, ১৩-১৪ অধ্যায়, ৩৩৩-৩৩৪ পৃষ্ঠা)।

- দুই ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তপাতঃ এ বিষয়ে হাদীস আছে (ঐ, কিতাবুল হায়েজ, ষষ্ঠ খন্ড; ৬ অংশ, ২১ ও ২৮ অধ্যায়, ৪৯০ পৃষ্ঠা)। একটি হাদীসে রক্তক্ষরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, রক্তনালী থেকে রক্তপাত হয়। অপর হাদীসে একজন নারীর সাত বছর যাবৎ ঐ রোগ ভোগের বিষয় উল্লেখ করে ঐ একই কারণ বর্ণিত হয়েছে। এখন শুধু অনুমান করাই সম্ভব, কিন্তু তখন ঐভাবে কারণ নির্ণয়ের অনুকূলে যে কি যুক্তি ছিল তা জানা সম্ভব নয়। তবে কারণটি হয়ত সঠিক ছিল। এ রোগ রক্তপ্রদর নামে পরিচিত।

- রোগ সংক্রামক নয়ঃ এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে সাধারণ বর্ণনা ছাড়াও (ঐ, কিতাবুল তিব, সপ্তম খন্ড, ৭৬ অংশ, ১৯, ২৫, ৩০, ৩১, ৫৩ ও ৪৫ অধ্যায়) কয়েকটি নির্দিষ্ট রোগের কথা বলা আছে- কুষ্ঠ (৪০৮ পৃষ্ঠা), প্লেগ (৪১৮ ও ৪২২ পৃষ্ঠা)। ও উটের পাঁচড়া (৪৪৭ পৃষ্ঠা)। কিন্তু রোগ সংক্রামক নয় বলা হলেও তার পাশাপাশি আবার প্লেগ রোগের এলাকায় না যাওয়ার এবং কুষ্ঠরোগীর কাছ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

এ অবস্থার কারণে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে, এমন কিছু হাদীস আছে যা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতীয় হাদীসের আসল হওয়া সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তথাপি এ হাদীসগুলির উল্লেখ করার একটি প্রয়োজনীয়তা আছে। উপরে কুরআনের যে আয়াতগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার মুকাবিলায় এগুলি

মিলিয়ে দেখা গেল এবং দেখা গেল যে, কুরআনের আয়াতে একটি কথাও ভুল নেই, একটি বিবরণও বেঠিক নেই। স্পষ্টতই এ মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নবীর ইন্তিকালের পর তাঁর শিক্ষা থেকে পথ নির্দেশের জন্য দুটি উৎস ছিল- কুরআন ও হাদীস।

- প্রথম উৎস কুরআন। বহু মুসলমানের সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ছিল এবং নবীর মতই তারা অসংখ্য বার তা আবৃত্তি করতেন। তাছাড়া কুরআন তখন লিখিত আকারেও ছিল। কেননা নবীর আমলেই, এমন কি হিজরতের (৬২২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ নবীর ইন্তিকালের দশ বছর আগে) আগেই কুরআন লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়েছিল।

- দ্বিতীয় উৎস হাদীস। নবীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীগণ (সাহাবীগণ) এবং অন্যান্য মুসলমানগণ যারা তাঁর কাজের কথার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের ঐসব বিষয় মনে ছিল এবং নতুন আদর্শ প্রচারের সময় কুরআন ছাড়াও তাঁরা নিজ নিজ স্মৃতির সহায়তা পেতেন।

নবীর ইন্তিকালের পর কুরআন ও হাদীস সংগ্রহ করে সংকলিত করা হয়। হিজরতের প্রায় চল্লিশ বছর পর প্রথমবার হাদীস সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কুরআনের প্রথম সংগ্রহ সম্পন্ন হয় আগেই খলিফা আবু বকরের আমলে এবং বিশেষত খলিফা উসমানের আমলে। খলিফা উসমান তাঁর খিলাফতের আমলে (নবীর ইন্তিকালের বারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে) কুরআনের একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ প্রকাশ করেন।

বিষয়বস্তুগত এবং সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তার উপর আমরা সবিশেষ জোর দিতে এবং গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। কুরআনের স্টাইলের সঙ্গে হাদীসের স্টাইলের তুলনা করার কথা কল্পনাও করা যায়না। অধিকন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে বিষয়বস্তু বিবেচনা করা হলে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ও বিরোধিতায় হতবাক হয়ে যেতে হয়। আমি আশা করি আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি যেঃ

- একদিকে কুরআনের বর্ণনা প্রায়শ অতি সাধারণ বলে মনে হলেও তার মধ্যে এমন অর্থ ও তথ্য নিহিত আছে যা পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে বা হবে।

- অপরদিকে হাদীসের কোন কোন বর্ণনা তৎকালীন সময়ের ধ্যানধারণার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ হলেও বর্তমানে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ইসলামী নীতি ও বিধান বিষয়ক যে সকল হাদীসের আসল হওয়া সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই সেই সকল ক্ষেত্রে এ অবস্থা দেখা যায় না।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিজে কুরআন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তাঁর নিজের উক্তি সম্পর্কে ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন না। কুরআনকে তিনি আল্লাহর কালাম বলে ঘোষণা করেন। আমরা

আগেই দেখেছি সুদীর্ঘ বিশ বৎসর যাবত তিনি সর্বাধিক যত্ন ও সতর্কতা সহকারে কুরআনের সূরা ও আয়াত শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তাঁর জীবিতকালেই কুরআন লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বহু লোকে মুখস্থ করে ফেলেছিল এবং নামাযে তা প্রতিনিয়ত আবৃত্তি করা হত। পক্ষান্তরে হাদীস মূলত তাঁর কাজের ও ব্যক্তিগত অভিমতের বিবরণ বলে কথিত। এ ব্যাপারে তিনি নিজে কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি- তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে যে কেউ ইচ্ছে করলে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের জন্য নজির খুঁজে নিতে পারেন এবং তা প্রচারও করতে পারেন। তিনি নিজে এ ব্যাপারে কিছু বলে যাননি।

যেহেতু অতি অল্পসংখ্যক হাদীসেই মুহাম্মদের (সঃ) নিজের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে, সেহেতু অন্যান্য হাদীসে, বিশেষত এখানে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত হাদীসে স্পষ্টতই তাঁর আমলের লোকদের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। কুরআনের সঙ্গে তুলনা করলেই এ সন্দেহজনক বা জাল হাদীসগুলি যে কত দূরে অবস্থিত তা সহজেই বুঝা যায়। এ তুলনায় একটি পার্থক্য খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে (তার যদি আদৌ কোন প্রয়োজন থেকে থাকে) -হাদীসে অর্থাৎ ঐ আমলের রচনায় অনেক বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল তথ্য ও বিবরণ আছে; এবং লিখিত অহির গ্রন্থ কুরআনে এমন কোনই ভুল নেই।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের সত্যতা সন্দেহাতীত। কিন্তু বৈষয়িক বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রে নবীর সঙ্গে অন্য কোন পার্থক্য নেই। একটি হাদীসে মুহাম্মদের (সঃ) নিজের উক্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- "ধর্ম বিষয়ে আমি যদি কোন হুকুম দিই তা পালন কর, কিন্তু আমি যদি আমার নিজের বিবেচনায় কোন হুকুম দিই তাহলে মনে রেখে আমি একজন মানুষ মাত্র।" আল সারাকসি তাঁর 'নীতিমালা'য় (আল উসুল) এ বিবরণটি এভাবে লিখেছেনঃ "আমি যদি তোমাদের ধর্ম বিষয়ে কোন কিছু তোমাদের নজরে আনি তাহলে তোমরা সেইভাবে কাজ কর, আর আমি যদি এ দুনিয়া বিষয়ক কোন কিছু তোমাদের নজরে আনি তাহলে তোমাদের নিজের দুনিয়াদারী সম্পর্কে তোমাদের তো অনেক ভাল জ্ঞান আছে।"

সাধারণ উপসংহার

এ গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে এসে একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে পাশ্চাত্যে যে ধারণা এখন সবচেয়ে প্রবল তা আদৌ বাস্তব সম্মত নয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট, গসপেল ও কুরআনের বর্ণনা ও উপাদান যে অবস্থায়, সময়ে ও প্রকারে সংগৃহীত ও লিখিত হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। এ তিনটি অহির গ্রন্থের আকারে গ্রন্থিত হওয়ার পরিস্থিতি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এ পার্থক্য এবারতের সঠিকতা ও বিষয়গত কিছু বৈশিষ্ট্যকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রায় নয় শত বছর যাবত লিখিত অসংখ্য সাহিত্যকর্ম স্থান

পেয়েছে। এ গ্রন্থে যে অসংখ্য খন্ড খন্ড বিচ্ছিন্ন রচনা আছে তা বিভিন্ন শতাব্দীতে মানুষের হাতে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন রচনার সঙ্গে নতুন রচনা জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে কোন রচনার উৎস যে কি তা নির্ণয় করা এখন খুবই কঠিন।

যিশু তাঁর দুনিয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করে যে শিক্ষা রেখে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁর কথা ও কাজের বর্ণনা সম্বলিত গসপেল দ্বারা মানুষের কাছে সেই শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গসপেলের লেখকগণ তাঁদের লিখিত তথ্য ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। মৌখিক প্রবাদ ও বর্তমানে নিশ্চিহ্ন কিছু রচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন ইহুদী খৃষ্টান সমাজে যিশুর কর্মজীবন সম্পর্কে যে সকল সংবাদ ও কাহিনী প্রচলিত ছিল তাঁরা তাই লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ তাঁরা মূল উৎস থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করেননি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বর্ণনার উপরে নির্ভর করেছেন।

এখন আমাদের এ আলোকেই ইহুদী খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বিবেচনা করতে হবে এবং ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ যে সকল প্রাচীন মতবাদ পোষণ করে থাকেন, বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার স্বার্থেই আমাদের তা সমূলে বর্জন করতে হবে।

উৎসের আধিক্যের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্ববিরোধিতা ও পরস্পর বিরোধিতা এসেছে এবং ইতিপূর্বে আমরা তার অনেক নজির উল্লেখ করেছি। মধ্যযুগের ফরাসী কবিগণ তাঁদের বর্ণনামূলক কবিতায় যেভাবে অতিরঞ্জন করেছেন যিশু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গসপেলের লেখকগণ ঠিক সেই প্রবণতাই দেখিয়েছেন। ফলে প্রত্যেকটি ঘটনা সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে পরিবেশিত হয়েছে এবং বর্ণিত ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থে আধুনিক জ্ঞান বিষয়ে যে অল্প কয়েকটি বিবরণ আছে তা কঠোরতম প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে।

এ পটভূমিকায় বিচার করলে স্ববিরোধিতা, অসম্ভাব্যতা ও সামঞ্জস্যহীনতার আসল কারণ অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। খৃষ্টানগণ যখন এ অবস্থা উপলব্ধি করে তখন তারা খুবই আশ্চর্য হয়ে যায়। বিশেষত আধুনিক আবিষ্কারের ফল গোপন করার জন্য খৃষ্টান ভাষ্যকারগণ দীর্ঘদিন যাবত যে কথার মারপ্যাঁচ, যুক্তির চাতুর্য ও ভাষার কাব্যিকতা চালিয়ে এসেছেন তাতে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে থাকার পর যখন তাদের উপলব্ধি আসে তখন তারা আরও বেশী আশ্চর্য হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নিজের হিসেবে মথি ও লুক বর্ণিত যিশুর দুটি নসবনামার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্মরণযোগ্য যে এ নসবনামা দুটি পরস্পর বিরোধী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মেনে নেয়ার অযোগ্য। খৃষ্টানদের অবাক হওয়ার মত এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, জনের গসপেলের দিকে আমরা একটু বেশী মনোযোগ দিয়েছি, কারণ এ গসপেলের সঙ্গে অপর তিনটি গসপেলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। বিশেষত জনের গসপেলে ইউক্যারিস্ট অনুষ্ঠানের কোন বিবরণ নেই এবং এ বিষয়টি অনেকেই

জানেন না।

কুরআন নাযিল হওয়ার যে ইতিহাস আছে তা অপর দুখানি ধর্মগ্রন্থের সংশ্লিষ্ট ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কুরআন প্রায় বিশ বছর যাবত নাযিল হয় এবং ফেরেশতা জিব্রাইল যখনই যতটুকু মুহাম্মদকে (সঃ) জানিয়ে দিতেন তার পরপরই বিশ্বাসীগণ তা মুখস্থ করে ফেলতেন। তদুপরি মুহাম্মদের (সঃ) জীবিত কালেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। খলিফা উসমানের আমলে নবীর ইন্তিকালের পর বারো বছর থেকে শুরু করে চব্বিশ বছর সময়ের মধ্যে কুরআনের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সংকলন সমাপ্ত হয়েছিল। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা মুখস্ত করেছিলেন এবং পরে প্রতিদিন নামাযে আবৃত্তি করতেন তারাই ঐ সংকলন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। আমরা এখন জানি যে সেই সময় থেকেই কুরআন অবিকৃত অবস্থায় সঠিকভাবে সংরক্ষিত আছে। তার আসল হওয়া সম্পর্কে কখনই কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

কুরআন তার পূর্ববর্তী দুখানি আসমানী গ্রন্থের সমাপ্তি থেকে শুরু হয়েছে। এ গ্রন্থের বর্ণনায় কোন স্ববিরোধিতা নেই এবং গসপেলের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় এবারতে মানুষের হস্তক্ষেপ বা রদবদলের তেমনি কোন চিহ্নই এখানে নেই। বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে কুরআনের সর্বত্র রচনাগত একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই চোখে পড়বে। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, কুরআনের তথ্য ও বর্ণনা আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অধিকন্তু কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক এমন সব বিবরণ আছে (যা আমরা আগেই দেখেছি) যে, ঐসব বিবরণ মুহাম্মদের (সঃ) আমলের কোন মানুষের দেয়া বলে চিন্তাও করা যায় না। এ কারণে কুরআনের যে সকল আয়াত এ যাবত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে তার মর্মার্থ আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারছি।

একই বিষয়ে বাইবেল ও কুরআনের বিবরণের মধ্যে তুলনা করলে একটি মৌলিক পার্থক্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। বাইবেলের বিবরণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, অথচ কুরআনের বিবরণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ আদি সৃষ্টি এবং প্লাবনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাযাত্রার ইতিহাস বিষয়ে অবশ্য বাইবেলের সঙ্গে কুরআনের বিবরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল দেখতে পাওয়া যায় এবং এ মিল মূসার আমলের তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এ একটি মিল ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়েই বাইবেল ও কুরআনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) বাইবেল নকল করে কুরআন লিখেছেন বলে কোন রকম সাক্ষাত-প্রমাণ ছাড়াই যে অভিযোগ করা হয়ে থাকে এ পার্থক্য থেকেই তা সরাসরি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়ে যায়।

বিজ্ঞান বিষয়ে হাদীসে যে সকল বিবরণ আছে তার সঙ্গে কুরআনের বিবরণের তুলনা করলে পার্থক্য এমন প্রকটভাবে দেখা দেয় যে উভয়ের একই উৎস থেকে আসার

সম্ভাবনা সঙ্গে সঙ্গেই নস্যাত হয়ে যায়। এ হাদীসগুলি মুহাম্মদের (সঃ) উক্তি বলে কথিত হয়ে থাকে, কিন্তু এ দাবীর সত্যতা সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে অনুমান করা যায় যে এ ধরনের হাদীসে সেই আমলের সাধারণ ধ্যান ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে।

মুহাম্মদের (সঃ) আমলে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ যে স্তর পর্যন্ত উপনীত হয়েছিল তার আলোকে বিচার করলে কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক বিবরণগুলি কোন মানুষের রচনা বলে ধারণা করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং কুরআনকে কেবলমাত্র অহির প্রকাশ বলে গণ্য করাই সঙ্গত নয়, বরং, সহি হওয়ার যে নিশ্চয়তা খোদ কুরআনেই দেয়া হয়েছে সেই কারনে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিবরণ যার কোনও মানবীয় ব্যাখ্যা হতে পারে না, তার আলোকে এ গ্রন্থকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসন দেয়াও যুক্তিসঙ্গত।

সমাপ্ত